সন্দেশ
৪০ বছর!
বিশেষ সত্যজিৎ সংখ্যা ১৪০৮
সন্দেশ
ছোটদের সেরা মাসিকপত্র

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ডকপি ও স্ক্যান : দেবাশীষ রায়

এডিট : সুজিত কুন্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

ছাপার বিভ্রাট ! মাপের ঝামেলা!

এই সংখ্যায় বহু বছর বাদে 'সন্দেশ'-এর মাপ পরিবর্তন করতে গিয়ে
নানা বিভ্রাট ঘটে, প্রকাশনায় অনেক দেরি হয়।
এর জন্য আমরা দুঃখিত!

সন্দেশী পরিকল্পনা

- ♦ **ভূত সংখ্যা** (আষাঢ়-শ্রাবণ)
- ♦ **শারদীয়া সংখ্যা** (ভাদ্র-আশ্বিন)
- ♦ **গল্প সংখ্যা** (কার্তিক-অগ্রহায়ণ)

গ্রাহকদের লেখা চাই!

শারদীয়া ও গল্প সংখ্যার জন্য গ্রাহকদের লেখা-ছবি-চিঠি...সব কিছু।

নতুন প্রকল্পের সন্দেশ

পৌষ ১৪০৮ (জানুয়ারি ২০০২) সংখ্যায়

প্রচ্ছদ কাহিনী 'বন্যপ্রাণী লোপ পাবে?'

গ্রাহক হলে পাঁচটি 'সন্দেশ' বিনামূল্যে

সন্দেশ কার্যালয়

১৭২/৩ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা ৭০০ ০২৯। এ-১৪, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা ৭০০ ০০৭

ফোন : ৪৬৬ ৪৯১৯, adas@onlysmart.com

১৩২০/১৯১৩ সালে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত
ছোটদের সেরা মাসিকপত্র

তৃতীয় পর্যায়। বর্ষ ৪১। সংখ্যা ১-২। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮

নয় সম্পাদকের লেখা

সন্দেশ ও সত্যজিৎ

ছড়া-কবিতা

বিভাগীয়

সম্পাদক:
লীলা মজুমদার
বিজয়া রায়

সহযোগী সম্পাদক:
সন্দীপ রায়

কালি প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড বাইণ্ডার্স, ১০৯ বি, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলিকাতা ৭০০০০৯ থেকে মুদ্রিত
সন্দেশ কার্যালয়, ১৭২/৩, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ৭০০০২৯ থেকে অমিতানন্দ দাশ কর্তৃক প্রকাশিত
স্বত্বাধিকারী: সুকুমার সাহিত্য সমবায় সমিতি লিমিটেড।

সত্যজিৎ রায়ের প্রথম গল্পের ইলাস্ট্রেশন। শিল্পী শৈল চক্রবর্তী।
রবিবারের অমৃতবাজার পত্রিকা। মে ১৮, ১৯৪১।

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮ মে-জুন ২০০১

১৪০৮

নবনীতা দেবসেন

সম্রাট আকবর বললেন, 'চাঁদকে—
ক্যালেন্ডারেতে আর রাখব না আটকে
আজ থেকে শুরু হবে সূয্যির যন্তর—'
সেটা ছিল হিজরির ন'শো উনসত্তর
সেই শুরু আমাদের বঙ্গের অব্দ
চাঁদামাস হয়ে গেল পাঁজি-পাতে জব্দ।
বঙ্গাব্দটা তাই আকবর বাদশার
খামখেয়ালের ফলে, পড়ে পাওয়া উপহার
চোদ্দশো একুশের হিজরির বচ্ছরে
চোদ্দশো আট সাল হল তবে কি করে?
সূয্যির চেয়ে জোরে ঘোরে কি না চন্দ্র
তাই জোরে ছুটে চলে হিজরির ছন্দ।

লিমেরিক · সত্যজিৎ রায়

রামফাঁকিবাজ চাকর জোটে সাধনবাবুর ভাগ্যে
বাবু বলেন, 'রোবট রাখি। চাকরগুলো যাক্ গে।'
রোবট হল কাজে বহাল,
তার ফলে আজ বাবুর কী হাল?
রোবট বলে, 'কই রে ব্যাটা?' বাবু বলেন, 'আজ্ঞে'?

বাবাজী এক রামকৃষ্ণ মিশনের
বলেন, যাব শিয়ালদা ইস্টিশনে।
তাই দেখে তাঁর যত শিষ্য
তুলবে বলে অবাক দৃশ্য
যন্ত্রপাতি বসায় টেলিভিশনে।

সত্যজিৎ রায়

একটা ছবির কথা বলি, সেটা আমার কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা। টেলিভিশান-প্রদর্শনীর জন্যে ছোটো গল্পের আঙ্গিকে তোলা 'এসো' (Esso) কোম্পানীর প্রযোজনায়। ওটা ছিল ওয়ার্ল্ড থিয়েটার পর্যায়ের অংশবিশেষ। গ্রীস, সুইডেন, ইংল্যান্ড থেকে কিছু কিছু সংগ্রহ করেছিল ওরা। বম্বের একটা ব্যালে-নাচের দল নিয়ে একটা ছবি, আরেকটায় রবিশংকর সেতার বাজাচ্ছেন, সঙ্গে পরিচালকের টীকাভাষ্য, দুইয়ের মধ্যিখানে থাকবে আমার একটা কাহিনীচিত্র। আমার পছন্দ মত কোনো গল্প নিয়ে। কয়েক মিনিট জুড়ে। ইংরেজী সংলাপ। ইংরেজী সংলাপে বাংলা ছবি—আমার ঠিক মন সায় দিচ্ছিল না। তাই একটা ছবি তুললাম যাতে সংলাপের বালাই নেই। দু'টি শিশু চরিত্র। একটি ধনী সন্তান, আরেকটা গরীবের ছেলে।

তুলতে সময় নিয়েছিলাম তিন দিন। এত তড়িৎঘটিত হ'ল যে শিশু অভিনেতা দু'টিকে গল্প, কোনো কিছুই বলে দেওয়া সম্ভব হয়নি। ওরা নির্দেশ মতো এটা ওটা করে গেল শুধু। আর ছবিটা দাঁড়িয়ে গেল স্রেফ কাটিংয়ের ওপর। গল্পের শুরু থেকে শেষ অবধি অজস্র অ্যাকশান। বিশেষ করে বড়লোকের ছেলেটির। ক্রমান্বিত সময়ের ভিত্তিতে কাহিনী, প্রায় পনেরো মিনিট ধরে। পনেরো মিনিট কম সময় নয়।

চিত্রনাট্য

দিন। সাহেবী আমলের এক বড় দোতলা বাড়ি। ধনী ছেলে ছাদহীন গাড়ি-বারান্দায় এসে পাঁচিলে ভর দিয়ে নিচে তাকায়।

একটা বড় শেভ্রোলে গাড়ি বেরোয়। এক মহিলা গাড়ির জানালা দিয়ে হাত বার করে ধনী ছেলেকে হাত নাড়েন।

ধনী ছেলেও হাত নাড়ে। নেপথ্যে গাড়ির শব্দ মিলিয়ে যায়। ধনী ছেলে এক ঢোক কোকা কোলা খেয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকে যায়।

দোতলার সিঁড়ির ল্যান্ডিং। ধনী ছেলে ঢুকে সামনে পড়ে থাকা একটা রাবারের বলকে লাথি মারে।

বড়, সুসজ্জিত ড্রইং রুম। গত রাতের অনুষ্ঠানের চিহ্ন— বেলুন, রঙচঙে কাগজের ফালি ইত্যাদি ঝুলছে। ধনী ছেলে ঘরে ঢুকে একটা সোফায় বসে পড়ে। উপরে তাকায়।

সিলিং ফ্যান থেকে ঝুলছে অনেকগুলো বেলুন।

ধনী ছেলে কোকা কোলা শেষ করে—

—সামনের টেবিলে রাখে। সেখানে পড়ে আছে একটা দেশলাইয়ের বাক্স। সেটা সে নেয়।

ধনী ছেলে এবার সোফায় শুয়ে, পাশে মাটিতে পড়ে থাকা একটা বেলুনের গোছা তুলে নেয়। তারপর দেশলাই জ্বালিয়ে বেলুনগুলো এক এক করে তার আগুনের শিখায় ঠেকায়। দুম্-দাম্ শব্দে সব বেলুন ফেটে যায়। ধনী ছেলে মহা খুশি হয়ে সোফা ছেড়ে উঠে পড়ে—

—পকেট থেকে একটা চুইং গাম বার করে, মুখ পুরে নিজের ঘরে গিয়ে ঢোকে।

চুইং গাম চিবোতে চিবোতে ধনী ছেলের প্রবেশ। ঘর ভর্তি নতুন খেলনা—খাটে, তাকে, মেঝেতে। মেঝেতে প্লাস্টিকের বিল্ডিং ব্লক দিয়ে তৈরি একটা বাড়ি। ধনী ছেলে তার উপর আরও একটি ব্লক রেখে—

—তার খেলনার তাকের সামনে এসে দাঁড়ায়। ব্যাটারি অপারেটেড খেলনার ছড়াছড়ি—রোবট, বাঁদরের গলায় ড্রাম, ক্লাউনের দু'হাতে ধরা ঝাঁঝ ইত্যাদি। কোন্‌টা নিয়ে খেলা যায়? হঠাৎ ধনী ছেলের চিন্তায় ভাটা পড়ে। বাঁশির শব্দ। বাইরে কেউ বাঁশি বাজাচ্ছে। সে জানলায় এগিয়ে গিয়ে—

—মুখ বাড়ায়। নিচে দেখে—

একটা পোড়ো জমিতে একটা কুঁড়ে ঘর। তার সামনে দাঁড়ায় এক গরীব ছেলে মনের সুখে বাঁশের বাঁশি বাজাচ্ছে।

ধনী ছেলে জানলা থেকে সরে যায়।

খাট থেকে একটা খেলনার ক্ল্যারিওনেট নিয়ে—

—আবার জানলায় এসে দাঁড়িয়ে ক্ল্যারিওনেট বাজায়। বাঁশের বাঁশিকে টেক্কা দিয়ে এখন বিলিতি যন্ত্রের আওয়াজ।

গরীব ছেলে বাঁশি থামায়। সাহেবী বাড়ির জানলায় ধনী ছেলেকে সে দেখে। তারপর তার কুঁড়ে ঘরের দিকে এগিয়ে যায়।

গরীব ছেলে এবার একটা সস্তার খেলনা ঢোল বাজাতে বাজাতে দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

তবে রে। ধনী ছেলে ফের জানালা থেকে সরে যায়।

তাক থেকে ড্রাম-ওয়ালা খেলনার বাঁদরটা ছোঁ মেরে তুলে—

—জানালার সামনে এসে দাঁড়ায়। নিচে, দূরে গরীব ছেলে ঢোল বাজাচ্ছে। ধনী ছেলে তার খেলনাটা চালু করতেই বাঁদর ড্রাম পেটাতে শুরু করে। উপরে ড্রাম, নিচে ঢোল এক সঙ্গে বাজতে থাকে।

গরীব ছেলে নিজের বাজনা থামায়। দৌড়ে ঘরে ফিরে যায়।

তারপর লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে আসে। মুখে মুখোশ, হাতে বর্শা।

ধনী ছেলের জেদ চেপে গেছে। সে জানলা ছেড়ে চলে যায়।

গরীব ছেলে লাফানো থামিয়ে উপরের দিকে চেয়ে অপেক্ষা করে।

আবার জানলায় ধনী ছেলের আবির্ভাব। সে নানান ছদ্মবেশে হাত পা নাড়িয়ে লাফালাফি, চেঁচামেচি শুরু করে। প্রথমে মুখে রাজার মুখোশ, হাতে তলোয়ার—

'টু' ছবির শুটিং স্ক্রিপ্ট

—তারপর মুখে রঙ মাখা, হাতে তীরধনুক—

চোখে মাস্ক, হাতে পিস্তল।
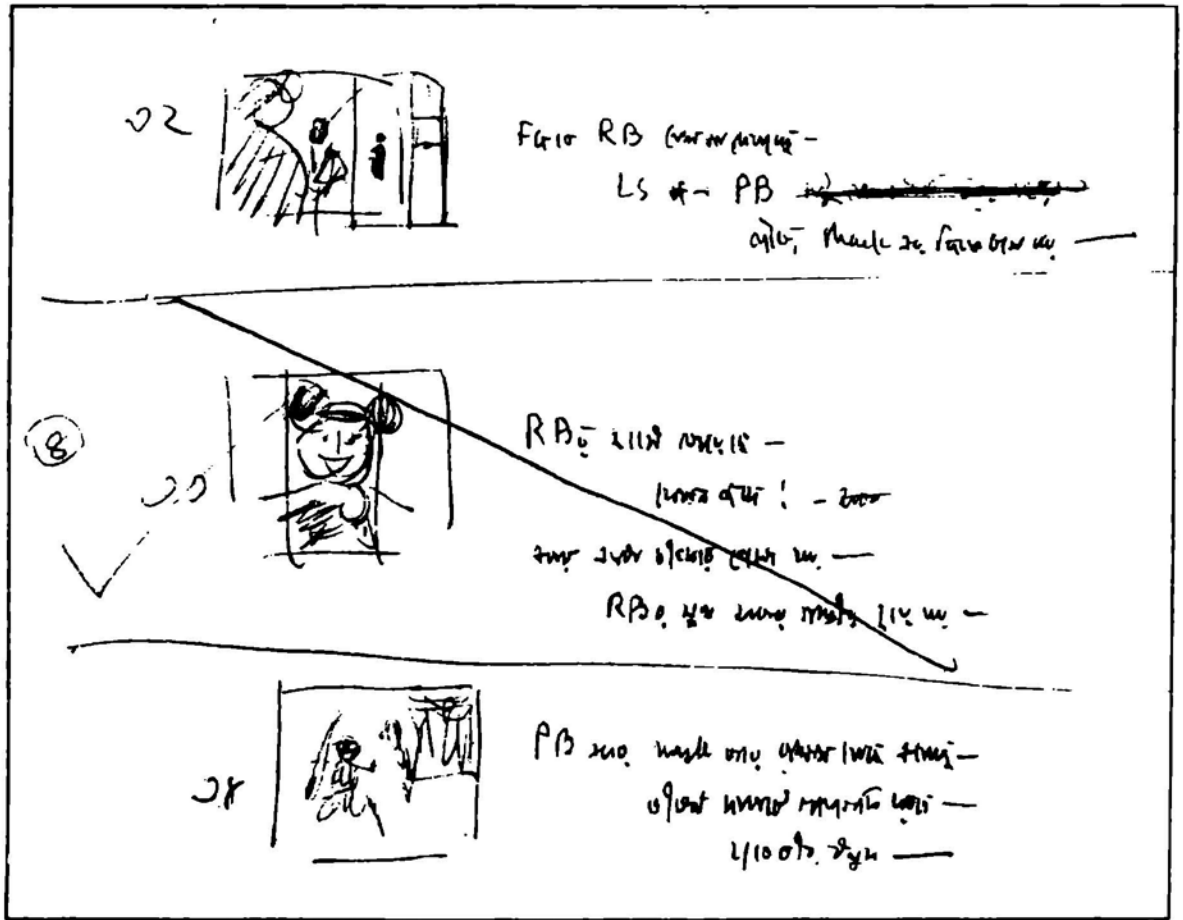
এতসব কাণ্ডকারখানা দেখে গরীব ছেলের মুখ নিচু হয়ে যায়। সে মনমরা হয়ে তার কুঁড়ে ঘরে ফিরে যায়।

ধনী ছেলের মুখে বাজিমাতের হাসি। সে ঘুরে গিয়ে—

—তার খেলনার তাকের সামনে এসে হাজির হয়। মুখ থেকে চুইং গাম বার করে, তার ব্যাটারি রোবটের কপালে আটকে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

ড্রইং রুম পেরিয়ে—

—কিচেনে এসে ঢোকে। ফ্রিজ খুলে একটা আপেল বার করে—

সেটা দিব্যি খোশমেজাজে খেতে খেতে নিজের ঘরে এসে ঢুকতেই থমকে দাঁড়ায়। তার দৃষ্টি জানলার দিকে।

জানলার বাইরে আকাশ। সেখানে একটা ঘুড়ি উড়ছে।

ধনী ছেলে জানলার দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখে—

—গরীব ছেলে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। ধনী ছেলেকে জানলায় দেখে সে তার দিকে চেয়ে হাসে।

ধনী ছেলের মুখ গোমড়া। সে আকাশে তাকায়।

আকাশে ঘুড়ি।

ঘুড়ি ওড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে গরীব ছেলে তাকে দেখে।

ধনী ছেলে জানালা ছেড়ে চলে যায়। ফিরে আসে একটা গুলতি নিয়ে। ঘুড়িকে তাক করে গুলতি দিয়ে একটা গুলি ছোঁড়ে।

কিন্তু গুলি ঘুড়িতে লাগে না।

গরীব ছেলে তার দিকে চেয়ে হাসে।

ধনী ছেলে আবার গুলি ছোঁড়ে। এবারও লাগে না।

ধনী ছেলে রেগেমেগে—

—গুলতিটা ফেলে দিয়ে তার নতুন এয়ার গানটা তুলে নেয়। তাতে ছর্‌রা ভরে জানলায় ফিরে যায়।

আকাশে এখনও ঘুড়ি।

গরীব ছেলে জানলার দিকে চায়। সে কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়ে, কারণ—

—ধনী ছেলের হাতে এয়ার গান।

ধনী ছেলে ঘুড়ির দিকে তাক্ করে ট্রিগার টেপে।

অব্যর্থ টিপ। ছর্‌রা গিয়ে ঘুড়িতে লাগে। ঘুড়ি ছিঁড়ে যায়।

গরীব ছেলে চমকে জানলায় তাকায়।

ধনী ছেলের মুখে কেল্লা ফতে হাসি। সটান তার দিকে তাকিয়ে।

গরীব ছেলে সুতো গুটিয়ে—

—ছেঁড়া ঘুড়ি নিয়ে বিমর্ষ হয়ে কুঁড়ে ঘরে ফিরে যায়।

ধনী ছেলে সরে যায় জানালা থেকে।

সে আর ঝুঁকি নেয় না। তার সবকটা যান্ত্রিক খেলনা চালু করে দেয়। রোবটটা মাটিতে ছেড়ে দিতেই সেও দিব্যি হাঁটতে শুরু করে। সারা ঘর এখন খেলনার কোলাহলে সরগরম।

ধনী ছেলে উঠে দাঁড়ায়। মেজাজ খুশ্। কিন্তু সেটা বেশিক্ষণ থাকে না। কারণ বাইরে আবার বাঁশি বাজতে শুরু করছে।

রোবট হেঁটে চলে।

ধনী ছেলে থমথমে মুখে ধপ্ করে খাটে বসে পড়ে। রোবট আপনমনে এগিয়ে যায় বিল্ডিং ব্লকের বাড়ির দিকে। তাতে একটা ছোট্ট ধাক্কা মারতেই প্লাস্টিকের ব্লকগুলো হুড়মুড় করে ভেঙে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ঘরের সব শব্দ ছাপিয়ে এখন বাইরে থেকে ভেসে আসা বাঁশির সুর।

লীলা মজুমদার

এখান থেকে নাকি মন্দির উঠিয়ে দেবে। তাই শুনে পুরুত রেগে টং। বড় রাস্তার ধারে একটু খানিক জায়গা, তাতে মান্ধাতার আমলের বটগাছের গোড়ায় দুটো পাথর ফেলে, তার ওপর সিঁদুর মাখিয়ে আরেকটা কালো লম্বাটে গোল পাথর ফেলে যদি বসে থাকা যায় আর লোকেরা না চাইতেই দুটো-একটা পয়সা ফেলে দেয় তাতে কার কি ক্ষতিটা হচ্ছে শুনি? বলে নাকি তুলে দেবে; ফুট চওড়া হবে, গাছ কাটা হবে। নাকি মান্ধাতার আমলের গাছ, এই পড়ে তো সেই পড়ে; পড়বি তো পড়, কারও ঘাড়ে পড়লেই হয়ে গেল। তাই কেটে ফেলবে। কাঠটাও বিক্রি হবে, আজকালকার মাগ্‌গি-গণ্ডার বাজারে তাও কিছু কম নয়।

গাছের কোটরে পুরুতের ঘরকন্না, ক'টা টিন, দুটো মাটির হাঁড়ি, ক'টা চট একটা তুলোর কম্বল, ছেঁড়া-খোঁড়া বটে, কিন্তু তকতকে পরিষ্কার। পুরুত গির্জার পাশের পুকুরে কেচে নেয়, স্নান সারে, জল তোলে। বেশ পুকুরটা; একধারে একটা নড়বড়ে পোস্তোতে সাইনবোর্ড টানানো আছে, 'এখানে স্নান করা, কাপড় কাচা নিষেধ।' বেশ জায়গাটা। সাইনবোর্ডের গোড়াতেই পুরুতের স্নানের জায়গা।

কালি, ভুলি, নটে, শম্ভু, শম্ভুর দুই বোন, চা-ওলা, জুতো সেলাই, কাঠ গুদোমের বেকার লোকটা, সবাই ভাগাভাগি করে মাথাপিছু আধ ভাঁড় চায়ের তলানি খেয়ে চাঙ্গা হয়ে বলল, 'তা হলে কোথাও চলে যেতে হবে।' চা-ওলা বাকি চা-টুকু গলায় ঢেলে বলল, 'কিন্তু কোথায়?'

জুতো-সেলাইটা বড় ভীতু; সে বলল, 'এখানে ওখানে চট পেতে ছুঁচ ফাল নিয়ে বসি, রাতে টিপি-টুপি হয়ে শুয়ে থাকি; তাও রোজ উঠিয়ে দেয়। এ সব ছেড়ে কোথায় যাব?' বেকার লোকটা বলল, 'কুছ পরোয়া নেই। আমার চালচুলো নেই, স্বচ্ছন্দে সব ছেড়েছুড়ে চলে যেতে পারি।'

ছেলেমেয়েগুলো এক বাক্যে বলল, 'হ্যাঁ, চলেই যাই, নইলে ধরে পাঠশালে দেবে।'

চা-ওলা আড়চোখে তাকিয়ে বলল, 'যাওয়াই ভালো। কি এমন আছে যে ছেড়ে যেতে কষ্ট হবে?'

ছেলেমেয়েগুলো একসঙ্গে বলে উঠল, 'আমরাও আমরাও, আমাদের কিছু নেই, আমরাও সব ছেড়েছুড়ে চলে যাব।'

চা-ওলা চারদিকে তাকিয়ে বলল, 'শহরটা কিন্তু বেড়ে জায়গা। আসলে সব আছে এখানে, এখানে ফকির এসে রাজা হয়ে যায়। খালি তিনটে জিনিস নেই। থাকার জায়গা, পেটের খাবার, পরনের কাপড়। নাঃ, চল পুরুত চলেই যাই।'

কালি ভুলি নটে শম্ভু বলল, 'কেন, ওগুলো কি খুব দরকারি জিনিস? আমরা তো কোনকালেও ও সব পাই না। ও পুরুত চল, তাহলে।'

পুরুত যেন ঘুম থেকে জেগে শম্ভুর বোন দুটোকে দেখিয়ে বলল, 'ওরা তো হাঁটতে পারে না, ওরা যাবে কি করে?' শুনে শম্ভু অবাক। 'কেন পিঠে করে নিয়ে যাবে। মা-বাবা পালিয়ে গেছে,

ওরা কি কখনও একলা থাকতে পারে?' বলে ওদের নোংরো গালে চুমো খেল, ওরা ওর নাক-কান ধরে খিল খিল করে হাসতে লাগল।

'আছে একটা জায়গা, কিন্তু সে তোদের পোষাবে কি?' বেকার লোকটা বলল, 'কেন পোষাবে না শুনি?' পুরুত বলল, 'সেখানে যে আর কিছুই নেই খালি ওই তিনটেই আছে।'

অমনি ওরা সবাই উঠে পড়ল, 'চল চল চল চল।' পুরুত বলল, 'সেখানে হোটেল নেই, পাত-কুড়ুনি পাবিনে।' ছেলে-মেয়েগুলো বলল, 'এখানেও পাই না, কুকুর বেড়ালরা সব খেয়ে ফেলে।'

পুরুত বলল, 'সিনেমা নেই।'

ওরা বলল, 'অন্য জিনিসের দেয়ালে ঠেস দেব।' 'ট্র্যাম-বাস নেই, বিজলী বাতি নেই, দোকান-পাঠ নেই।' ওরা হো-হো করে হাসতে লাগল, 'কোথায় পয়সা পাব যে ওসব দেখব। ওসব আমাদের দরকার নেই। পাঠশালি না থাকলেই হ'ল।'

'চাট-ওয়ালাও নেই।' ওরা একবার এ ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমাদের কান মলে দেয়। ফাটকে দেবে বলে। না পুরুত, তুমি আমাদের নিয়ে চল। কিন্তু —'

'কিন্তু কি?'

'মুনসি পালের মিনি মানায় পাঠশালা নেই তো?'

পুরুত রেগে গেল। 'বলছি কিচ্ছু নেই, ওই তিনটে ছাড়া।'

'তবে চল, তবে চল, তবে চল।'

পুরুত অমনি উঠে পড়ে বলে, 'চল।' বলে কোটর থেকে চট-কম্বল কাঁধে ঝুলিয়ে নেয়।

জুতো সেলাই তো অবাক। 'ওকি, ঠাকুর নেবে না?'

'দুর, ঠাকুর সেখানে হেঁটে বেড়ায়। গায়ের জাব্বা-জোব্বার শব্দ শোনা যায় খস-খস-খস।'

কালি ভুলি বলল, 'এ্যাঁ! জোব্বা পরে নাকি? কই, আমাদের তো জোব্বা নেই। থেটারের রাজার আছে, কি সুন্দর।'

বেকার লোকটা বলল, 'তোমরা কি ঠাকুর? আহা বড় গির্জের পাদ্রীর কাছে কি সুন্দর ছবি দেখলাম নীল জোব্বা গায়, মেঘের ওপর ঠ্যাং ঝুলিয়ে ঠাকুর বসে আছে, এই এত্ত বড় দাড়ি, মাথায় খোঁচা খোঁচা মুটুক।'

'কেন খোঁচা খোঁচা মুটুক কেন?'

'তা পাদ্রী বলল নাকি আলোর মুটুক, তবে কেউ নাকি চোখে দেখতে পায় না।'

'ওমা! তবে মুটুক পরে লাভটা কি?'

নটে বলল, 'দুগ্‌গো ঠাকুরের মাথায় সোলার মুটুকে রাংতা মোড়া। কি সুন্দর। সবাই দেখতে পায়।'

পুরুত এক পা বাড়িয়ে বলল, 'সুন্দর না ছাই! খালের জলে যেই না পড়ল, সব রঙ ধুয়ে সাবাড়। যাকে চোখে দেখা যায় না, তার জিনিসও নষ্ট হয় না। নাও, চল।'

কালি ভুলি ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'ও কি তোমার কালো গোল ঠাকুর সত্যি নিলে না, পুরুত? ওর দেখা শুনো কে করবে? কে ধূপকাঠি জ্বালাবে, গঙ্গাজল ছিটুবে, বাতাসা খেতে দেবে?'

শম্ভুর বোন দুটো এমনি নোংরা নোংরা হাত পেতে বলল, 'দে লে।' পুরুত বাতাসার কৌটো খালি করে সবার হাতে হাতে বাতাসা দিয়ে দিল। ধূপকাঠি সব এক সঙ্গে জ্বেলে মাটির দলায় গুঁজে দিয়ে গঙ্গাজলের সবটি কালো গোল পাথরের গায়ে ঢেলে বলল, 'চল, তা হলে।'

অমনি সবাই রওনা হয়ে গেল, বড় বড় পা ফেলে, দুলে দুলে। তা হলে হাঁপ ধরে না। আরও এগিয়ে যতদূর পারা যায়, পাঠশালা থেকে যতদূরে যাওয়া যায়। ছোকরা বাবুরা নাকি ছেলেমেয়ে ধরে ধরে মুনসি পালের পাঠশালে ভরে দেয়। আর এ জন্মে ছাড়া পায় না। কালি ভুলি আগে চলল, তাদের আগে কম্বল কাঁধে পুরুত। তাদের পেছনে শম্ভু, তার কাঁধে একটা বোন, তার পেছনে নটে, তার কাঁধে আরেকটা বোন। সবার পেছনে উনুন-বাক্স নিয়ে চা-ওলা, জুতো সেলাই আর কাঠ-গুদোমের বেকার লোকটা। পায়ে পায়ে ধুলো ওড়ে, কথায় কথায় পথ পার হয়ে যায়।

ওরা অবাক হয়ে দেখে কিনা শহর ছেড়ে আধ ঘণ্টা হাঁটলেই অমনি পাড়া-গাঁ। দু'দিকে ধান খেত, মধ্যিখানে সড়ক। এদিকের ধান খেত থেকে ও দিকের ধান খেতে জল যাবার নালা, তার ওপর ছোট্ট পুল। পুলের ওপর একটা মা-ছাগল আর দুটো ছাগলছানা নিয়ে এক বুড়ি বসে। বুড়ির চোখে জল। সে সব কথা শুনে বলল, 'আমিও যাব। নইলে ছেলেপুলেদের ছাগল-দুধ কে খাওয়াবে? তাছাড়া বউ ঠ্যাঙার বাড়ি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে, যাবটাই বা কোন চুলোয়?' পুরুত বলল, 'তবে চল।'

কিছুদূর গিয়ে বুড়ি জিজ্ঞাসা করল, 'তা যাওয়া হচ্ছেটা কোথায়?'

ওরা বলল 'যেখানে তিনটে জিনিস পাওয়া যায়।'

'কোন তিনটে জিনিস?' ওরা বলল, 'থাকার চালা, পেটের খাবার, পরনের কাপড়।'

শুনে বুড়ির কি হাসি, 'দুৎ, এমন জায়গা থাকে নাকি আবার?'

'আছে আছে, চল আমার সঙ্গে।'

'সে কোথায়? সত্যি ওসব সগ্‌গ ছাড়া কোথাও আছে নাকি?'

পুরত বলল, 'আছে। যা ছাড়া প্রাণ বাঁচে না সেই সব সেখানে আছে। আলো, বাতাস, জল, ফল, শকর-কন্দ।'

বুড়িও বলল, 'চল তাহলে। কিন্তু তেড়িয়ে দেবে না তো?'

'কেউ নেই তো তাড়াবেটা কে? সে আমার বুড়ো ঠাকুরদাদার স্বপ্ন দেখার দেশ। তবে কিছু কাঁকড়াবিছের উৎপাত আছে, তাই ওমিওপ্যাথির শিশিটে নিয়েছি।'

বেকার লোকটা বলল, 'তাছাড়া গ্যাঁদাফুলের পাতা বেটে মাখিয়ে দিলেও সব দুঃখ দূর হয়।'

জুতো সেলাইও কম যায় না। সে বলল, 'হাড়-ভাঙ্গা পাতা

ছেঁচে লাগলেও জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়িয়ে যায়।'

'সে সবই সেখানে গাছতলায় গজায়। ঠাকুরদাদারা যেমন সব ফেলে এসেছিল তেমনি আছে।'

সারা দিন ওরা হাঁটল। দুপুরে গাব তলায় থেমে পেট ভরে গাব খেল। সন্ধ্যার ঠিক আগে বুড়ো ঠাকুরদাদাদের স্বপ্নে দেখা সেই জায়গায় পৌঁছল।

জায়গা তো নয়, একটা পাহাড়। পাহাড়ও নয়, বরং একটু উঁচু ঢিবি। আগাগোড়া ঘন বনে ঢাকা। বনের তলা দিয়ে শুকনো পাতা বিছানো অনেক দিন না চলা এক পথ। তাই দিয়ে এঁকে বেঁকে ওপরে উঠে দেখে যেন সত্যি সগ্গে এসেছে। তা হলে বুড়ি তো ঠিকই বলেছিল।

খালি সুবজ গাছ আর লতা আর ফুলের গন্ধ আর থোপা থোপা পাকা ফল রসে টুপটুপ করছে। ছোট ছোট ঝরণা মাটি থেকে বুগ বুগ করে উঠে কুলকুল করে নদী হয়ে বয়ে যাচ্ছে। তারই ধারে ধারে বড় বড় পাথরের ঝরঝরে সব গুহা, পায়ের নিচে বালি, দেয়ালে কারা গেরিমাটি দিয়ে ছবি এঁকে রেখেছে, হরিণ ছুটছে, শিকারী ধনুক তুলেছে, বাজপাখি উড়েছে, এই সব।

চারদিকে চেয়ে চেয়ে ওরা অবাক। কারা এমন ভালো জায়গা ছেড়ে চলে গেছিল পুরুত? কোথাও এতটুকু ময়লা নেই, আস্তাকুঁড়ে নেই দেখেছ।'

পুরুত বলল, 'যারা গেছিল তারা আমার ঠাকুরদাদের ঠাকুরদারা। তারা গেলে ময়লা করবেটা কে শুনি? জন্তু জানোয়ার কখনো পরিষ্কার মাটি নোংরা করে?'

বুড়ি চেয়ে চেয়ে বলল, 'ও মা, লাল ধানের চাষ করেছিল গো। আম, জাম, কাঁঠাল, কলা পুঁতেছিল। তুলো-গাছ লাগিয়েছিল। গোরু-ছাগল পেলেছিল। চারদিকে তার চিহ্ন পাচ্ছি। তা ছেড়ে গেল কেন?'

পুরুত অন্যমনস্কভাবে বলল, 'আর থেকে হবে কি আমার মাথা-মুণ্ডু। খেতে পেল, শুতে পেল, পরতে পেল; তাই শেষটা টিকতে না পেরে চলেও গেল।'

কালি ভুলি নটে শম্ভু শুনে অবাক। বোন দুটো ঘুমিয়ে কাদা। ছাগল তিনটে শেষে এক কোশ এর ওর কাঁধে চেপে এসেছিল, শুধু তারাই চুপ করে রইল।

তখন বাকিরা উঠে পড়ে মহা শোরগোল তুলল, 'তবে আমরাই বা টিকব কেমনে? আমরাও ফিরে যাই। পুরুত তুমি ঠাকুর ফেলে এসে ভালো করনি। এখানে আমাদের দেখবে কে?'

নটে বলল, 'বলেছিলে যে এখানকার বনে ঠাকুর হাঁটে, কোথায় সে?'

ওমনি কোথা থেকে এক দমকা বাতাস উঠতেই সারা বন শিরশির সরসর করে উঠল; ফুলের গন্ধে চারদিক ভরল, ঘুমের ঘোরে পাখিরা বলল, কুঁ-কুঁ, বকম্-বকম্, সারা রাত জেগে পাখার বাতাস দিয়ে মৌমাছিরা মৌচাক ঠাণ্ডা করে তারা বলল গুণ্‌ণ্‌ণ্‌

গুণ্‌গুণ্‌, টুপটাপ করে দুটো চারটে ফুল ফল ঝরে ওদের গায়ে পড়ল, গাছে গাছে জোনাকি জ্বলল।

আর কারও মুখে কথা নেই। বুড়ি চা-ওলার টিনে ছাগল দুইয়ে ওদের দুধ খাওয়াল, তারপর ফল খেয়ে নদীতে মুখ হাত ধুয়ে [illegible] বালিতে পাতা পেতে যে যার সে রাতের মতো ঘুমিয়ে রইল।

সকালে পুরুত বলল, 'স্নান করে সব সাফ্‌ হ। বনের গাছতলা তকতক করছে, পাতায় পাতায় কে যেন পালিশ লাগিয়েছে। বেকার যুবক তুমি কাঠ চিরে তাঁত আর চরকা বানাবে; জুতো সেলাই, তুমি কার্পাস তুলে সুতো কাটবে; বাকিরা কাপড় বুনবে। সবাই মিলে ধান তুলবে, শস্য তুলবে। সবাই গুহায় শোবে। আবার কি চাই?'

ওরা লাফিয়ে উঠে বলল, 'কিছু না, কিছু না। পাঠশাল নেই, কি মজা কি মজা।'

ওরা স্নান সেরে এলে পুরুত বলল, 'কিন্তু সবার আগে একটা কথা বলে কাঠি দিয়ে মাটিতে বাঁকা দাগের পাশে, একটা দো-ঠেঙো সোজা দাগ কেটে জিজ্ঞাসা করল, 'এটা কী?'

কালি বলল, 'উলটে পড়া কচ্ছপের ছানা, পাশে একটা ঘাস।'

তুলি বলল, 'উল্টনো খেজুরের রসের হাঁড়ি পাশে পেঁপের বোঁটা।' শম্ভু বলল, 'গুগলীর পাশে ঘাস।' পুরুত একটু কি যেন ভেবে বলল, 'আচ্ছা, ওই থেকে তোরা কাঠি দিয়ে আঁক।'

সারি সারি আঁকা হল। পুরুত বলল, 'আচ্ছা, তার পাশে আরেকটা ফ্যকড়া কাঠি দে দিকি; ঠেকা দিয়ে থাকুক। পাঁচটা করে আঁক দিকি।' তাই আঁকল ওরা। নটে অনেকগুলো আঁকল।

তারপর পুরুত বলল, 'দেখব বারো মেসে আমগাছে আম হল কি না। আবার কাল নক্সা আঁকা। সাপের পরিবার।'

ওরা চলে গেলে বুড়ি এসে অনেক দেখে শুনে বলল, 'ও পুরুত, নেকা-পড়া নয়তো?'

পুরুত বলল, 'ওগুলো তাই কখনো করে? ওই দিয়ে ওদের অন্তর হবে। দাও আমাকে নারকেলের মালা করে ছাগলের দুধ দাও।'

ছবি : সত্যজিৎ রায়

(ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৮১ থেকে মুদ্রিত)

সুবিনয় রায়

খামখাপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার বৈতারি চৌধুরী-মশায়ের একমাত্র ছেলের বয়েস মাত্র সাত বৎসর। কিন্তু এখন থেকেই তার মেজাজখানা সপ্তমে চড়ে থাকে। পান থেকে চুনটি খসলে আর রক্ষা নেই—একেবারে ক্ষেপে রেগে আগুন হবে, জিনিসপত্র ভাঙবে, প্রাণপণে চিৎকার করে বাড়ি মাথায় করবে, মারবে, ধরবে, খামচাবে। তারপর অনেকক্ষণ ধরে রাগে গজ গজ করতে করতে শেষটায় ঘুমিয়ে পড়বে—সেই যা রক্ষা। যত বয়স বাড়ছে সঙ্গে সঙ্গে তার মেজাজখানাও ক্রমে কড়া হয়ে পড়ছে। শেষে গিয়ে যে কি দাঁড়াবে কে জানে। এক এক সময় রাগের চোটে তার মুখ আর কান গোলাপখাস আমের মতো টক্‌টকে লাল হয়ে যায়।

কত বড় বড় হিপনটিস্ট, ডাক্তার, বিশেষজ্ঞ, কবিরাজ, হাকিম, য়ুনানী চিকিৎসক এসে ছেলেকে দেখে ওষুধপত্র খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন, কিছুতেই কোনও উপকার হয়নি। ছেলের নাম রাখা হয়েছে শান্তকুমার—যদি নামের গুণে কিছু হয়। ছেলের জন্য গোটাকয়েক চাকর রাখা হয়েছে, প্রত্যেকেই খুব ষণ্ডা আর খোশ-মেজাজী। কিল-চড়, চিমটি সইতেও তারা মজবুত, হাসেও তারা কথায় কথায়। আবার দরকার হলে চট করে হাসিও থামাতে হয়। দু'জন তারা চট করে দৌড়াতে ওস্তাদ। কোনও জিনিস খোকাবাবুর দরকার হলে তারা চোখের পলকে এনে দেবে। দু'জন মোসাহেব রাখা হয়েছে, তারা সর্বদাই খোকাবাবুকে খুশি রাখতে ব্যস্ত। কত বই, কত খেলনা যে আনা হয়েছে তার কোনও হিসাব নেই। খোকাবাবু যখন যা কিছু খেতে চান তখনই সেটার ব্যবস্থা হয়—অবিশ্যি নিতান্ত আবদারের ফরমাস হলেই মুস্কিল। একবার যেমন শীতকালে হঠাৎ খোকাবাবু বলে বসল, 'কাঁঠাল খাব।' আর যাবে কোথা। যত তাকে বোঝানো যায় ততই যেন গোঁ বেড়ে যায়। কিছুতেই আর ভবি ভোলবার নয়। ক্রমে তার মেজাজ চড়তে লাগল। কোতিক দেখে তখনই 'সরবৎ খাও', বলে মিষ্টি ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দেওয়া হ'ল। লম্বা ঘুম দেবার পর যেই সে উঠল অমনি তাকে দুধে পিঠুলি গুলে, কলার এসেন্স দিয়ে জ্বাল দিয়ে ঘন করে একটু হলদে রং গুলে মিশিয়ে সেই জিনিসটা দিয়ে বলা হ'ল, 'কেমন লাগল কাঁঠালগোলা?' খোকাবাবু বলল, 'বেশ!' তারপর মোসাহেব তাকে দু'-তিন ঘণ্টা নানারকম মজাদার খেলা দেখিয়ে ভুলিয়ে রাখল তবে গিয়ে ঠাণ্ডা হ'ল।

কিন্তু দিন দিন খোকাবাবুর মেজাজ যে চড়েই যাচ্ছে, নিশ্চিন্ত থাকা তো আর চলে না। তাই দ্বৈতারিবাবু কলকাতায় গিয়ে বড় বড় ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলেন।

বিখ্যাত ডাক্তার চক্রবর্তীসাহেব বললেন, 'মেজাজ ঠাণ্ডা রাখতে হলে কলকাতাই ওর পক্ষে উপযুক্ত জায়গা। লেকের দিকে একখানা ভাল বাড়ি নিয়ে ইলেকৃট্রিক পাখা লাগিয়ে, খস্‌খস্‌-টাট্টি ঝুলিয়ে ছেলেকে ঠাণ্ডায় রাখুন; উত্তেজনা বেশি হতে দেবেন না; বিকালে খোলা হাওয়ায় মোটরে চড়িয়ে বেড়িয়ে আনবেন; সঙ্গে চিকিৎসাও চলতে থাকবে। ওষুধপত্র-খাবার জিনিস ইত্যাদি কলকাতায়ও পাওয়া যাবে সব। আর দেরি করে লাভ নেই, শীগ্‌গির ব্যবস্থা করে ফেলুন।'

সেদিনই দ্বৈতারিবাবু বাড়ি ভাড়ার জন্য লোক লাগালেন; দু'দিনে বাড়িও ঠিক হয়ে গেল। তখনই হুকুম হয়ে গেল, 'ঘরে ঘরে ইলেকৃট্রিক পাখা লাগানো হোক। বারান্দায় পাখা লাগানো হোক। একটা ঝকঝকে নতুন আট সিলিন্ডার মোটর কেনা হয়ে গেল; বইয়ের দোকান থেকে একশো টাকার ছবির বই এল; রাধাবাজার থেকে দু'শো টাকার খেল্‌না এল। খস্‌খস্‌-টাট্টি বারান্দার চারদিকে লাগানো হয়ে গেল। দু'জন লোককে খসখসে জল দেবার জন্যে রাখা হ'ল। বাড়িতে রেডিও লাগানো হ'ল, গ্রামোফোন কেনা হয়ে গেল।

দ্বৈতারিবাবু জমিদার মানুষ, কাজকর্ম্ম দেখতে হয়; বারোমাস কলকাতায় থাকা তাঁরপক্ষে সম্ভব নয়। তাই ঠিক হ'ল, খোকাবাবুর মামা হাস্যবিকাশ রায় খোকাবাবুর অভিভাবক হয়ে থাকবেন। তাঁর বিশেষ কোনও কাজকর্ম্ম নেই, খুব হাসিখুশি মানুষ, খোকাবাবুকে খুব ভালও বাসেন। তাছাড়া তিনি দু'বছর মেডিক্যাল কলেজে পড়েছেনও। কয়েক বার ফেল হওয়ায় শেষটায় ছাড়তে বাধ্য হন।

হাস্যবিকাশবাবু কলকাতায়ই থাকেন; তাঁকে ডেকে সব কথা বলে বুঝিয়ে দেখিয়ে তবে ব্যবস্থা হ'ল। তিনি বিশেষ করে বলে দিলেন, চাকর-বাকরদের পাঠান দরকার; কিন্তু মোসাহেবদের যেন আর পাঠানো না হয়। তাহলে ছেলের মন বুঝবার সুযোগ পাওয়া যাবে না; আর মোসাহেবী দেখে ছেলে আরও আহ্লাদে হয়ে উঠবে। একজন ওস্তাদ রাঁধুয়ে, আর একটি ভালো বাজার সরকার রেখে দেওয়া হ'ল। মামা নিজেই সব তদারক করবেন—এমন কি খোকাবাবুর মাকেও কলকাতায় পাঠাতে বারণ করলেন।

দিন কয়েক বাদে খোকাবাবু তার বাবার সঙ্গে কলকাতায় এসে হাজির হ'ল। মামাবাবু তো আগে থেকেই তার সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন, খাওয়া-দাওয়া, বেড়ানো, তোয়াজ, ঠাণ্ডা রাখা—কোনটির ত্রুটি যাতে না হয় তার অতি সুন্দর ব্যবস্থা মামাবাবু করেছিলেন।

খাম্‌খাপুর গেঁয়ো জায়গা; সেখানে খাবার জিনিস বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না, গ্রীষ্মকালে গরমে কষ্ট হয়, টানা পাখা দিয়ে কোনও রকমে গরম দূর করা হয়। বরফ পাওয়া যায় না; পাঁউরুটি, বিস্কুট, কেক এ সব কিছু পাওয়া যায় না। পেট্রল পাওয়া যায় না বলে মোটর রাখাও পোষায় না।

খোকাবাবু কলকাতায় এসে নিত্য নূতন খাবার খাইয়ে, পাখার বাতাস খাইয়ে, বরফ দিয়ে ঠাণ্ডা সরবৎ খাইয়ে, আইসক্রীম খাইয়ে, মোটর চড়ে হাওয়া খাইয়ে মামাবাবু কয়েকদিন তাকে এমন ভুলিয়ে রাখলেন, যে খোকাবাবুর যে মেজাজ চড়া একথা সকলে ভুলেই গেল।

প্রথম দিন যখন মাখন দিয়ে পাঁউরুটি খেতে দেওয়া হয়, খোকাবাবু তা খেয়ে একেবারে খুস হয়ে গেল, এমন জিনিস নাকি আর সে খায়নি। তার পরদিন নানখাটাই বিস্কুট দেওয়া হয়, সেটা খেয়ে তো আরও খুশী। বিস্কুটের নাম করতেই খোকাবাবু ফিক করে হেসে ফেলল। তারপর একদিন মামা কেক নিয়ে এলেন। সেটা খেয়ে তো খোকাবাবু আনন্দে তিড়িং তিড়িং করে নাচতেই লাগল। প্রশংসা তখন আর মুখে ধরে না। খোকাবাবু বলল, 'পাঁউরুটি খুব ভাল, তার চেয়ে ভাল বিস্কুট, তার চেয়ে ভাল কেক।' এখন থেকে প্রতিদিনই খোকাবাবুর জন্য পাঁউরুটি, বিস্কুট, কেক ইত্যাদির ব্যবস্থা হয়ে গেল। কেকের মত ভাল খাবার নাকি দুনিয়ায় আর নাই।

যাক দিনগুলো বেশ যেতে লাগল; খোকাবাবুর মেজাজটাও যেন ক্রমেই ঠাণ্ডা হয়ে আসতে লাগল। ডাক্তার চক্রবর্তীসাহেব পরীক্ষা করে দেখে বললেন, 'আর মাসখানেক এরকম চললে আর কোন ভাবনা থাকবে না। ওষুধপত্র কিছু দরকার নেই। মামার তোয়াজে সব ঠিক হয়ে যাবে।

রোজ বিকালে খোকাবাবু মামার সঙ্গে মোটরে বেড়াতে যায় সেদিনও বেড়াতে বেরিয়েছে, মামাবাবু একটু খবরের কাগজ পড়ছেন, খোকাবাবু আপন মনে নানা জিনিস দেখে বকর বকর করে যাচ্ছে, হঠাৎ খোকাবাবু কি যেন বলল, 'মামা, ...খাব।' কি জিনিস খেতে চাইল তা ভালো করে বোঝা গেল না। মামাও অন্যমনস্ক হয়ে বললেন, 'হাঁ খাবে।' তারপরও দু'-চার বার খোকাবাবু কি যেন 'খাব' বলল; মামাও অন্যমনস্কভাবে বললেন, 'খাবে'।

বাড়ি ফিরে একটু জিরিয়ে নিয়ে খাবার সময় হলে মামা-ভাগ্নেতে খেতে বসলেন। ভাগ্নে খেতে খেতে কি যেন বলে উঠল, শোনাল ঠিক যেন 'হোন্নং খাব' মামা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি খাবে?' খোকাবাবু আবার বলল, 'ফোন্নং খাব।'

মামা বললেন, 'ভাল করে বল কি খাবে?'

সে আবার বলল, 'ফোন্নং খাব!'

এবারই হ'ল মুস্কিল। কেউ আর ঠাওর করতে পারল না, খোকাবাবু কি খেতে চায়। খুশী করার জন্য পাঁউরুটি দেওয়া হ'ল

—খেল না, বিস্কুট দেওয়া হ'ল তাও খেল না। কেক আনা হ'ল; সেটাও দেখে শুধু একবার বলল, 'এবার ফোন্নং আসবে।' কেক কিন্তু ছুঁলও না। খোকাবাবুর কথার কোনও অর্থ না বুঝতে পেরে সকলেই হাঁ করে চেয়ে রইল।

খোকাবাবুরও মেজাজ চড়তে লাগল; শেষটায় একেবারে সপ্তমে চড়ে উঠল, আর পাগলের মত করে, 'ফোন্নং খাব' বলে চিৎকার করতে লাগল। চোখ তার ছানাবড়ার মত বড় হ'ল, মুখ আর কান টকটকে লাল রংয়ের হয়ে গেল; চোখের দৃষ্টি পাগলের মত হয়ে গেল।

মামাবাবু তাকে কোলে তুলে নিয়ে বারান্দায় খোলা হাওয়ায় ইলেকট্রিক পাখার নীচে শুইয়ে দিলেন; কত গল্প বলার চেষ্টা করলেন, কতবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'ফোন্ন কি?' একবার একটু বুঝিয়ে বল, এক্ষুনি এনে দেব।' খোকাবাবু শুধু বলল, 'পাঁউরুটির চেয়ে ভাল বিস্কুট; তার চেয়ে ভাল কেক, তার চেয়ে ভাল ফোন্নং।' ব্যস, আর কিছু খাকাবাবুর কাছে জানা গেল না; খানিক বাদেই আবার পাগলের মত বলতে লাগল, 'ফোন্নং খাব, ফোন্নং খাব।'

বেগতিক দেখে ডাক্তার চক্রবর্তীসাহেবকে ডাকা হ'ল। ডাক্তার এসে দেখেশুনে বললেন, 'অবস্থা ভাল নয়। দ্বৈতারিবাবুকে এখনই টেলিগ্রাম করুন, আর একটা ঘুমের ওষুধ দিচ্ছি সেটা এখনই খাইয়ে দিন। নইলে আরও মাথা গরম হয়ে শেষটায় ডাহা উন্মাদ হয়ে যাবে।'

তখনই দ্বৈতারিবাবুকে টেলিগ্রাম করা হয়ে গেল, আর ওষুধও ডাক্তারখানা থেকে নিয়ে আসা হ'ল, ওষুধ দেখেই খোকাবাবু নাক সিঁটকিয়ে বলল, 'না, এটা ফোন্নং নয়। খাব না এটা—' ব্যস। সেই যে দাঁত চেপে রইল যতক্ষণ পর্যন্ত না ওষুধ সরিয়ে নেওয়া হ'ল, ততক্ষণ আর দাঁত খুলল না। পরে আবার চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'ফোন্নং খাব, ফোন্নং খাব।'

সারারাত কেবল 'ফোন্নং খাব' বলে বসে ক্লান্ত হয়ে ভোরের বেলায় খোকাবাবুর একটু তন্দ্রাভাব জাগল, তখনই ডাক্তার-সাহেবকে ডেকে পাঠানো হ'ল; দ্বৈতারিবাবুও তখন এসে হাজির হলেন। একটু বাদেই খোকাবাবুর ঘুম ভেঙে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে 'ফোন্নং খাব' আরম্ভ হয়ে গেল।

ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, 'উন্মাদের সব লক্ষণই এখন ভালো করে প্রকাশ পেয়েছে। এ সময় যদি এর Lucid moment আসে, তাহলে হলে কিছু আশা আছে, অর্থাৎ কিনা যে কারণে এর পাগলামীর সূত্রপাত হয়েছে সেই কারণটা চোখের সামনে ঘটলে হয়তো হঠাৎ এর পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে।' চারদিকে বিজ্ঞাপন এবং মোটা পুরস্কার ঘোষণা করে দিলে হয়তো একটা কিনারা হতে পারে।'

ডাক্তার চলে যাবার পর দ্বৈতারিবাবু ইংরাজী আর বাংলা কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন আর বললেন, 'পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার পাবার লোভে সকলেই ও বিষয়ে মাথা ঘামাবে আর প্রাণপণে চেষ্টা করবে; কম পুরস্কার দিলে গরজ করবে না কেউ।'

পরের দিন সকালে সব কাগজে বড় অক্ষরে বিজ্ঞাপন বের হ'ল আর চারদিকে ওই ব্যাপার নিয়ে হৈ হৈ রৈ রৈ পড়ে গেল। কত লোক যে এল খোকাবাবুর পাগলামী সারাবার চেষ্টায় তার ঠিকানাই নেই। কত মন্ত্র, শ্লোক, ঝাড়-ফুঁক, যাদু, হিপ্‌নটিজম্ —কত কিছু যে হ'ল তার আর অন্ত নাই। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না।

'সরস সমাচার'-এর সম্পাদক রসিকরাজ রায় চৌধুরী তখন কলকাতায়; সম্প্রতি 'সঞ্জয়' কাগজের সহকারী সম্পাদক হয়ে এসেছেন। কাগজে 'পাগল রহস্য' নাম দিয়ে দ্বৈতারিবাবুর ছেলের পাগলামীর বিবরণ বেরিয়েছে আর তার পাশে পুরস্কার ঘোষণার বিজ্ঞাপনও ছাপা হয়েছে।

রসিকরাজের এ বিষয়ে একটা কৌতূহল হয়েছিল; তাই সে বার বার বিজ্ঞাপন আর লেখাটা পড়ল খানিকক্ষণ, ভেবে কিছু ঠিক করতে না পেরে বিজ্ঞাপনের ডিপার্টমেন্টের ঘরে গেল। একটা নতুন বিজ্ঞাপনের কপি (অর্থাৎ লেখাটি) পড়তে পড়তে হঠাৎ তার চোখ বড় হয়ে উঠল। 'কপি' হাতে করে নিয়ে সে দৌড়ে একেবার দ্বৈতারিবাবুর বাড়ি চলে গেল।

সেখানে গিয়ে মামাবাবুর (হাস্যবিকাশবাবুর) সঙ্গে দেখা করে খোকাবাবুর পাগলামী সম্বন্ধে সব কথা জেনে নিলেন।

কোন রাস্তা দিয়ে ক'টার সময় তাঁরা যাচ্ছিলেন যখন খোকাবাবু প্রথম বলল, 'ফোন্নং খাব'—এ বিষয়টি খুব ভাল করে জেনে নিল। তারপর মামাবাবুকে বলল, 'আমার মনে হচ্ছে ও রোগটা সারাতে পারব। কাল বিকেলে আবার আসব জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে—পাঁউরুটি, বিস্কুট, কেক—যখন আপনাদের ছেলে খেতে ভালবাসে তখন আর ভাবনা কি?' রসিকরাজও কথা বলে চলে গেল; মামাবাবু অবাক হয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে রসিকরাজের দিকে চেয়ে রইলেন, কোনও অর্থ তিনি বুঝতে পারলেন না।

রসিকরাজ সেখান থেকে সটান বিজ্ঞাপনদাতার কাছে গেল। বিজ্ঞাপনদাতা হ'ল সূর্য্য বেকারি; ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে রসিকরাজ বলল, 'আমি একটা দরকারী বিষয়ে আপনার সাহায্য চাই। আপনার সাহায্য পেলে আমার কিছু অর্থলাভ হবার সম্ভাবনা আছে, তা যদি হয়তো আপনাকে একশো টাকা দেব।' ম্যানেজার-মশাই খুব অমায়িক লোক তিনি বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার যথাসাধ্য আপনাকে সাহায্য করব। যা যা খবর আপনি চান সবই আপনাকে দেবার চেষ্টা করব, যদি সেটা আমাদের কোনও জিনিস প্রস্তুতের প্রণালী বা ব্যবসা সংক্রান্ত কোনও গোপনীয় খবর না

হয়।' রসিকরাজ বলল, 'সন্ধ্যায় কাগজে আপনারা যে বিজ্ঞাপন দেবার জন্য কপি পাঠিয়েছেন সেটা কি আপনার লেখা?' ম্যানেজার বললেন, 'লেখা আমারই বটে, তবে বাহাদুরী কিছু নাই; রুটির বাক্সের গায়ে যা লেখা থাকে তা থেকেই লিখেছি, শুধু উপরে এক লাইন যোগ করে দিয়েছি। রসিকরাজ বলল, 'আচ্ছা, বিকেল বেলা লেক রোডের দিকে আপনাদের কোনও লোক রুটির বাক্স নিয়ে যায়?' ম্যানেজার বললেন, হ্যাঁ যায় বইকি; বিকালে সাড়ে পাঁচটা ছ'টার সময় প্রায়ই যায়। রসিক বলল, 'আচ্ছা যে বাক্সটি নিয়ে যায় সেটি একবার দেখতে পারি কি?'

ম্যানেজার তখনই বাক্সটি আনলেন। রসিক বাক্স দেখেই বলল, 'বাঃ। এবার ঠিক ধরেছি, আর দেখতে হবে না।'

তখনই ম্যানেজারের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক হয়ে গেল সেদিন বিকালে রুটির বাক্স নিয়ে একটি লোক তার সঙ্গে দ্বৈতারিবাবুর বাড়ি যাবে। বাক্সে খুব ভাল পাঁউরুটি, বিস্কুট, কেক থাকবে। আর থাকবে এক রকমের মিষ্টি—মাখন, বাদাম, নারকোল এসব দিয়ে তৈরী— রসিকরাজের ফরমাসী জিনিস।

বিকালে ঠিক সময় মতো রসিকরাজ পাঁউরুটির বাক্স নিয়ে দ্বৈতারিবাবুর বাড়ি গিয়ে হাস্যবিকাশবাবুর সঙ্গে দেখা করল। কথা-বার্তার পর ঠিক হ'ল যে পাঁউরুটির বাক্স মাথায় নিয়ে বেকারির লোক আস্তে আস্তে খোকাবাবুর সামনে দিয়ে যাবে। মুখে কিছু বলা হবে না। রসিকরাজও পেছনে পেছনে যাবে; হাস্যবিকাশবাবু তার পিছনে থাকবেন।

যথা সময়ে কথা মত কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। খোকাবাবু ইজিচেয়ারে বসে রয়েছে, সামনের বারান্দা দিয়ে পাঁউরুটির বাক্স নিয়ে লোক চলেছে, তার পিছনে চলেছে রসিকরাজ; তার পিছনে মামাবাবু।

খোকাবাবুর চোখ হঠাৎ পাঁউরুটির বাক্সের উপর পড়ল। যেই চোখ পড়া অমনি তার মুখের চেহারা বদলে গেল। এক গাল হেসে খোকা বলে উঠল, 'পাঁউরুটি— বিস্কুট— কেক—ফোন্নং—ফোন্নং —খাব, ফোন্নং—খাব!' তখনই আবার বলল, 'পাঁউরুটির চেয়ে বিস্কুট ভাল, তার চেয়ে ভাল কেক, তার চেয়ে ভাল ফোন্নং; —ফোন্নং খাব।'

রসিকরাজ তখনই খোকাবাবুকে বলল, 'এক্ষুনই ফোন্নং খাবে।' বলে মামাবাবুকে বলল, 'একটা প্লেট আনতে বলুন।'

মুহূর্তের মধ্যে প্লেট এসে হাজির হ'ল, আর পাঁউরুটিওয়ালা বাক্স থেকে ছোট্ট একটা রুটি বের করে প্লেটের উপর রাখল। খোকাবাবু সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'এই যে পাঁউরুটি।' তারপর তিন-চারটে বিস্কুট রাখা হ'ল; খোকাবাবু বলে উঠল 'বিস্কুট'। তারপর একটা বড় কেক রাখা হ'ল। আর খোকাবাবু বলে উঠল 'কে-এ-এ-ক', এবার ফোন্নং আসবে।' তারপর রসিকরাজের ফরমাসী সেই মিঠাই বের করা হতেই খোকাবাবু আনন্দে আত্মহারা হয়ে একেবারে তিড়িং তিড়িং করে লাফাতে আরম্ভ করল। আর বলতে লাগল, 'এই যে ফোন্নং—এই যে ফোন্নং—ফোন্নং খাব—ফোন্নং খাব।'

কোথায় গেল বা পাগলামী কোথায় গেল মাথা গরম; দিব্যি লক্ষ্মী ছেলের মত বসে খোকাবাবু সেই বিস্কুট, কেক, ফোন্নং ইত্যাদি খেয়ে শেষ করল। তারপর রসিকরাজের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল।

ডাক্তারসাহেব এসে খোকাকে দেখে বললেন, 'যাক, এবার ভাবনা দূর হ'ল; পাগলামী একেবারে সেরে গেল।'

রসিকরাজের পাওনা পাঁচ হাজার টাকা দেবার ব্যবস্থা তখনই হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে হুকুম হয়ে গেল সূর্য্য বেকারি প্রতিদিন এক পাউন্ড ওই 'ফোন্নং' জিনিসটি খোকাবাবুর জন্য দিয়ে যাবে—দাম পাঁচ টাকা পাউন্ড।

রসিকরাজ তখনই সূর্য্য বেকারির ম্যানেজারের কাছে গিয়ে একশোটি টাকা দিল আর 'ফোন্নং'-এর অর্ডারটিও লিখিয়ে দিল।

ম্যানেজার খুশি হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটার নাম 'ফোন্নং' রাখলেন কেন? পাগলামীর রহস্যটাই বা কি? আপনার এ সব ব্যাপার যে আমার কাছে নিতান্তই হেঁয়ালীর মত ঠেকছে।'

রসিকরাজ একগাল হেসে বলল, 'পাগলামী যেমন হঠাৎ ওঠে, তার রহস্য উদঘাটনও তেমনি হয়। ছেলেটি কেন যে পাঁউরুটি, বিস্কুট, কেক এর সঙ্গে ফোন্নং জড়াচ্ছিল সেটাই কারও মাথায় আসেনি। আপনাদের বিজ্ঞাপনের কপি দেখে আমার মাথায় জবাবটি এসেছিল; তাই আমি আপনার কাছে এসে পাঁউরুটির বাক্স দেখতে চাই। বাক্সের উপরের লেখা দেখেই আমি বুঝলাম খোকাবাবু কেন ফোন্নং খেতে চাচ্ছিল। যে জিনিসটির নাম ফোন্নং রেখেছি সেটা আমার নিজের আবিষ্কার। খোকাবাবুর প্রিয় জিনিস পাঁউরুটি, তার চেয়ে প্রিয় বিস্কুট তার চেয়ে প্রিয় কেক—খোকাবাবু মনে করে ছিল ফোন্নং নিশ্চয় তার চেয়ে আরও ভাল হবে। কেন মনে করেছিল জানেন? বাক্সের গায়ে যে লেখা ছিল——

সূর্য্য বেকারি
পাঁউরুটি বিস্কুট কেক
ফোন নং
১৯৯৫, বৌবাজার

এখন থেকে ওই মিঠাইয়ের নাম আপনারা ফোন্নং রাখবেন।

** শ্রাবণ ১৩৪০-এর সন্দেশ থেকে পুনর্মুদ্রিত*

জীবন সর্দার

ছোট্ট-লীলা সেরা এক প্রকৃতি পড়ুয়া। সে আমাকে বলেছে যে তার ছোটবেলাটাই কেটেছে পাহাড়ের বুকে, ঝরণার ধারে ঝর ঝর শব্দ শুনে। প্রচণ্ড বর্ষায়, গরমের মিষ্টি রোদে, শীতের বরফজমা স্পর্শে আর সরলগাছের শোঁ শোঁ শব্দের মধ্যে তার দিন কেটেছে। জন্তু-জানোয়ার, পাখি-প্রজাপতি, পোকামাকড়—তারা যেমন, ছোট্ট-লীলাও তেমনই প্রকৃতির মধ্যিখানে একজন। আলাদা কেউ নয়।

তখনই হঠাৎ সে বড় হয়ে নিজেকে ফিরে পেয়ে আমাকে বললেন, 'তারা আমার মনের পটে যে দাগ রেখে গেছিল, কোনও মানুষের প্রভাবের চাইতে সে কম নয়।'

সে আজ চল্লিশ বছর আগেকার কথা বলছি। সে বছর শততম 'রবীন্দ্র জয়ন্তী'। দেশ জুড়ে অনুষ্ঠানের শেষ নেই। তার সঙ্গে বাংলার ছোটরা নতুন করে পেল 'সন্দেশ'। ওই উৎসবে এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ উপহার আর কী হ'তে পারে—ছোটদের কাছে। 'সন্দেশ'-এর ভেতরকার বিষয়-আশয় নিয়ে সম্পাদকদের সঙ্গে আমাদের তখন জোর আলোচনা চলছে। আমার বিষয় ঠিক হ'তে দেরি হয়নি, কিন্তু তার কাঠামো ঠিক করতে কয়েক মাস কেটে গিয়েছিল। সেই ক'মাস আমি প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তরের কাঠামো জোড়া দিচ্ছিলাম কবি-শিল্পী-বিজ্ঞানীদের নির্দেশ-মতো।

'সন্দেশ'-এর বড় সম্পাদিকা লীলা মজুমদার তখনও সম্পাদকের দায়িত্ব নেননি। কিন্তু তাঁর ঘরে বসে ছোট্ট-লীলার কথা শুনে শুনে প্রকৃতি পড়ুয়ার ছবিটা আমার মনে ফুটে উঠেছিল। আমার সামনে বসে যিনি বলতেন, আমার মাঝে মাঝে মন হ'ত তিনি বড় নন, ছোট্ট-লীলা যেমন গল্প করছে—প্রকৃতির বড় কাছাকাছি থাকতাম। টমাটো গাছে সবুজ শুঁয়োপোকা থাকত। পুষেছিলাম একটাকে। তার গায়ে নীল চোখ আঁকা। ল্যাজের দিকে সবুজ শুঁড়, চার-পাঁচ ইঞ্চি লম্বা। সাবানের বাক্সে ছ্যাঁদা করে তাতে রেখেছিলাম। তাকে রাশি রাশি টমাটো পাতা খেতে দিতাম। তা সে কিছুতেই গুটি বাঁধল না। এখন সব প্রকৃতি পড়ুয়া এমন কাজই করে।

প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তরের কাঠামো ঠিক হয়েছে বিজ্ঞানী আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নির্দেশে। একদিনের আলোচনায় তিনি বলেছিলেন, প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় রাখতে গেলে শিশুর মনে সবার আগে জাগিয়ে তুলতে হবে কৌতূহল। তাদের নতুন নতুন জিনিস সংগ্রহ করার ভার দিতে হবে। তা কেমন করে হবে যদি না তাদের সঙ্গে নিত্যদিন যোগাযোগ থাকে। এই যোগাযোগ রাখার একটা উপায় চিঠি, অন্যটি সামনাসামনি বসে কথা বলা। দপ্তর বসার সঙ্গে সঙ্গে চিঠি চালাচালি শুরু হয়ে গেল, কবি সম্পাদকের পরামর্শে। আর সামনাসামনি বসে কথা বলার একটা নতুন বিভাগ হ'ল প্রকৃতিবিজ্ঞানী গোপালচন্দ্রের নির্দেশে। 'প্রকৃতি পড়ুয়ার পাঠশালা' নাম হ'ল সেই বিভাগের। মাসে একদিন বসতে শুরু করল সেই পাঠশালা। বিশেষ দিনে, বিশেষ সময়ে। আর দলে দলে পড়ুয়ারা এসে জাঁকিয়ে বসতে শুরু করল পাঠশালায়। নানান বয়সের তারা, নানান ক্লাসের। এই স্রোত এখনও চলছে।

প্র. প. দপ্তরের পাতায় যা লেখা হবে আর প্র. প. পাঠশালায় যে কথা আলোচনা হবে সবই কি এক হবে? দু'পাতার লেখা আর দু'ঘন্টার কথা কি এক হতে পারে? পারে না। বিজ্ঞানাচার্যের কথায় আমি ঠিক দিশা পেয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন— গাছপালা, জন্তু জানোয়ার সবের মধ্যেই শিক্ষণীয় জিনিস আছে। প্রত্যেকেই আমাদের সত্যের কাছে পৌঁছে দেয়। আমাদের মধ্যে যদি শ্রদ্ধা থাকে, অজানাকে জানার আকাঙ্খা থাকে, তবে আর সব কিছু সবুজ হয়ে আসবে।

এই কথা মানে আমি সহজে বুঝে গেলাম। একই বিষয় ছোট্ট-লীলার মতো ঘুরে ঘুরে দেখে সহজ ভাষায় লিখে ছাপাবার জন্যে দপ্তরে জমা দিয়েছি। আর চোখে দেখেছি যে সব জিনিস তার রূপগুণ কার্যকরণ নিয়ে আলোচনায় বসেছে পাঠশালায়। ওই নিয়ম এত খাঁটি যে তার বদল হয়নি।

প্রকৃতি পড়ুয়া প্রকৃতিকে পড়ার কোনও সিলেবাস কখনও পায়নি। কেন না প্রকৃতি পড়ার কোনও সিলেবাস নেই। প্রকৃতি যেন খোলা একটি বই। চলতে চলতে দেখে দেখে ওই বইয়ের পাতা উল্টে যেতে হবে। গরম, শীত, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, বসন্তের প্রকৃতিকে তো একরকম দেখি না। না জড়-প্রকৃতির না প্রাণ প্রকৃতির। সব কিছুরই রূপ বদলায়। কালে কালে সেখানে যত অদলবদল দেখতে পাই, তার মধ্যে একটা শৃঙ্খলা রয়েছে—যা আমাদের নজর এড়ায় না। ওই শৃঙ্খলা মেনে যদি পঠন-পাঠনের তালিকা করে নিই তাহলে কোনও নিয়ম

ভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত হ'তে হবে না—এই কথাটি বুঝিয়েছিলেন নিনিদি—সন্দেশের আমৃত্যু মেজ সম্পাদিকা নলিনী দাশ। প্রকৃতিকে জানার ব্যাপারটি তিনি তাঁর পড়াশুনোর অন্যতম বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন বিদেশে শিক্ষাকালে। তাঁর অনুশীলন প্র. প. দপ্তরের কাজে মিল খেয়ে গেল।

প্রকৃতি এক মহাশক্তি — যে শক্তি চারপাশের সব জিনিস সৃষ্টি করেছে আর নিয়ন্ত্রণ করছে। বিশ্বপ্রকৃতি প্রকৃতি-পড়ুয়ার নজরে চারটি জ্ঞানের স্তম্ভের উপর ভর করে আছে। প্রকৃতির যে ভাগ অনুভবেই বোঝা যায়, যে ভাগ প্রাণহীন, প্রাণময় যে ভাগ আর মহাকাশ প্রকৃতি —চারটি বিভাগে প্রকৃতিকে অনায়াসে সাজিয়ে দিয়েছিলেন নিনিদি। অনেক অনেকদিন, হয়তো হাজার বছরের পর আরও হাজার বছর প্রকৃতির রহস্য খোঁজা চলবে। তবুও শেষ হবে না খোঁজা। তারই চিন্তায় এলোমেলো ভাব থাকবে না যদি এমন শৃঙ্খলার পঠন পাঠন চলে। কিন্তু তা কাউকে বুঝতে দিলে চলবে না। শিশুর মনে ঔৎসুক্য আগ্রহ জন্মানো ভালোবাসার টান চাই প্রকৃতির জন্য। শৈশবকালটা এই বিদ্যার চর্চা শুরুর সবচেয়ে ভালো সময়।

প্রথম দিকে প্র.প. পাঠশালায় কিশোর বয়সের ছেলেমেয়েদের ভিড় ছিল। খুব মেধা ছিল তাদের। অল্প কথায় অল্প দেখায় অনেকখানি বুঝে নিত তারা। তারা চাইত ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে বসে প্রকৃতির রূপগুণ, কার্যকারণ আলোচনা করলে শেখা পুরো হবে না। চলো সবাই ঘরের বাইরে নদী-সমুদ্রের ধারে বা গ্রামের পথে, বনের ভেতর, পাহাড়ের উপর—যেখানে যখন সম্ভব সেখানেই প্রকৃতি পড়ুয়ার পাঠশালা নিয়ে চলো। 'সন্দেশ'-এর সম্পাদক সবাই এমনটাই চাইছিলেন। প্রথমে সকাল থেকে সন্ধ্যে, একদিন ঝিলের ধারে। নদীর ধারে, গ্রামের পথে হেঁটে হেঁটে দেখতে শেখা আর দেখে শেখার চর্চা শুরু হ'ল। বছরের ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতেই বিভিন্ন জায়গায় এমন ইচ্ছায় হাজির হ'ত তারা। কিছুদিনের মধ্যে সৈনিকের মতো অনুশাসন রপ্ত করে নিল বাইরের টানে বেরিয়ে পড়া প্রকৃতি পড়ুয়ার দল। তারপর বিদ্যালয়ের গণ্ডী পার হয়েই ভালোলাগা কোনও প্রাকৃতিক পরিবেশে দু'দিন ছুটি কাটিয়ে আসার আবেদন মেনে নিলাম। আর তখন তাদের ভেতরকার প্রতিভা স্ফুরণের সৃষ্টিশীল আবেগের সঙ্গে পরিচিত হলাম। ঘরে বসে এমন শিক্ষা কখনোই হয় না, যা তারা বাইরে ঘুরে পায়। আজও তাই, যখনই প্রকৃতি পড়ুয়ারা যতটুকু সময়ের জন্যে হোক বাইরে কোথাও দল বেঁধে জমায়েত হয়, প্রকৃতি জানা চেনার ফাঁকে ফাঁকে আপনাপন সৃষ্টিকে রূপ দিতে লেগে যায়। আঁকায়-লেখায়-গানে-অভিনয়ে নীরব প্রকৃতিকে দেখে ভুলিয়ে তবে তারা ঘরে ফেরে।

ঘরে ফেরা শুধু ফেরা নয়, চাঙ্গা মন নিয়ে ফেরা। দেখার অনেক নমুনা এনেছে, তাকে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতেই হবে। অনেক দেখার স্মৃতি রয়েছে, তাকে রূপ দিতে হবে। লেখায়, রেখায়। তারপর বলা— খুঁটিনাটি নানান বিষয়ে নানান প্রশ্ন জেগেছে, তার উত্তর জানতে হবে, খুঁজতে হবে। একদিনের একটুখানি দেখা, তা থেকে বিরামহীন কর্ম-চঞ্চলতায় মেতে ওঠে তারা। শুধু কিশোর বয়সের প্রকৃতি পড়ুয়া নয়। শিশু বয়সের প্রকৃতি পড়ুয়াদের মধ্যে একই আবেগ, একই নিয়ম লক্ষ্য করছি আজ। নিজেকে প্রকাশ করার আনন্দ, নাকি তাগিদ, শিশুকাল থেকেই দেখা দেয়। যার যেমন আছে, সে তেমনই প্রকাশ করার চেষ্টা করে। কোনও বাহবা নয় কোনও পুরস্কার পাওয়ার আগ্রহ নয় পড়ুয়া হয়ে ওঠার জন্যে একটু চঞ্চলতা।

প্রথম কথা বলার পর প্রথম পড়া। প্রথম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আজকাল প্রকৃতি পড়ার পাঠ শুরু হয়েছে। এই পাঠ হওয়া উচিত দিদা-ঠাকুমার কাছে, মায়ের কাছে। কেন জানি না, ঠাকুমা, দিদিমা বা বাবা-মায়ের সঙ্গে অনেক শিশু প্র. প. পাঠশালায় হাজিরা দেয়। তার চেয়েও মজার কথা, সব বয়সের প্রকৃতি পড়ুয়াদের সঙ্গে সে বেশ মানিয়ে নেয়। আর তার চেয়ে অনেক অনেক বয়সে বড় কোনও প্রকৃতি পড়ুয়া তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে তালিম দিয়ে সার্থক প্রকৃতি পড়ুয়া করে গড়ে তোলে। ঘর থেকে বাইরে প্রকৃতির আলোয় গিয়ে এই জিনিসটা বেশি করে নজরে পড়ে। যেন এটাই প্রকৃতির নিয়ম, তুমি যা জানো এক জনকে তা জানিও, শেখাও। প্রাকৃতিক পরিবেশে লালন পালন শেখানোর দায়িত্ব নিজে থেকে নিয়ে নেয় যেন এটা আগে থেকেই নির্দিষ্ট। আসলে তার প্রথম কিছু সূচনা করার জন্যে নিজেকে তৈরি করেছে।

অনেক দূরের পথ পাড়ি দিয়ে এসে আমার খুব মনে হয় এতটা পথ এসেছি নাকি। অনেক দিনের পর আজ মনে হচ্ছে প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তরে একটা কাজ হয়েছে নাকি। যা হয়েছে সত্যি বলছি মাত্র শুরুটা হয়েছে, যা হবে তা এখনও অনেক বাকি।

সুধাবিন্দু বিশ্বাস

(দ্বিতীয় পর্যায়ের সম্পাদক)

জগৎ-বিখ্যাত আবিষ্কারক এডিসনসাহেব সেদিন মারা গিয়েছেন। এডিসনসাহেবের নাম শোনে নাই লেখাপড়া জানা এমন লোক বোধ হয় কেউ নাই। তাঁহার আবিষ্কারের সুফল তো তোমরা সকলে প্রতিদিনই উপভোগ করিতেছ। এডিসন সাহেব তাঁহার বালক বয়স হইতে এ পর্যন্ত কত রকম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি যে আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন তাহার আর ঠিক ঠিকানা নাই। আজ যে সকলে ঘরে বাইরে এখানে ওখানে বিজলী বাতি জ্বালিয়া আলোয় আলোয় সব আলোময় করিতেছে, রাতকে দিন করিয়া ফেলিতেছে, তাহা এই এডিসনেরই দান। এই যে এখানে-ওখানে-সেখানে এমনি কি গ্রামের কুটিরে পর্য্যন্ত গ্রামোফোন কল ঘুরাইয়া সকলে কলের গান শুনিতেছ তাহার মূলেও ওই এডিসন। বায়োস্কোপের ছবি দেখা, তাও এডিসনেরই দান। বায়োস্কোপের ছবির সঙ্গে সঙ্গে যে অভিনেতাদের কথাও শুনিতে পাওয়া যায়, সেও এই এডিসনেরই আবিষ্কার। কত দূর-দুরান্তর ও দেশ-দেশান্তর হইতে আজকাল লোকে টেলিফোনে বা টেলিগ্রাফের সাহায্যে কথাবার্তা বলিতেছে, আলাপ করিতেছে ও খবরাখবর পাঠাইতেছে– ইহাও সহজ করিয়া তুলিয়াছেন সেই একই ব্যক্তি— এই এডিসন–

অথচ ছোটবেলায় তিনি অন্য দশজন শিশুর মতোই ছিলেন। এমন কি একটু বড় হইলে সকলে তাঁহাকে বোকা বলিয়াই মনে করিত। কেহ কেহ আবার তাঁহাকে পাগল বলিয়া ভাবিত। তাঁহাকে স্কুলে ভর্তি করিয়া দিবার তিন মাস পরে তার শিক্ষকরাও ঠিক করিলেন যে এডিসন একেবারেই বুদ্ধিহীন, তাঁহার দ্বারা লেখাপড়া হওয়া অসম্ভব। স্কুল হইতে তাঁহারা এডিসনের নাম কাটিয়া দিলেন।

এডিসন মাত্র তিন মাস স্কুলে পড়াশুনো করিয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহার মাতাই তাঁহার শিক্ষার ভার লইলেন। এডিসনের মা ছিলেন খুবই বুদ্ধিমতী। অপরে যে যাহাই মনে করুক, তিনি জানিতেন এডিসনের শক্তি কতখানি। তাঁহার সযত্ন শিক্ষার গুণে এগারো বৎসর বয়সেই এডিসন অনেক বিষয়ে শিখিয়া ফেলিলেন। এই অল্প বয়সের মধ্যেই তিনি রোমের ইতিহাস, ইংলন্ডের ইতিহাস, পৃথিবীর ইতিহাস, এক পর্ব বিশ্বকোষ ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক বই শেষ করিয়া ফেলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান পিপাসা তাঁহার আরও বাড়িয়া চলিল। বিশেষতঃ বিজ্ঞান ও কলকব্জা সম্বন্ধে কোনও না কোনও বই সর্বদাই তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন ও পড়িতেন।

নিতান্ত ছোটবেলা হইতেই নানা রকম যন্ত্রপাতি লইয়া পরীক্ষা করা তাঁহার অভ্যাস ছিল। পিতামাতার নিকট হইতে দু'-এক পয়সা যাহা পাইতেন পরীক্ষা করিবার কলকব্জা ও ঔষধপত্রের জন্যই তাহার সমস্তই খরচ হইয়া যাইত। তাঁহার বয়স যখন মাত্র বারো বৎসর তখন তিনি স্থির করিলেন নিজেই অর্থ উপার্জন করিবেন। অনেক কষ্টে পিতামাতার মত করিয়া তিনি এই উদ্দেশ্যে রেলগাড়ীতে খবরের কাগজ বিক্রয়ের কাজ লইলেন। নিজের আসল উদ্দেশ্য কিন্তু ভুলিলেন না। রেলগাড়ীরই এক কোণে শিশি বোতল ও কলকব্জা লইয়া ল্যাবোরেটরী করিলেন ও নানারকম পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গেই কিছু টাইপ ও ছোট ছাপিবার যন্ত্র লইয়া রেলগাড়ীর মধ্যে "Weekly Herald" নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র নিজেই বাহির করিতে লাগিলেন। এই পরীক্ষাগার কিন্তু বেশী দিন তিনি রাখিতে পারিলেন না। একদিন চলন্তগাড়ীর ঝাঁকানিতে খানিকটা ফসফরাস উল্টাইয়া পড়িয়া গাড়িতে আগুন ধরিয়া যায়। গাড়ীর গার্ড রাগিয়া গিয়া এডিসনের জিনিসপত্র সব ফেলিয়া দেয় ও এডিসনকে খুব প্রহার করে। এই প্রহারের ফলে তাঁহার শ্রবণশক্তি নষ্ট হইয়া যায়। পরে লোকের শত অনুরোধে তিনি শ্রবণশক্তি ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা করেন না। কারণ তাঁহার

ভয় ছিল যে শুনিতে আরম্ভ করিলে হয়তো কাজে তিনি একান্তভাবে মন দিতে পারিবেন না—কাজ করিবার প্রতি এই তাঁহার একাগ্রতা।

খবরের কাগজ বিক্রয়ের কাজ হইতে তিনি টেলিগ্রাফের কার্যে যান। তাহার পর হইতে তিনি টেলিগ্রাফ পাঠাইবার কার্যে নানা উন্নতিসাধন করেন। প্রথম পেটেন্ট লইয়াছিলেন তিনি মাত্র একুশ বৎসর বয়সে। তাহার পর ক্রমে ক্রমে নানা দিকে অনেক রকম আবিষ্কারই চলিতে লাগিল।

সব কিছু তন্নতন্ন করিয়া জানিবার ও পরীক্ষা করিয়া দেখিবার এই মজ্জাগত ইচ্ছা ও চেষ্টার জন্যই বালক কালে হয়ত তাঁহাকে বোকা ও পাগল আখ্যা পাইতে হইয়াছিল। অতি সাধারণ বিষয়ে সম্বন্ধেও তিনি এটা কেন, ওটা কেন বলিয়া এত প্রশ্ন করিতেন ও ঠিকমত উত্তর না পাইয়া এত গম্ভীর হইয়া ভাবিতে বসিতেন যে সকলেই ভাবিত ছেলেটা বড় বোকা। আবার যখনই নূতন কোনও কিছু জানিতে পারিতেন তখনই তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া তিনি এমন সব কাণ্ড করিতেন যে লোকে তাঁহাকে পাগল ভাবিত। ছেলেবেলায় শুনিলেন যে ডিম হইতে বাচ্চা ফুটাইবার জন্য হাঁস মুরগী ডিমের উপর বসিয়া থাকে। অমনি নিজেই ডিম হইতে বাচ্চা বাহির করিবার ইচ্ছায় হাঁসকে তাড়াইয়া নিজেই তার ডিমের উপর বসিয়া রহিলেন। আর একবার কে তাঁহাকে বলিয়াছিল কতগুলি জিনিস জলে গুলিয়া খাইলে আকাশে উড়িতে পারা যায়। অমনি সেই জিনিসগুলি জলে গুলিয়া বাড়ির ঝিকে খাওয়াইয়া দেখিতে লাগিলেন ঝি উড়িয়া যায় কিনা।

এই সবই লোকে তাঁহার বোকামী ও পাগলামী মনে করিত। কিন্তু সব কিছু সমন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ভাবিয়া দেখা, অল্প অল্প করিয়া সব পরীক্ষা করা, হিসাবমত সব গড়িয়া তুলিবার জন্য ঐকান্তিক অধ্যবসায় ও একাগ্রমনে পরিশ্রমই ছিল এডিসনের জীবনের বিশেষত্ব। বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার অদম্য উৎসাহ কমে নাই। ৮০ বৎসর বয়সে তিনি রবার গাছের আঠার পরিবর্তে অন্য কোনও গাছের আঠা দিয়া রবারের কাজ চালানো যায় কিনা তাহার পরীক্ষায় নিযুক্ত হন। সেজন্য প্রায় ২০০০ গাছ গাছড়া সংগ্রহ করিয়া সেগুলি পরীক্ষা করিতে থাকেন, এবং পৃথিবীর যেখানে যত রবার সম্বন্ধীয় বই লেখা হইয়াছে সেগুলি সংগ্রহ করিয়া পড়িতে আরম্ভ করেন।

এডিসনের পুরো নাম টমাস আলভা এডিসন। তিনি ১৮৪৭ খৃস্টাব্দে আমেরিকার মিলান শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম সামুয়েল এডিসন এবং মাতার নাম ন্যান্‌সী ঈলিয়ট এডিসন।

ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয় যে কি সামান্য অবস্থা হইতে তিনি কেবলমাত্র নিজের বুদ্ধি এবং পরিশ্রমের বলে কি অসাধারণ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁর আবিষ্কারের সংখ্যা এক হাজারের অনেক বেশি—পেটেন্টই লইয়াছিলেন ১১৫০টি। তাঁর আবিষ্কারের সাহায্যে এমন যে সকল কাজ কারবার চলিতেছে, হিসাব করিয়া দেখিলে তাহার মূল্য হয় ১১০০০,০০,০০,০০০ (এগারো হাজার কোটি) টাকা। এই একটিই মাত্র লোকের বুদ্ধি অধ্যবসায় পরিশ্রমের ফলে মানবজাতি কি বিপুল জ্ঞান ও ধন সম্পদেরই না অধিকারী হইয়াছে।

অগ্রহায়ণ ১৩৩৮ সংখ্যা হইতে মুদ্রিত।

বৃদ্ধ এডিসন

কিশোর এডিসন

এডিসন-নির্মিত পৃথিবীর প্রথম বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র (নিউ ইয়র্ক)

ছেলেবেলায় একটু একটু একগুঁয়েমো প্রায় সকলেরই থাকে। আমার কথা শুনিয়া কেহ চটিবেন না। চটিলেও বড় একটা অসুবিধা বোধ করিব না। অনেকের অভ্যাস আছে তাহারা খাঁটি কথা শুনিলে বিরক্ত হয়, কিন্তু কাহাকেও বিরক্ত করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমার নিজের দশা দেখিয়াই আমি উপরের কথাগুলিতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি।

ছেলেমানুষের একটা রোগ আছে। অনেক কাজ তাহারা আপনা আপনি করিয়া অন্য লোককে বিরক্ত করে, আবার যদি কেহ সেই কাজ তাহাদিগকে করিতে বলিল অমনি সেই কাজের মিষ্টত্বটুকু তাহাদের নিকট হইতে চলিয়া যায়। দাদা প্রথম বই পড়িতে শিখিয়াছে, তার বইয়ে সুন্দর সুন্দর ছবি। পড়িবার সময় দাদা বই খুঁজিয়া পাইত না। আমার চোখে পড়িলেই আমি বইখানা হস্তে করিয়া, কেহ খুঁজিয়া না পায় এমন কোনো জায়গায় যাইয়া বসিতাম। শেষে একদিন শুনিলাম ঐ বইখানা আমারও পড়িতে হইবে। আমার আনন্দের সীমা রহিল না; তখনই দৌড়িয়া যাইয়া সঙ্গীদের সকলকে খবরটা দিয়া আসিলাম। পরদিন মাস্টার আসিলেই বই হাতে করিয়া হাজির। মনে করিলাম, প্রথম ছবিটার কথা আজ হইবে। মাস্টার প্রথম ছবির পাতায় একটু আসিলেনও না—ছবিশূন্য একটা পাতা উল্টাইয়া এ, বি, সি, ডি করিয়া কি বলিতে লাগিলেন। তখন হইতে আর সে বই আমার ভাল লাগিল না।

দাদা ইস্কুলে যাইবার সময় মাঝে মাঝে আমাকে সঙ্গে করিয়া নিয়া যাইত। দাদাদের মাস্টার বড় ভাল মানুষ। আমি মনে করিলাম ইস্কুলের সকল মাস্টারই বুঝি ঐরূপ। বাড়িতে তিন বছর থাকিয়া কয়েকখানা বই শেষ করিলাম। তাহার পর আমাকেও স্কুলে পাঠাইয়া দিল। কয়েক বছর বেশ চলিতে লাগিলাম ; কিন্তু মাস্টারকে আর তত ভাল লাগে না। কবে বড় মানুষ হইয়া ইস্কুল ছাড়িয়া দিব এই চিন্তাটা বড় বেশী মনে হইত। তখন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি। ইংরাজি যে যে কয়েকখানা বই পড়িয়াছিলাম তাহার একখানিতে এক সাহেবের কথা লেখা ছিল। তিনি বাড়ি ছাড়িয়া বিদেশে গিয়াছিলেন, সেখানে অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া শেষটা অনেক টাকা করিয়াছিলেন। সাহেব যে বয়সে বাড়ি ছাড়িয়াছিলেন, মিলাইয়া দেখিলাম আমারও এখন ঠিক সেই বয়স। তবে আর চাই কি। ক্লাসে সতীশের সঙ্গে আমার বড় ভাব ;—আমি সতীশের কাছে মনের কথাগুলি খুলিয়া বলিয়া ফেলিলাম। কথা শুনিয়া সতীশ যেন আর তার ছোট শরীরটির মধ্যে আঁটে না। তখনই সে লাফাইয়া উঠিল। বোধ হইল বাড়ি হইতে বিদেশে চলিয়া গেলেই বড়লোক হওয়া যাইবে; সতীশ বলিল, "কালই চল।" কাল চলাটা তত সহজ বোধ হইল না। কিন্তু বেশী দেরী করা হইবে না, সেটা ঠিক করা হইল।

একদিন ইস্কুল হইতে ছুটী লইয়া বাড়ি আসিলাম; সতীশও আসিল। বাবা বাড়ি ছিলেন না। বাড়ির অন্যান্য লোকও চুপ করিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। চুপি চুপি কয়েকখানা কাপড় দিয়া একটি পুঁটলী বাঁধিলাম। তারপর বাবার বাক্স হইতে কতকগুলি টাকা লইয়া দু'জনে চোরের মত বাড়ির বাহির হইলাম। পাছে কেহ আসিয়া ধরে সেই ভয়ে দু'জনে মাঝে মাঝে দৌড়াইতে লাগিলাম। এইরূপে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাঁটিয়া এক বাড়িতে যাইয়া উঠিলাম।

সেই বাড়ির কর্তা আমাদের অবস্থা দেখিয়া বড় দুঃখিত হইলেন ; আমাদের সমন্ধে যা যা কথা সমস্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমরা কোনো কথারই ঠিক উত্তর দিই নাই। স্থানে স্থানে দু'-একটি কথা গড়িয়া কহিতে হইল। তিনি আমাদের কথায় বুঝিয়া লইলেন যে আমরা দুজন পথ হারাইয়া ঘুরিতেছি ; বলিলেন, 'কাল আমি একজন লোক দিয়া তোমাদের দু'জনকে বাড়ি পাঠাইয়া দিব।'

খাইবার সময় ভদ্রলোকটি আমাদের সম্মুখে বসিয়া থাকিলেন, আমাদের আহার শেষ না হওয়া পর্যন্ত উঠিলেন না। একটি কুঠুরিতে আমাদের দু'জনের ঘুমাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইল। সেখানে আর কেহ ঘুমাইতে আসিল না। আমি কিছু সুবিধা বোধ করিলাম; ভাবিলাম কর্তা যাহা বলিলেন তাহা কাজে করিলে আর

বড়লোক হওয়া হইবে না; সুতরাং কেহ জাগিবার পূর্বেই কর্তাকে ধন্যবাদ না দিয়া চলিয়া যাওয়া ঠিক হইল।

সতীশকে ডাকিলাম, 'সতীশ। সতীশ।'—সতীশ কথা কয় না। সতীশের চক্ষে জল পড়িতেছে। কর্তার কথায় সতীশের মন ফিরিয়া গেল নাকি? বাস্তবিকই তাই; অনেক পীড়াপীড়ি করার পর বলিল, 'আমি তোমার সঙ্গে যাইব না।' আপনারা কি মনে করিতেছেন? সতীশের কথা শুনিয়া আমার মনের ভাব কি প্রকার হইল? বড়লোক হওয়ার ইচ্ছাটা আমার এত বেশী হইয়াছিল, যে বাড়ি ছাড়িয়া অবধি আমার বোধ হইতেছিল—যেন বড়লোকের কাছাকাছি একটা কিছু হইয়াছি। সতীশকে আমি কাপুরুষ মনে করিতে লাগিলাম। সতীশের মা-বাপ আছেন, আমারও মা-বাপ আছেন। প্রভেদ এই যে আমি স্বার্থপর, সতীশ তাহা নহে। সতীশের মনে যে সকল চিন্তা উঠিতেছিল, আমার অন্তঃকরণে তাহার স্থান পাইল না। আমি সতীশের অবস্থা বুঝিতে পারিলাম না। মা-বাপের মনে কষ্ট দেওয়া আমার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু নিজের কথা লইয়া এত ব্যস্ত ছিলাম যে তাঁহাদের কথা ভাবিবার অবসরই পাই নাই। নানা চিন্তার মধ্যে ঘুম আসিল।

ঘুমাইতে ঘুমাইতে স্বপ্ন দেখিলাম যে আমি বাড়িতে কি একটা কথা লইয়া মা'র সঙ্গে রাগারাগি করিয়াছি। মা কত সাধিতেছেন, আমার ভ্রূক্ষেপ নাই; রাগ যেন ক্রমেই বাড়িতেছে। মা'র চক্ষে জল পড়িতেছে দেখিয়া যেন আমার প্রতিহিংসার ভাবটা চরিতার্থ হইতে লাগিল। আমি দাঁত খিঁচাইয়া মাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিলাম। মা আমার হাত ধরিতে আসিলেন; আমি পাশের একটা গাছে উঠিতে চেষ্টা করিলাম। হঠাৎ পা পিছলাইয়া পড়িয়া যাইতেছিলাম; এমন সময় আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। স্বপ্নের কথা ভাবিয়া চক্ষে দু' ফোঁটা জল আসিল; কিন্তু আবার সেই বড় লোক হওয়ার কথা! সতীশের মন ফিরিয়া গিয়াছে। সতীশ জাগিয়া আর যাইতে চাহিবে না, হয়ত আমারও যাওয়া হইবে না। রাত হয়তো আর বেশী নাই; এইবেলা সতীশকে না বলিয়া চলিয়া যাওয়াই ভাল। আমি আস্তে আস্তে উঠিলাম। আমার কাপড় আর টাকাগুলি লইয়া বাহির হইলাম। রাত্রি তখনও অনেক ছিল, কিন্তু আমার বোধ হইতে লাগিল যেন এই ভোর হইয়া আসিতেছে। একটা বড় রাস্তা ধরিয়া চলিলাম। অনেকক্ষণ হাঁটিলাম, কিন্তু রাত ফুরায় না। রাস্তাটা একটা বড় নদীর ধারে যাইয়া শেষ হইয়াছে; আমিও সেই স্থানে যাইয়া থামিলাম,—তারপর যাই কোথা? রাস্তাটা নিশ্চয় ওপারে যাইয়া আবার চলিয়াছে কিন্তু ওপারে যাই কেমন করিয়া? এতক্ষণ রাত ফুরাইল না। হয়তো আরো অনেক দেরী। ঘাটে একখানি নৌকা বাঁধা ছিল—নৌকার ছই নাই। একজন লোককে অনায়াসে ওরূপ নৌকা অনেকবার চালাইতে দেখিয়াছি, আমার বোধ হইতে লাগিল আমিও পারি। নৌকায় উঠিতে বিলম্ব হইল না। যে লগিটিতে নৌকা বাঁধা ছিল তাহা তুলিয়া লইলাম। ডাঙ্গায় ভর করিয়া ঠেলিয়া নৌকা জলে ভাসাইয়া দিলাম। জলের গায় এত জোর আগে ভাবি নাই। শোঁ শোঁ করিয়া নৌকার গায় জল বাঁধিতে লাগিল; নৌকাখানা ঘুরিয়া গেল। হঠাৎ ঘুরিবার সময় তাড়াতাড়িতে লগিটি ছাড়িয়া দিলাম। নৌকা ঘুরিয়া ঘুরিয়া ডাঙ্গা হইতে অনেক দূরে যাইয়া পড়িল—স্রোতে ভয়ানক বেগের সহিত ভাসিয়া যাইতে লাগিল। আমি কিছুকাল হতবুদ্ধি হইয়া থাকিলাম।

বিপদের পরিণামটা প্রথম তত বুঝি নাই, শেষে কিছু কিছু করিয়া হুঁস হইতে লাগিল। মাথা ঘুরিয়া গেল। দুহাতে চোখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িলাম। ঢেউগুলি তড়াক তড়াক করিয়া নৌকাখানাকে দোলাইতে লাগিল। তখন মায়ের মুখখানি মনে হইল। কেন বাড়ি ছাড়িয়া আসিলাম? সেই অন্ধকার রাত্রি, সেই ভয়ানক নদী, আর বাড়ির ছোট কুঠরীটি—সেই কেমন সুন্দর বিছানাটি মনে হইল। দুই চক্ষে জল পড়িতে লাগিল। সেই আঁধারে পড়িয়া, মা মা বলিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। কেন সতীশের সঙ্গে গেলাম না? তাহাকে কেন ছাড়িয়া আসিলাম?

এইভাবে কতক্ষণ ছিলাম বলিতে পারি না। হঠাৎ নৌকাখানি একদিকে যাইয়া ঠেকিল। চমকিয়া দেখিলাম কতকগুলি বড় বড় নৌকা তাহারি একটাতে আমার নৌকা ঠেকিয়াছে। আমি সেই মুহূর্তের জন্য আশ্বস্ত হইলাম; কিন্তু তার পরক্ষণেই নৌকা হইতে কতকগুলি কালো অর্ধ-উলঙ্গ লোক বাহির হইয়া কেউ মেউ করিয়া কি বলিতে লাগিল; আমি বুঝিতে পারিলাম আমাকে গালি দিতেছে। তাহারা আমার কথা বুঝিল বলিয়া বোধ হইল না। আরো বেশী গালাগালি দিতে লাগিল। ক্রমে অন্যান্য নৌকার লোক আসিয়া গোলমালে যোগ দিল। আমার কথা শুনিয়া সকলেই ঐ লোক-গুলিকে গালি দিতে লাগিল। একটি ভদ্রলোক সেখানে ছিলেন; তিনি দয়া করিয়া আমাকে তাঁহার নৌকায় লইয়া গেলেন। নিজ হাতে আমার পুঁটলীটি যত্নসহকারে এককোণে রাখিয়া দিলেন। তারপর আমাকে বলিলেন, 'আমি কা— যাইতেছি; তোমার আপত্তি না থাকিলে আমার সঙ্গে যাইতে পার। আমার বাড়িতে তোমার কোন ক্লেশ হইবে না।' আমি তাঁহার সঙ্গেই চলিলাম।

কা— ছোট একটি সহরের মত। অনেক লোক। বড়লোকও অনেকগুলি আছেন। আমি যাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলাম, তাঁহাকে এখানে কালিদাসবাবু বলিব, তিনিও একজন বড়লোক। এইসব দেখিয়া শুনিয়া আমার পুরাতন রোগ আবার দেখা দিল। আমি ভাবিতে লাগিলাম এখানে থাকিয়া বড়লোক হওয়া যায় কি? যায় বৈকি। না হইলে ইহারা এত গাড়ী ঘোড়া চড়ে কি করিয়া? বোধ হইল যেন কালিদাসবাবুর বাড়িতে থাকিয়া থাকিয়া হঠাৎ একদিন বড়লোক হইয়া যাইব।

একদিন কালিদাসবাবু ডাকিলেন। কালিদাসবাবুর উপর প্রথম হইতেই আমার শ্রদ্ধা হইয়াছিল। যখনই তিনি আমাকে ডাকিতেন তখনই একখানা সুন্দর কিছু উপহার পাইতাম। আমার বয়সের অনেকেই এখন ভাল কাজ করিতেছেন; কিন্তু আমার যেন তখনও শিশুভাবটা যায় নাই। কালিদাসবাবুও তাহা বেশ বুঝিতেন; যাহা হউক আমি কালিদাসবাবুর নিকট যাইয়া দাঁড়াইলাম। তিনি আমার

নাম ধরিয়া বলিলেন, 'গিরিশ, এখানে তোমার কেমন লাগে?'

'দিব্যি।'

'বটে? তা এখান থেকে তোমার আর কোথাও যেতে ইচ্ছে হয় না?'

'কোথায় যাব? এখানেই থাকব।'

'তা বেশ,' বলিয়া কালিদাসবাবু কপাল হইতে চশমা নামাইয়া ছাপার কাগজ পড়িতে লাগিলেন। কাগজের প্রথম পাতায় একটি ছবি। আমার সেই সাহেব। আমি একটু আশ্চর্য হইলাম। অনেক দিন পরে কোনো পরিচিত বন্ধুর সাক্ষাৎ পাইলে যেরূপ হয় আমারও সেইরূপ হইল। একটি ছোট কথা আমার মুখ দিয়া বাহির হইল; আমি বলিয়া উঠিলাম, 'আরে।' কালিদাসবাবু কাগজ নামাইয়া আমার মুখের দিকে চাহিলেন। তাহার অর্থ, ব্যাপারখানা কি?

আমি বলিলাম, 'আজ্ঞে ঐ ছবিটে।'

'ইনি একজন বড়লোক ছিলেন; তোমারও বড়লোক হতে ইচ্ছে হয়, না?'

আমি ভাবিলাম এই বুঝি। হঠাৎ প্রশ্ন হওয়াতে থতমত খাইয়া বলিলাম, 'বড়লোক কি সবাই হয়?'

'হয় বৈকি। ইচ্ছে করলে তুমিও হতে পার।'

'আমি পারি?'

'অবিশ্যি। কাল থেকে তোমাকে ইস্কুলে পাঠিয়ে দিব ভেবেছি। লেখাপড়া না শিখলে বড়লোক হওয়া যায় না। তাই তোমাকে ডেকেছিলাম। কেমন?'

আমার বাতাসের ঘর ভাঙ্গিয়া গেল। যার চোটে বাড়ি ছাড়া সেই আপদ। আমি কোন কথা কহিলাম না। কালিদাসবাবু এতে সন্দেহ করেন নাই, সুতরাং কিছু বলিলেন না। এরূপ কথাবার্তা কালিদাসবাবুতে আর আমাতে অনেকদিন হইত। তিনি আমার অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন:— 'সেই রাত্রিতে সেই নৌকায় কেমন করিয়া আসিলে।' 'বাড়ি কোথা?' 'মা বাপ নাই?' ইত্যাদি, —আমি প্রায়ই চুপ করিয়া থাকিতাম। কালিদাসবাবুর ইচ্ছা ছিল, সুযোগ পাইলেই আমাকে বাড়ি পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু এসব সম্বন্ধে কোনো খবরই আমি তাঁহাকে দিতে চাহিতাম না। তখন তিনি সে সব বিষয়ে ক্ষান্ত হইয়া সেখানেই আমাকে লেখাপড়া শিখাইবার মনস্থ করিলেন।

ইস্কুলে যাইয়া অবধি আমার আর মনে শান্তি ছিল না। কয়েকদিন কোনোমতে কাটাইলাম, কিন্তু শেষটা অসহ্য হইয়া উঠিল। কালিদাসবাবুর বাড়িতে থাকা হইবে না। কিন্তু হঠাৎ যাই কোথায়। গেলেও আর এবার হাঁটিয়া যাওয়া হইবে না। কা— হইতে দু'খানা স্টিমার ধু— তে যাতায়াত করিত। সপ্তাহে দু'দিন স্টিমার চলে। ধু—যাইতে তিন দিন লাগে। হিন্দুরা এই তিনদিনের চিঁড়ে পুঁটলী বাঁধিয়া লইয়া জাহাজে উঠে। ভোরবেলা জাহাজ ছাড়ে।

একদিন নদীর ধারে বেড়াইতে যাইয়া দেখি একখানা স্টিমার এইমাত্র ঘাটে আসিয়া থামিল। পরের দিন ভোরে চলিয়া যাইবে। হঠাৎ স্টিমারে উঠিয়া ধু— চলিয়া যাইতে আমার বড় ইচ্ছা হইতে লাগিল। বাড়ি আসিয়া কেহ না দেখে এমন ভাবে আমার কাপড়-চোপড় সব একত্র জড় করিলাম। কালিদাসবাবুর বাড়ি আসিবার কালে সঙ্গে করিয়া যে টাকা আসিয়াছিলাম তাহার একটিও ব্যয় হয় নাই। কালিদাসবাবুও মাঝে মাঝে আমার ইচ্ছামত খরচ করিবার জন্য দু'-একটি দিতেন। শুনিয়াছিলাম বড়লোকেরা সহজে টাকা খরচ করিতে চাহে না।

যাত্রার উপযোগী সকল জিনিস প্রস্তুত রাখিয়া ঘুমাইলাম। মনে একটা চিন্তা থাকিলে সহজে ঘুম হয় না, ঘুম হইলেও শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া যায়। আমারও তাই হইল। বড় কামরার ঘড়িতে চারটা বাজিল, আমি অমনি উঠিলাম। সঙ্গে পুঁটলীটি। পুঁটলীতে কয়েকখানা কাপড়, একজোড়া চটী জুতো, নগদ কিছু টাকা, কালিদাসবাবু মাঝে মাঝে যে উপহার দিতেন সেগুলি—কয়েকখানা ছবি, একটা বড় ছুরি,—আর আমার স্কুলের পুস্তকগুলি। পুস্তকগুলি কেন সঙ্গে লইলাম ঠিক বলিতে পারি না; তবে কালিদাসবাবু বলিয়াছিলেন, 'লেখাপড়া না শিখলে বড়লোক হওয়া যায় না', তাহাতেই মনে কেমন একটা ভয় রহিয়া গিয়াছিল। এইরূপ সাজসজ্জা করিয়া, ছাতাটি হাতে করিয়া, বিছানার চাদরখানা পুঁটলীর উপর জড়াইয়া আস্তে আস্তে বাহির হইলাম। স্টিমার ঘাটে আসিতে অধিকক্ষণ লাগিল না। সেইখানেই মুদীর দোকান আছে, সেই দোকান হইতে চিঁড়ে কিনিয়া বিছানার চাদরের এক কোণে বাঁধিয়া লইয়া, জাহাজের একজন লোক আমাকে একটা জায়গা দেখাইয়া দিল, আমি সেইখানে যাইয়া বসিলাম। জাহাজে বিশেষ কিছু ঘটনা হইল না। তবে সঙ্গে যে টাকা আনিয়াছিলাম তাহা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। নিয়মিত সময় জাহাজ ধু— পৌঁছিল।

রামলোচনবাবু আমাদের ওদিককার লোক, তিনি ধু— তে থাকেন, সেখানকার একজন নামজাদা উকীল। আমি ভাবিলাম দেশের একজন লোক, তাঁর কাছে গেলে তিনি অবশ্যই কিছু খাতির করিবেন। জাহাজ হইতে তীরে উঠিয়াই তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। একটি ভদ্রলোক তাঁহার বাড়ি দেখাইয়া দিলেন। আমি আস্তে আস্তে বাড়ির একজন চাকরের মত লোককে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'রামলোচন-বাবুর এই বাড়ি?' সে লোকটা আমার কথার উত্তর দেওয়া দূরে থাকুক আমার দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিল না। মুখ বিকৃত করিয়া একটা বড় ঘরে চলিয়া গেল; অগত্যা আমি অন্য লোকের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। সে যাহা বলিল তাহাতে জানিলাম, আমি যাহাকে রামলোচনবাবুর চাকর মনে করিয়াছিলাম, তিনিই রামলোচনবাবু। তাই অত রাগ। আমি ভয়ে ভয়ে রামলোচনবাবুর ঘরের দরজায় দাঁড়াইলাম। তিনি একটা তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। অত কালো আমি আর দেখি নাই। মোটা বেশী নন, কিন্তু প্রায় বুকের উপর কাপড় পরেন। গোঁফগুলি সোজা সোজা। চুল অধিকাংশ পাকিয়া গিয়াছে। কানে একটা কলম। হাঁটুর উপর পর্যন্ত কাপড় টানিয়া বসিয়াছেন। উরুদেশের উপর একটা লম্বা খাতা রাখিয়া তাহাই দেখিতেছেন, আর মাঝে মাঝে কাহার উদ্দেশে মুখ

বাঁকাইতেছেন। তাকিয়ার একটা অংশে কলম মুছিবার স্থান বলিয়া বোধ হইল। কিছুকাল পরে দেখিলাম যে তাহা নহে। পাশে একটি মাটির দোয়াত। তাহা হইতে ঘাঁটিয়া এক কলম কালি লইয়া খাতায় যেন কি লিখিলেন। তারপর কলমটি মাথার চুলে ঘসিয়া কাণে বসাইয়া হাতের দু'টি আঙুল তাকিয়ার ঐ স্থানটিতে পুঁছিলেন। তার পরক্ষণেই এক হাতের কনুই তাকিয়ার উপর রাখিয়া, একখানা পা আমার দিকে বাড়াইয়া 'ভাউ' শব্দে উদগার করিলেন। শেষটা আমার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিলেন। প্রথম প্রশ্ন হিন্দি ভাষায় হইল; তাহার পর বাঙ্গালা।

'কি চাই?'

'আজ্ঞে, আমি অনেক দূর থেকে এসেছি—'

'আমিও অনেক দূর থেকে এসেছি।'

'আমার নিবাস সু—।'

'আমারও নিবাস সু—। তারপর?'

'মহাশয় যদি—'

'ম—হা—শ—য় যদি। কি—ঞ্চিৎ—সা—হা—য্য? দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার আমার কাছে নাই। হিঁয়াসে চলে যাও।'

আমি আর এক মুহূর্তও সেখানে বিলম্ব করিলাম না। কোথা যাইব ঠিক নাই, কিন্তু রামলোচনবাবুর বাড়িতে আর পদার্পণ করা হইবে না। রাস্তার বাহির হইয়া একজনের কাছে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, 'যে কোন মুদীকে পয়সা দিলেই থাকবার যায়গা আর খেতে দেবে।' মুদীর দোকান খুঁজিয়া লওয়া কঠিন বোধ হইল না। দু'দিন মুদীর দোকানে খাইলাম। কিন্তু এরূপভাবে খাইলে বেশীদিন পয়সায় কুলাইবে না, এই চিন্তায় রাত্রিতে ঘুম হয় না। একদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া মুদীর পয়সা হিসাব করিয়া দিলাম। তারপর পুঁটলীটি হাতে করিয়া বাহির হইলাম। রাস্তায় কতদুর হাঁটিয়া দেখি একটা বড় বাড়ি। এ বাড়ির কর্তা রামলোচনবাবুর মত নাও হইতে পারেন। আস্তে আস্তে বৈঠকখানার দিকে গিয়া দেখিলাম কর্তা বসিয়া আছেন, আর ইয়ারগোছের একটা অভ্যাগত লোক তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন। আমি দাঁড়াইবা মাত্রই কর্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে বাপু?'

আমি।—'আমি পথিক, কষ্টে পড়েছি।'

ইয়ার।—'বড় খিদে পেয়েছে বুঝি?'

আমি কোন উত্তর করিলাম না; ইয়ারবাবু উত্তর দিকে আঙুল নির্দেশ করিয়া চোখ বড় করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন—

'হোটেল আছে, হোটেল। বাবুর্চি লোক দিব্যি রাঁধে, রোজ পাঁচ টাকাতেই চলে।'

আমি নিরাশ হইয়া বাবুর দিকে তাকাইলাম। বাবু ইয়ারের উপর

অত্যন্ত রাগ করিয়া বলিলেন, 'নিজের বাড়িতে একটি লোককে খেতে দিতে পার না, আবার অন্য লোকের বাড়ি এসে চাষামো কর। আর আমার বাড়ি এসো না।' বলা বাহুল্য। বাবুর উপর আমার ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালবাসা সম্মান ইত্যাদি যত হইতে পারে, সব কটা জন্মিয়া গেল। বাবু আমাকে বলিলেন, 'তোমার অন্য কোনোরূপ কষ্ট না হ'লে আমার বাড়িতে তোমার থাকবার জায়গা আর খাবার বন্দোবস্ত হতে পারে।'

'আজ্ঞে আমি অমনি থাকতে চাইনে। আপনার কিছু কাজ করে দিব, তার পরিবর্তে যদি কিছু খাবার দেন তাহা হইলে ভাল হয়।'

'উত্তম। তুমি ইংরাজী লিখতে পার?'

'কিছু কিছু ইংরাজী পড়েছিলাম বটে, কিন্তু ভাল লেখাপড়া জানি না।'

'কতদূর পড়েছ?'

আমি বলিলাম।

'বেশ! তাতেই হবে।'

আমি বাবুর বাড়ি রহিলাম কাজের মধ্যে এই, বাবুর চিঠিপত্র সব একটা নকল করিয়া রাখিতে হয়। এখানে থাকিয়া মাঝে মাঝে বাড়ির কথা ভাবিতাম। বড়লোক হইবার জন্য কত কষ্ট পাইলাম, কিন্তু বড় লোক হইবার তো লক্ষণ দেখিতেছি না। কেবল বাড়ি হইতে চলিয়া আসিলেই কি বড়লোক হওয়া যায়? আরো কিছু চাই, আমার তাহা নাই। এইরূপ যতই ভাবিতে লাগিলাম ততই বাড়ি ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা হইতে লাগিল। শেষটা ঠিক করিলাম বাড়ি যাইতে হইবে। আমার হাতে যে কিছু টাকা আছে তাহাতে পথ খরচা চলিবে না। সুতরাং এবার স্টিমারে যাওয়া হইবে না। বৈ— তীর্থ এখান হইতে বড় বেশী দূরে নয়; সেখানে গেলে সঙ্গী পাওয়া যাইতে পারে। এইরূপ চিন্তার পর মনে করিলাম, বাবুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া বৈ— যাইব; সেখানে সঙ্গী পাইলে তাহাদের সহিত বাড়ি যাইব।

কর্তার নিকট হইতে বিদায় লইয়া বৈ— আসিতে বড় বেশী দেরী হইল না। যায়গাটা দেখিতে বড় সুন্দর, একটি ছোট পাহাড়, তার উপরে তীর্থ স্থান। পাথরের গায় সিঁড়ি কাটা আছে। সেই সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে হয়। প্রথমেই যাহাকে দেখিলাম তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, 'যাত্রীরা কোথায় থাকে?' সে বলিল, যাত্রীদের থাকিবার ভাল জায়গা নাই। প্রায় সকলেই পাণ্ডাদের বাড়িতে থাকে। উপরে যে দেবমন্দির, সেই মন্দিরের পুরোহিতদের নাম পাণ্ডা। পাণ্ডা খুঁজিতে অধিকক্ষণ ঘুরিতে হইল না। প্রথমে যে পাণ্ডা আমাকে দেখিল সেই হাত ধরিয়া আমাকে তাহার বাড়ি লইয়া গেল।

পাণ্ডার বাড়ি দু'দিন থাকিয়াই বুঝিতে পারিলাম যে বিষয়টা তত সুবিধাজনক নহে। আমি যে সময় গিয়াছি সে সময় যাত্রীরা প্রায়ই আসে না। সঙ্গী পাইতে হইলে আরো তিনমাস অপেক্ষা করিতে হইবে। তিন মাসের তো কথাই নাই, পাণ্ডা মহাশয় যেরূপ করিলেন তাহাতে তৃতীয় দিনেই আমাকে পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে হইল। তৃতীয় দিন সকালে পাণ্ডা আসিয়া বলিলেন,– 'দেখিবি? চল্।' আমি চলিলাম। অনেক জিনিস দেখা হইল। শেষে এক জায়গায় গেলাম; সেটি একটি বড় মন্দির। মধ্যে গহ্বর, গহ্বরের নীচে ছোট এক ঝরণার মত। পাণ্ডা বলিল, 'এখানে পূজা করিতে হইবে।' কত লাগিবে তাহারও হিসাব দেওয়া হইল। আমি দেখিলাম, তাহলে আমার বাড়ি যাওয়া হয় না। আমি বলিলাম, 'আমি ছেলেমানুষ, পূজা কি করিব?' পাণ্ডা চটিয়া গেল; সেদিন হইতে আর আমাকে তাহার বাড়িতে জায়গা দিল না। অগত্যা আমার সেখান হইতে প্রস্থান করিতে হইল। কিছু দূর গেলেই কতকগুলি ছোট ছোট ছেলে আসিয়া—'পয়সা' 'পয়সা' করিয়া আমাকে ঘিরিয়া ধরিল। আমি কোনো মতেই পয়সা দিতে চাহিলাম না। তাহারা ক্ষেপিল। কেহ গাল দেয়, কেহ কাপড় ধরিয়া টানে, কেহ দূর হইতে ছোট ছোট ঢিল ছুঁড়িয়া ফেলে। আমার মাথা গরম হইয়া গেল। কাছে একখানা ছোট কাঠ পড়িয়া ছিল, রাগের চোটে তাহাই হাতে করিয়া লইয়া ছেলেগুলোকে তাড়া করিলাম। মুহূর্তের মধ্যে সকলে অদৃশ্য হইল। আমার যেন ভূত ছাড়িল। সেখান হইতে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পাহাড়ের প্রায় অর্দ্ধেক পথ আসিয়া পড়িলাম। তখন মনে হইল, জুতা জোড়াটি ফেলিয়া আসিয়াছি। কিন্তু ইহার পূর্বের ২৫ মিনিটের মধ্যে পাহাড় সম্বন্ধে যেটুকু জ্ঞানলাভ করিয়াছিলাম, তাহাতে মনে ভয়ানক আতঙ্ক উপস্থিত হইতে লাগিল। আমি জুতার আশা পরিত্যাগ করিলাম। চলিবার সময় সর্বদাই চটি জোড়াটি পুঁটলিতে বাঁধিয়া লইয়া যাইতাম, এক্ষণে তাহাই খুঁজিয়া লইলাম।

পাহাড়ের নীচে নামিতে নামিতে অনেক বেলা হইল। একটু একটু করিয়া ক্ষুধা বাড়িতে লাগিল। কোনো দোকানে যাইতে হইলে অন্ততঃ এক প্রহর চলিতে হইবে। সেই রোদে আর এক ঘণ্টা চলাই অসম্ভব বোধ হইতে লাগিল। পথের ধারে দু'-একটি গাছ দেখিলে ইচ্ছা হইতেছিল যে সেই খানেই শুইয়া পড়ি। কিন্তু একদিকে তৃষ্ণায় গলা শুকাইয়া যাইতেছে এবং অন্যদিকে ক্ষুধায় পেট জ্বলিতেছে। কি করিব কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া পথের ধারে একটি বাড়ি খুঁজিয়া লইলাম। বাড়িতে উঠিয়া একটা বড় ঘরে গেলাম; সেখানে দু'টি ছেলে বসিয়া ছিল। আমি তাহাদের নিকটে আমার ক্ষুধার কথা জানাইলাম, তাহারা "তুই", "তুই", করিয়া আমার কথার উত্তর দিতে লাগিল। একজন বলিল—

'বাঙ্গালী লোক চোর আর খ্রীষ্টান; বাঙ্গালী লোককে কিছু দিব না।'

'আমি ভদ্রলোক ব্রাহ্মণ; চোর নই।'

'যা তুই এখান থেকে: c-r-i-p crip : d-a-s-h dash'

আমার তখন ঠাট্টার মেজাজ ছিল না। তথাপি এরপর আর হাসি থামাইতে পারিলাম না। তখন তাহাদের ধরণের কথা কহিতে লাগিলাম ঃ—

'ওর মানে কি হোল?'

'ও ইংরাজি। Ram is ill. I will not let him run in the sun। বাঙ্গালী লোক চোর ; যা তুই এখান থেকে।'

'তোরা ইস্কুলে পড়িস?'

এবার যেন তাহারা কিছু ভয় পাইল। বলিল, 'আমাদের মাস্টার বড় বই পড়ে।'

'তোমাদের মাস্টারের চাইতে আমি কি কম একটা কিছু? এই দেখ্ তো!'

আমার পুঁটলিতে যে বইগুলি ছিল, তাহার মধ্যে Lamb's Tales ও ছিল। সেইখানা এখন বাহির করিলাম।

এইবেলা একটু পরিবর্তন দেখা গেল। তাহাদের মুখভঙ্গিতে বুঝা গেল যেন তাহারা মনে করিয়া লইয়াছে যে আমি একটা কিছু হব। একজন মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে উঠিয়া গেল। যে রহিয়া গেল আমি তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া তাহার সহিত আলাপ পরিচয়ের চেষ্টা করিতে লাগিলাম। তাহার কথায় বুঝা গেল যে তাহারা দুই ভাই। সে ছোট। বাবা নাই ; মা আছেন ; ইস্কুলে পড়ে ; টাকা আছে ; চাকর চাকরাণী আছে। বলা বাহুল্য, সে বাড়িতে তখনকার জন্য আমার বিশ্রামের সংস্থান হইল।

আমার জন্য একটি ছোট ঘর নির্দিষ্ট করা হইল। আমি তাহাতে যাইয়া বসিলাম। তখন সকলের খাওয়া হইয়া গিয়াছে সুতরাং নূতন আহারের আয়োজন করা হইল। একজন আসিয়া আমাকে স্নান করিতে বলিল। আমি কাছের একটা পুকুর হইতে স্নান করিয়া আসিলাম। আসিয়া দেখিলাম যে জল খাবারের জন্য কতকগুলি ভিজানো চাল আর কিছু সন্দেশ লইয়া বড় ছেলেটি আমার ঘরে বসিয়া আছে। চালগুলি ভিজিয়া ঠিক ভাতের মত হইয়াছে। সেখানে খাবার সময় ঐরূপ চাল অনেককে খাইতে দেখিয়াছি। আমি খাইতে বসিলাম। ছেলেটি আমার কাছে বসিয়া রহিল। তাহার ভাবভঙ্গীতে বোধ হইতে লাগিল যেন কিছু বলিতে আসিয়াছে। কিছুকাল পরেই সে আমার গায় মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। আমি কিছু চমৎকৃত হইয়া তাহার দিকে চাহিলাম। সে বলিল—'মা ব'লে দিয়েছেন আপনি ব্রাহ্মণ, আপনি শাপ দিলে আমার অনিষ্ট হবে। আমি আপনাকে মন্দ কথা বলেছি।'

'তোমার উপর আমি রাগ করি নাই। তোমার কথায় আমার কিছুমাত্র অনিষ্ট হয় নাই। আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা ক'রিব, যেন তিনি তোমার ভাল করেন।' তাহাকে বুঝানো কিছু কষ্টকর বোধ হইল। কিন্তু শেষটা সে যেন সুখী হইল এবং বলিল, 'তবে যাই, মা'র কাছে বলিগে।'

বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিলে সেই ছেলে দু'টির নিকট বিদায় লইয়া বাহির হইলাম। সেদিন রাত্রিতে এক বাজারে মুদীর দোকানে ছিলাম। তারপর দুই দিন ঐ ভাবে গেল। সারাদিন পথ চলিতাম; কেবল দু'বেলা খাবার জন্য কোনো মুদীর দোকানে উঠিতাম। রাত্রিতে কোনো মুদীকে পয়সা দিয়া তাহার ঘরে থাকিবার জায়গা পাইতাম। তৃতীয় দিন রাত্রিতে থাকিবার জন্য আর মুদীর ঘর পাইলাম না। কাজেই একজন গৃহস্থের বাড়ি যাইতে হইল। গৃহস্থ জায়গা দিতে কোনো আপত্তি করিলেন না। কিন্তু খাওয়া শেষ হইলে "কড়া", "বগুণো" সব দেখাইয়া বলিলেন, 'কাল চলে যাবার আগে এইগুলো মেজে দিয়ে যেতে হবে। তুমি বাঙ্গালী, তোমার এঁটো কে নেবে?' আমি মহা বিপদে পড়িলাম। বলিলাম, 'ওগুলো আমি ছুঁই নাই। তবে আমি যা যা ছুঁয়েছি সেগুলো দাও, এখনি মেজে দিচ্ছি।' সুতরাং একখানা থালা আর একটি বগুণো (বগুণোতে ডাল ছিল) আমার ঘাড়ে চাপিল। তিনি বাড়ির কাছে একটা পুকুর দেখাইয়া দিলেন, আমি তথায় যাইয়া সমস্ত পরিষ্কার করিয়া আসিলাম। প্রায় অর্ধঘন্টা সময় লাগিল।

পরিশ্রমের পর সুনিদ্রা হইল। পরদিন গৃহস্থ ডাকিয়া ঘুম ভাঙ্গাইলেন। উঠিয়া দেখি সূর্য উঠিয়াছে। তাড়াতাড়ি পুঁটলি হাতে করিয়া বাহির হইলাম। গৃহস্থের নিকট বিদায় লইবার সময় ফা— যাইবার পথ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, 'একটা বড় মাঠ, তারপর একটা পাহাড়, তারপর ফা—। একই পথ, ভুল হবার যো নাই।'

কিছুদূর হাঁটিয়াই একটা মাঠে আসিলাম। সেখানে পথিকদিগের জন্য একটি ঘর আছে। তথায় একজনার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহার সঙ্গে একটা ঘোড়া। সে আমাকে দেখিয়াই বলিল, 'বেশ, চল। একজন সঙ্গীর জন্য বসিয়াছিলাম।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সঙ্গীর প্রয়োজন কি?' সে বলিল, 'তুমি আর কখনো এখানে চল নাই? একা গেলে খেয়ে ফেলবে।' আমার ভয় হইল।

মাঠের এপাশ থেকে ও পাশ দেখা যায় না। অতি কম চওড়া পথ ; দশবারো হাত অন্তর ছোট ছোট খসখসের ঝোপ। জীবজন্তুর মধ্যে একজাতীয় পাখি। পক্ষীটি একটি চড়াই অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড়, গায়ের রং সবুজ, ঠোঁট সরু এবং লম্বা, স্বভাব অত্যন্ত চঞ্চল। ক্রমাগত একই রূপ শব্দ করিতেছে—"টিরিরিণ টিরিরিণ টিরিরিণ"। লেজে একটা নতুনত্ব আছে। লেজের মধ্যদেশ হইতে প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা একটি সুঁচের মত বাহির হইয়াছে। আমার সঙ্গী বলিল, 'শ্বশুর বাড়ী গিয়ে ছুঁচ চুরি করেছিলেন। তাতেই ঐ শাস্তি।' অন্য কিছু না থাকাতে ঐ পাখিকেই বার বার ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলাম।

বেলা আন্দাজ চারিটার সময় ছোট একটি ঘর দেখিতে পাইলাম। সঙ্গী বলিল, 'আজ এখানেই থাকিতে হইবে।' আমি প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম, 'চারটের সময় বসে থাকতে হবে কেন?'

সঙ্গী বলিল, 'মাঠে রাত হলে বাঘে খাবে।' বাঘে খায় এরূপ ইচ্ছা আমার ছিল না। সুতরাং সে রাত্রির জন্য ঐ ঘরেই থাকিলাম। রাত্রিতে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া অনেক প্রকার শব্দ শুনিতে পাইলাম। সে সব নাকি হাতির শব্দ। সৌভাগ্যক্রমে হাতিগণ আমাদের কোনো খবর লইতে আসিলেন না। কিন্তু পরদিন উঠিয়া দেখি ঘোড়াটি নাই। ঘোড়ার স্বামী অনেক আক্ষেপ করিল।

মাঠ পার হইতে প্রায় চারটা বাজিল। মাঠ যে জায়গায় শেষ

হইয়াছে, সেখানেও দেখিলাম একটি ছোট ঘর। সেখানে আসিলে সঙ্গী বিদায় লইয়া অন্য পথে গেল। আমি আমার নির্দিষ্ট পথে আস্তে আস্তে চলিলাম। কিছুদূর যাইয়া একটি মাহুতকে পাইলাম,—সে হাতি লইয়া ফা— চলিয়াছে। আমি চারি আনার পয়সা দিব বলাতে সে আমাকে তাহার হাতির পিঠে একটু স্থান দিল। মহাসুখে ফা— আসিলাম। কালিদাসবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সাহস পাইলাম না। রাত্রিতে একটি মুদীর দোকানে থাকিয়া পরদিন ভোরে রওয়ানা হইলাম।

পথে যে সকল ছোটখাট ঘটনা হইয়াছিল। তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। তবে একদিনের কথা বলা আবশ্যক। দুই প্রহরের পর আর মানুষের সাড়া শব্দ পাইলাম না। বেলা যতই কমিয়া আসিতে লাগিল, ততই ক্রমাগত নির্জন স্থানে যাইয়া পড়িতে লাগিলাম, তারপর কেবল একটা মাঠ; দুইধারে উলুবন এবং অন্যান্য দুই একটি ছোট ছোট গাছ। এরূপ জায়গায় সন্ধ্যা হইল। কি করি, কোথায় যাই। প্রাণপণে দৌড়িতে লাগিলাম। পথ এত সংকীর্ণ যে দুই পাশের গাছে গা লাগে। থাকিয়া থাকিয়া আমার বুক গুড়গুড় করিয়া উঠিতে লাগিল। এমন সময় হঠাৎ যেন পিঠে একটা কি লাগিল। চমকিয়া ফিরিয়া দেখিলাম একজন পাহাড়ী লোক। সে আমাকে কি একরকম ভাষায় বলিল, 'তুই কোথায় যাস? তোর প্রাণের ভয় নাই?' এই বলিয়া সে আমাকে তাহার পিছু পিছু যাইতে সঙ্কেত করিল। আমি সহজেই তাহার আজ্ঞা পালন করিতে লাগিলাম। সে দুই হাতে উলুবন সরাইয়া শূয়রের মত দৌড়াইতে লাগিল, আর মাঝে মাঝ আমাকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল 'আরে আয়, মরে যাবি।' আমি হতবুদ্ধি হইয়া তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলাম।

কতক্ষণ এইরূপে চলিলাম বলিতে পারি না। অবশেষে একটা বড় নদীর ধারে আসিলাম। সেখানে দেখিলাম আরো কয়েকজন লোক বসিয়া আছে। পাহাড়ী বলিল যতক্ষণ নৌকা আসিয়া ও পারে না যায়, ততক্ষণ এখানে বসিয়া থাকিতে হইবে। আমি তাহাদের সঙ্গে মাটিতে বসিলাম। অন্যান্য সকলে পুঁটলি হইতে খাবার খুলিয়া খাইতে লাগিল। পাহাড়ীর সঙ্গে কতকগুলি কমলালেবু ছিল। সে আমাকে তাহার খাবারটা খাইতে দিল। আমি তাহাই খাইয়া, নাক মুখ কাপড়ে ঢাকিয়া সেইখানেই শুইয়া পড়িলাম। অন্যান্য লোকেরা আমাকে বলিতে লাগিল 'ঘুমিও না, খেয়ে ফেলবে।' তেমন অবস্থায় ঐরূপ উপদেশ বাক্যের অত্যন্ত আবশ্যক ছিল, কারণ সমস্ত দিনের পরিশ্রমে আমার গা অবশ হইয়া আসিতেছিল। এবং একটুকু পরেই অতি নিকটে "ঘ্যাঁওর ঘ্যাওর" করিয়া বাঘ ডাকিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি চারিপাশে দূরে নিকটে হিংস্র জন্তুর শব্দ হইতে লাগিল। সে রাত্রির কথা আমার জীবনে আর কখনও ভুলি নাই। নৌকাওয়ালাও পারে বসিয়া সুখভোগ করিতেছে; সেখানে নৌকা বোঝাই না হইলে ফিরিয়া আসিবে না। সমস্ত রাত্রি আমাদের প্রাণ হাতে করিয়া সেই ভয়ানক স্থানে বসিয়া থাকিতে হইল। পরদিন নৌকা আসিলে আমরা ওপারে গেলাম।

ইহার তিনদিন পরে বাড়ির কাছের বাজারে আসিলাম, সেখানে দৈ চিড়ে সন্দেশ ইত্যাদি যাহা কিছু মনে হইল উদরস্থ করিয়া পথকষ্টের প্রতিহিংসা বিধান করিলাম। দুইটার সময় বাড়ি আসিলাম। তখন বাহির বাটিতে কেহ ছিল না। গা ভয়ানক কাঁপিতে লাগিল; শীতে অস্থির হইয়া গেলাম। আশে পাশে যে কয়খানা লেপ কাঁথা ছিল, উপর্যুপরি গায় দিয়া বিছানায় পড়িলাম। শক্ত জ্বর হইল। ফাঁকি দিয়া বড় লোক হওয়ার স্বপ্নটা ভাল রকমেই ভাঙ্গিয়া গেল।

কুইজের উত্তর (*সুখাদ্য সন্দেশ*)

১। ১৩২০ সালের ১লা বৈশাখ।
২। দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, মেজদাদামশাই।
৩। সুনির্মল বসু।
৪। 'সে'।
৫। সুধাবিন্দু বিশ্বাস।
৬। শিবাণী রায়চৌধুরী।
৭। চিত্তপ্রসাদ।
৮। হট্টমালার দেশে।
৯। উইলিয়াম স্ট্যানলী পিয়া-সন।
১০। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, চেঙ্গিস ও হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালা।
১১। প্রসাদ রায়, মন্মথ চৌধুরী।
১২। দীপক চক্রবর্তী (*চিরঞ্জিত*), খুড়ো ভাইপো ও দুদাড়ি।
১৩। অনিতা অগ্নিহোত্রী (চট্টোপাধ্যায়)।
১৪। পুটুরাণী, ডাইনিবুড়ি ও বাবাই ম্যাগাঃ।
১৫। গৌরী ধর্মপাল (চৌধুরী)।
১৬। অজয় হোম।
১৭। ম্যারাকট ডীপ্।
১৮। 'কিং কং', 'বেনহার'।
১৯। ক্যাট ট্রেনিং সেন্টার, ইন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায়।
২০। নীতিশ মুখোপাধ্যায়।

সন্দেশের অলংকরণ

দেবাশীষ দেব

বাংলা ১৩৬৮ সালের বৈশাখ থেকে সত্যজিৎ রায় তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে এবং তাঁকে সঙ্গে নিয়েই নতুন করে 'সন্দেশ' পত্রিকা বের করতে শুরু করেন। সেই থেকে আজ অবধি একটানা চল্লিশ বছর ধরে নিয়মিত বেরোচ্ছে 'সন্দেশ'— সত্যজিৎ এতটা আশা করেননি, বরং প্রথম থেকে 'দেখা যাক কি হয়' গোছের একটা ভাব ছিল তাঁর মনে। ছবি তৈরির মত জটিল ও পরিশ্রমের কাজ নিয়ে তখন তিনি সর্বক্ষণ ব্যস্ত, তবু তারই ফাঁকে যে তিনি সন্দেশের মতো একটা ছোটদের কাগজ সম্পাদনার ভার নিয়েছিলেন তার কারণ তিনি মনে করতেন 'সন্দেশ' হ'ল তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্য।

এই পত্রিকাটির জন্ম সত্যজিতের ঠাকুর্দা উপেন্দ্রকিশোরের হাতে, এবং পরবর্তীকালে এর দায়িত্বে ছিলেন সত্যজিতের বাবা সুকুমার ও কাকা সুবিনয় রায়। এঁদের মধ্যে উপেন্দ্রকিশোর ও সুকুমার প্রায় একাই 'সন্দেশে'-এর প্রতিটি সংখ্যা ভরিয়ে দিতেন লেখা আর ছবিতে। শিশু সাহিত্যে এঁরা ছিলেন বিরল প্রতিভা। সত্যজিৎ যে এ ব্যাপারে সচেতন ছিলেন তা বোঝা যায়, কারণ সম্পাদনার কাজে হাত দিয়েই তিনি নিয়মিতভাবে সন্দেশে লিখতে শুরু করেন এবং সেই সঙ্গে পত্রিকার লে-আউট ও ইলাস্ট্রেশনের সমস্ত দায়িত্বও নিজের হাতে তুলে নেন।

সিনেমা করতে আসার আগে পেশাগতভাবে সত্যজিৎ ছিলেন দারুণ সফল একজন গ্রাফিক ডিজাইনার—এ ছাড়া প্রচ্ছদশিল্পী এবং ইলাস্ট্রেটর হিসেবেও তাঁর নামডাক ছিল যথেষ্ট, ফলে ছবি আঁকার ব্যাপারে প্রথম থেকেই তিনি হয়ে উঠলেন সন্দেশের প্রধানতম আকর্ষণ।

গোড়াতেই ধরা যাক মলাটের কথা। প্রথম সংখ্যা থেকেই সত্যজিৎ নিজের হাতে সন্দেশের মলাট আঁকতেন—একই ডিজাইন রং পাল্টে সারা বছর ব্যবহার হ'ত—পরের বৈশাখ থেকে আবার নতুন মলাট। একটা বিশেষ কার্টুন-ধর্মী স্টাইলে আঁকতেন প্রতিটি ছবি—বাচ্চা ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে। বাঘ, সিংহ, কচ্ছপ, হাতি, হনুমান, পালোয়ান, রোবট সবাই এসে হাজির হ'ত সন্দেশের মলাটে—বেশ একটা খেয়াল-রসের ছোঁয়া থাকত। যেমন বীর হনুমানের মাথায় গন্ধমাদন পর্বতের জায়গায় থালা ভর্তি সন্দেশ, কিংবা একজন মোটাসোটা রাজামশাই গপ-গপ করে সন্দেশ খাচ্ছেন আর গোলগোল চোখে সন্দেশ পত্রিকা পড়ছেন। একেবারে শেষের দিকে অসুস্থতার বছরগুলো বাদ দিলে বরাবরই 'সন্দেশ'-এর জন্য নিত্যনতুন মলাট এঁকে গিয়েছেন সত্যজিৎ। মলাট যথেষ্ট আকর্ষণীয় না হলে যদি পাঠকের কাছে সন্দেশের চাহিদা কমে যায় সেই কথা ভেবেই মলাট আঁকার দায়িত্ব অন্য শিল্পীদের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকেননি সত্যজিৎ। তবে পত্রিকার ভেতরের ইলাস্ট্রেশানের ব্যাপারে প্রথম থেকেই তাঁকে অন্যান্য শিল্পীদের সাহায্য নিতে হয়েছিল, কারণ প্রতি মাসে পত্রিকার প্রয়োজনে প্রচুর ছবি আঁকতে হবে—সত্যজিতের

একার পক্ষে যা অসম্ভব। যদিও ১৯৬১ থেকে তাঁর মৃত্যু অবধি এই তিরিশ বছরে তিনি সন্দেশের জন্য যা কাজ করেছেন ভালো-মন্দর বিচারে তো নয়ই এমনকি সংখ্যাগত বিচারেও সন্দেশের অন্য কোনও শিল্পী তাঁর ধারে কাছে আসতে পারেননি।

প্রধানতঃ সন্দেশের জন্য লেখালেখিকে কেন্দ্র করেই যেমন সত্যজিতের সাহিত্যজীবনের শুরু, তেমনই শুধুমাত্র সন্দেশের দাবী মেটাতে তাঁকে দিনের পর দিন সক্রিয়ভাবে একজন পুরোদস্তুর ইলাস্ট্রেটরর ভূমিকা পালন করে যেতে হয়েছিল, এর ফলে সত্যজিতের প্রতিভার এই দিকটি ধীরে ধীরে এমন এক ব্যাপক পরিপূর্ণতা লাভ করে তা এক কথায় নজিরবিহীন। যখনই কোনও লেখার সঙ্গে ছবি আঁকতেন; তাতে চমৎকার ভাবে ফুটে উঠত সঠিক মেজাজটা—এর ফলে কি ড্রয়িং-এ, কি ক্যালিগ্রাফিতে, কত অভিনব স্টাইল যে তাঁর হাত থেকে বেরিয়েছে তা বিস্ময়কর।

লীলা মজুমদারের 'মাকু' বা 'টং লিং'-এর ছবিতে যেমন আছে কিছুটা হালকা মজার উপাদান, তেমনি 'নিকুঞ্জের ন্যাকামি' গল্পের ছবিতে বেশ একটা কমিকাল চেহারা পাওয়া যায়।

অসাধারণ হেড-পিসের ব্যবহার সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'বড়মামার দাঁত' গল্পে, যেখানে বিশাল হাঁ করা বড়মামাকে এঁকেছিলেন এবং গল্পের নামের হরফগুলো সারি বেঁধে মুখের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে। আবার অজেয় রায়ের 'ফেরোমন' 'মুঙ্গু'র যে সিরিয়াস মেজাজ সেটা বোঝাতে ছবিতে চমৎকার আলোছায়ার ব্যাবহার করেছেন। নিজের লেখা প্রোফেসর শঙ্কু বা ফেলুদা এবং একেবারে শেষের দিকে তারিণীখুড়ো-সিরিজের ছবিগুলোতে ছোট ছোট ডিটেলের ব্যবহার চমৎকার ভাবে গল্পের সঠিক পারিপার্শ্বিকটাকে এনেছেন। এরই পাশে 'ব্যাঙ রাজা' বা 'যমুনাবতীর কাসুন্দি' গল্পের ছবিতে রয়েছে খাঁটি রূপকথার মেজাজ। ৭০-৭১ সাল নাগাদ দু'-বছর ধরে 'সন্দেশ' বের হ'ল বড় ট্যাবলয়েড সাইজে—এই সময় সত্যজিৎ মলাটের জন্য পরপর চারখানি দারুণ স্ট্রিপ কার্টুন এঁকেছিলেন—এই প্রথম আর এই শেষ—পরে আর কোনওদিন 'কমিক্স' করার কথা ভাবেননি। ১৯৮৩ সালের শেষাশেষি থেকে অসুস্থতার কারণে সন্দেশের জন্য কাজ অনেক কমিয়ে দেন

ছবি: সত্যজিৎ রায়

ছবি: সত্যজিৎ রায়

সত্যজিৎ—শুধুমাত্র পুজো-সংখ্যাগুলোতে বেছে বেছে কিছু নামী লেখকদের গল্পের সঙ্গে ইলাস্ট্রেশন করে দিতেন। এই পর্যায়ে কিছুদিন তাঁর কাজে দুর্বলতার ছাপ থাকলেও ক্রমশঃ সেটা কাটিয়েও উঠেছিলেন। তারপর ৯২'র এপ্রিলে তাঁর চির বিদায়।

নতুন পর্যায়ের সন্দেশের চার দশকের হিসেব নিলে দেখা যাবে প্রথম দুটো দশকেই সত্যজিতের উপস্থিতি সব থেকে বেশি—বিশেষ করে দ্বিতীয় দশকেই (মোটামুটি ভাবে ১৯৭০—১৯৮০) তাঁর শ্রেষ্ঠ কাজগুলি সন্দেশে ছাপা হয়। তৃতীয় দশকে সত্যজিতের ছবি কমে যায় উল্লেখযোগ্য-ভাবে—শেষের দশকে তিনি নেই—তবে মাঝে মাঝে পুর্ণর্মুদ্রণ সংখ্যাগুলোতে তাঁর পুরানো অনেক কাজই বেরিয়েছে। এর সঙ্গে নিয়মিত বিভাগগুলির জন্য করা বহু হেডপিস তো আছেই।

গোড়া থেকেই 'সন্দেশ' ছিল একটা অলাভজনক প্রতিষ্ঠান—সেদিক দিয়ে বাজারের অন্যান্য পেশাদার ছোটদের পত্রিকাগুলো থেকে এর চরিত্র ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। নামী শিল্পীদের ছবি তাঁদের যোগ্য পারিশ্রমিক দিয়ে সন্দেশে ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না। এর ফলে নতুনদের জন্য সন্দেশকে সর্বদাই দরজা খোলা রাখতে হ'ত, এবং আজও হয়। এর ফলে বহু উঠতি তরুণ শিল্পীদের ছবি সন্দেশের পাতায় ছাপা হয়েছে যারা পরবর্তীকালে ইলাস্ট্রের হিসেবে খুবই সফল হয়েছেন।

তবে শুরুর বছরগুলিতে বেশ কিছু পেশাদার শিল্পী নিয়মিত সন্দেশের জন্য এঁকেছেন।

এঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় 'সুবোধ দাশগুপ্ত'র। ইনি সবরকম স্টাইলে-এ কাজ করতে পারলেও সন্দেশে মজার ছবিই বেশি এঁকেছেন— যেমন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ঝাউ বাংলোর রহস্য' অথবা শিব্রামের 'ছারপোকা' গল্পের সঙ্গে ছবিগুলো। এ ছাড়া

ছবি: সুবোধ দাশগুপ্ত

'সমর দে-র মতো প্রতিভাবান ইলাস্ট্রেটরও সন্দেশের জন্য এঁকেছেন বহুদিন ধরে—তারাশঙ্করের 'ভবানন্দের কাশীযাত্রা'-র সঙ্গে আঁকা সিরিয়াস ধরণের ছবিগুলো সম্ভবতঃ পাঠকদের আজও মনে আছে।
এরপর প্রসাদ রায়—সত্যজিৎ রায়ের ব্যাক্তিগত পছন্দের শিল্পী।

ময়ুখ চৌধুরী ছদ্মনামে তাঁর করা বাংলা অ্যাডভেঞ্চার কমিক্স এক সময় খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। অ্যাকশন-ধর্মী ছবি আর অ্যানিমাল ড্রয়িং-এ প্রসাদ রায়ের কোনও বিকল্প ছিল না। এক সময় সত্যজিৎ নিজের লেখা সেপ্টোপাসের ক্ষিদে গল্পের সঙ্গে প্রসাদ রায়ের ইলাস্ট্রেশন ব্যাবহার করেন। কী অসাধারণ এঁকেছিলেন সেই দৃশ্যটা

ছবি: সমর দে

ছবি: প্রসাদ রায়

যেখানে প্রকাণ্ড 'গ্রে হাউন্ড' কুকুরটা চেন ছেড়ে লাফ দিয়েছে নেপেনথিসের দিকে। প্রায় একই সময় একজন নতুন শিল্পী সন্দেশের জন্য আঁকা শুরু করে দীর্ঘ দিন সন্দেশের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন—এঁর নাম নীতিশ মুখোপাধ্যায়। ইনি মজার এবং সিরিয়াস দু'-ধরনের ছবিই এঁকেছেন। যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস ও স্বকীয়তা ছিল নীতিশের কাজে, হাতে টাইপও লিখতেন ছবির সঙ্গে বেশ খাপ খাইয়ে। এক সময় মজার কোনও লেখা হলেই নীতিশের ছবি—যেমন 'হুললুর মাকুদা', 'লঙ্কা দহন পালা' বা 'প্রথম পুরস্কার'। এই সময়ের আরও দু'জনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে—শিবানী রায়চৌধুরী আর দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। এর মধ্যে শিবানী মূলতঃ লেখিকা হলেও ছবিগুলো তিনিই আঁকতেন। এর একটি স্মরণীয় লেখা হ'ল 'ইস্তাবিলের পুঁথি'—সঙ্গে পশু-পাখি, মানুষ নিয়ে ফ্যান্টাসি মেজাজের অদ্ভুত সব ইলাস্ট্রেশন করেছিলেন। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় খুবই কম বয়সে ইলাস্ট্রেশন শুরু করেছিলেন সন্দেশে—সরু লাইনে ছবি আঁকতেন কিছুটা অনভিজ্ঞতার ছাপ থাকলেও মোটেরওপর স্টাইলটা ভালোই ছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ অকালমৃত্যু এসে তরুণ দেবীপ্রসাদের শিল্পীজীবনের দাঁড়ি টেনে দেয়।

সত্তর দশকের মাঝামাঝি থেকেই এক ঝাঁক নবাগত শিল্পী আর্ট কলেজে পড়তে পড়তেই ইলাস্ট্রেশন নিয়ে মেতে ওঠেন এবং নিয়মিতভাবে 'সন্দেশ'-এ কাজ করার সুযোগ পেতে থাকেন। এঁরা

ছবি : নীতিশ মুখোপাধ্যায়

ছবি: শিবানী রায়চৌধুরী

ছবি : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ছবি : সুবীর রায়

ছবি : উজ্জ্বল চক্রবর্তী

সত্যজিৎ রায়ের খুব কাছাকাছি আসার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং ক্রমাগত তাঁর উৎসাহ আর মূল্যবান উপদেশ পেয়ে পরবর্তীকালে এঁরা সবাই এক একজন সার্থক ইলাস্ট্রেটর হয়ে ওঠেন।

এঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় উজ্জ্বল চক্রবর্তী ও সুবীর রায়ের। '৭৫ সাল থেকেই উজ্জ্বল সন্দেশের নিয়মিত শিল্পী—সহজাত প্রতিভা ছিল তাঁর—প্রতিটি কাজের পিছনে যথেষ্ট ভাবনা-চিন্তার ছাপ পাওয়া যায়। প্রধানতঃ তুলি দিয়েই ছবি আঁকতেন, এবং ফিগার ড্রইং-ও যথাসম্ভব নিখুঁত ভাবে করার চেষ্টা ছিল। 'ফিল্মস্টার সুমনদা', 'লম-পুছড়িয়া', 'এক যে ছিল বাঘ' অথবা 'বহুরূপী' গল্পগুলির সঙ্গে তাঁর ছবিগুলি এর প্রমাণ দেবে। সুবীর রায় শুরু করেছিলেন মজার স্টাইল ব্যবহার করে, শৈবাল চক্রবর্তীর 'হর্ষ ডাক্তারের চিকিৎসা' গল্পের সঙ্গে। পরে সিরিয়াস স্টাইলে আঁকেন নলিনী দাশের ধারাবাহিক 'ভাঙা দেউলের রহস্য' র সঙ্গে। সব ধরণের কাজেই সুবীর ছিলেন সমান দক্ষ। সন্দেশের পাঠক আজও সুবীরকে মনে রেখেছে দুটি অসাধারণ কমিক্স 'রাত বিরেতে' ও 'সাজাহানের আজব কথা'র জন্য। কলেজের পাট চুকিয়ে স্থায়ী ভাবে দিল্লী চলে যাওয়াতে সুবীরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়।

এঁদের কিছু পরেই আসেন শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য্য—সম্পূর্ণ স্বশিক্ষিত এই শিল্পী স্রেফ প্রতিভার গুণে গত কুড়ি বছরেরও বেশি সময় ধরে সন্দেশের একমাত্র অপরিহার্য ইলাস্ট্রেটর হিসেবে অজস্র ছবি এঁকে চলেছেন। প্রায় সব ধরনের গল্পের সঙ্গেই তাঁকে ছবি আঁকতে হয়, তবে তাঁকে ঠিক ভার্সেটাইল শিল্পী বলা যাবে না। তাঁর হাতে সব থেকে সার্থক হয়ে ওঠে রূপকথা ধর্মী গল্পের সঙ্গে ছবিগুলি, কারণ তিনি ডিজাইনের ব্যবহার করতে জানেন খুব সুন্দর। তাছাড়া ড্রইং করেন একেবারে দিশি লোকশিল্পের ঢং-এ। বহু অসাধারণ ইলাস্ট্রেশন আছে শিবশঙ্করের, তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হ'ল স্বপনবুড়োর 'গানের পাখি'। গৌরী ধর্মপালের 'ফুল্লরার পুতুল' বা বিতুবুড়ি, অথবা অরুণ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'সম্মোহনি দাদার কীর্তি', গল্পের সঙ্গে ছবিগুলি। শিবশঙ্করের সমসাময়িক আরেক শিল্পী হলেন প্রশান্ত মুখার্জী। সাধারণতঃ পেনের সরু লাইনের সঙ্গে চাটাই-এর মতো টেক্সচার ব্যবহার করে কাজ করতেন তিনি! এই স্টাইলেই এঁকেছিলেন ভবানীপ্রসাদ দের 'ময়নুদ্দির গাড়ি' গল্পের ছবি। হেডপিসটিও খুব সুন্দর হয়েছিল— গরুর গাড়ি যাচ্ছে। বিরাট খোলা আকাশ, তার ওপর লেটারিং, সাদা কালোর

ছবি: শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

ছবি : প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়

ডিস্ট্রিবিউশন দেখবার মতন।

১৯৮৪'র জানুয়ারি মাসে সত্যজিৎ রায়ের 'গগন চৌধুরির স্টুডিও' গল্পটি সন্দেশে বের হয়। সত্যজিৎ তখন অসুস্থ, ইলাস্টেশনের দায়িত্ব নেন প্রশান্ত। গল্পের অলৌকিক মেজাজটা আলোছায়ার সাহায্যে সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন তিনি। নলিনী দাশের গল্প নিয়ে সন্দেশের জন্য ধারাবাহিক অ্যাডভেঞ্চার কমিক্স ও করেছিলেন প্রশান্ত। ইনিও পরে দিল্লী চলে যান আর সন্দেশে কাজ করেননি। আশির দশকের মাঝামাঝি সময় কয়েক বছর দু'জন শিল্পী বেশ পরিণত মানের কাজ করেছিলেন। একজন সিদ্ধার্থ মুখার্জী, অন্য জন গৌতম বেনেগাল। ইলাস্ট্রেটর হিসেবে দু'জনেরই

ছবি : গৌতম বেনেগাল
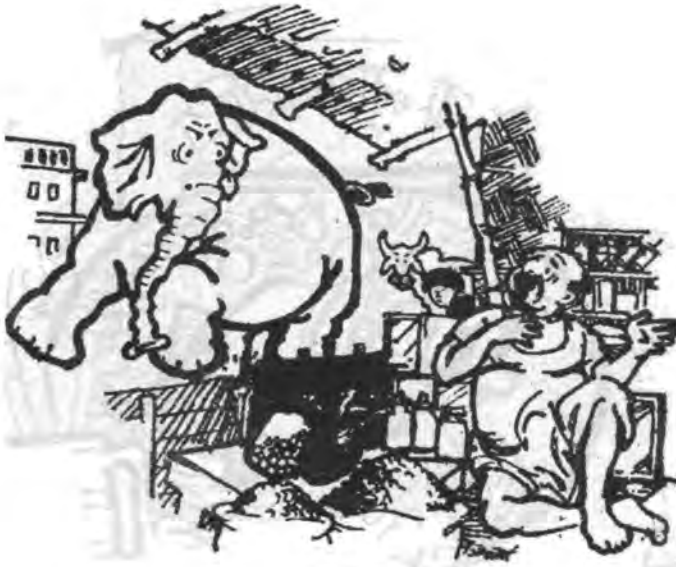
ছবি : সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়

ছবি : পার্থ দাশ

ছবি : অনিন্দ্য বসু

ছবি : হর্ষমোহন চট্টরাজ

যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। তবে পরে আর এদের কাজ কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

সত্যজিৎ-সম্পাদিত সন্দেশে যে শিল্পীরা এঁকেছেন তাঁদের বিষয়েই বিস্তারিত লিখলাম, কিন্তু নব্বই দশকের গোড়া থেকেই আবার বেশ কিছু নতুন শিল্পী সন্দেশে এলেন, যাদের মধ্যে অনেকেই এখনও সন্দেশের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন এবং আগের চেয়ে এঁদের কাজ নিঃসন্দেহে আরও পরিণত হয়েছে—এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা

ছবি : রাহুল মজুমদার
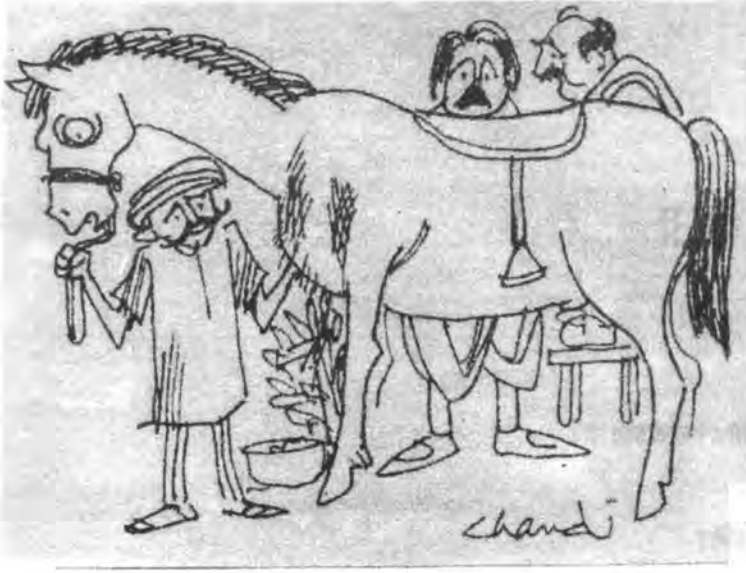
ছবি : চণ্ডী লাহিড়ী

যেতে পারে রাহুল মজুমদার, পার্থ দাশ ও অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের নাম। অভিজিৎ অবশ্য কমিক্স করতেই বেশি পছন্দ করেন এবং এই মুহূর্তে সন্দেশে তাঁর কমিক্স নিয়মিত দেখা যায়। ইদানিং হর্ষমোহন চট্টরাজ ও অনিন্দ্য বসু ভালো কাজ করছেন ইলাস্ট্রেটর হিসেবে, এঁদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। এ ছাড়াও এখনও বহু পেশাদার নামী শিল্পীরা সন্দেশের বিশেষ সংখ্যাগুলোর জন্য নিয়মিত ইলাস্ট্রেশন করে থাকেন—যেমন চণ্ডী লাহিড়ি, দেবব্রত ঘোষ, সমীর দাশ, অনুপ রায় ও কৃষ্ণেন্দু চাকী।

দেবাশীষ দেব নিজেও একজন প্রতিষ্ঠিত পেশাদার ইলাস্ট্রেটর এবং এটা তাঁর গর্ব যে সন্দেশের পাতাতেই তাঁর প্রথম ইলাস্ট্রেশন ছেপে বেরিয়েছিল ১৯৭৮-এর পুজো সংখ্যায়। সেই থেকে আজ অবধি তিনি 'সন্দেশ'-এর জন্য ছবি এঁকে যাচ্ছেন নিয়মিত এবং অন্য কোনও পত্রিকার তুলনায় সন্দেশের জন্য ছবি এঁকে সব থেকে বেশি আনন্দ পান।

সম্পাদক 'সন্দেশ'

ধরাবাঁধা

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

আয়না আয়না আয়না।
সবাই দেখে নিজেকে কেউ তোমায় দেখতে চায় না।

গলি গলি গলি।
এই বললে বসে থাকব, এই বলছ চলি।

রোয়াক রোয়াক রোয়াক।
তোমায় দেখে গ্যাসের আলোয় রাত্তিরটা পোহাক।

রাস্তা রাস্তা রাস্তা।
শুয়ে শুয়ে দেখছ বুঝি-হাঁ করা আকাশটা।

ছাদ ছাদ ছাদ।
পুপের জন্যে টুকুর জন্যে বেঁধে আনো তো চাঁদ।

** আশ্বিন ১৩৬৯ থেকে পুনর্মুদ্রিত*

ওই ছেলেটা

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

একটা ছেলে ইস্কুলে যায়,
একটা ছেলে দূরে
ঘাম ঝরিয়ে কাটছে মাটি
গনগনে রোদ্দুরে।

ওই ছেলেটাও ইস্কুলে যাক,
ভাগ্যদেবীর দয়া
ওর উপরেও একটু পড়ুক,
লিখতে শিখুক অ-আ।

পড়তে শিখুক পত্রিকা-বই,
ও'ই যদি বাদ পড়ে,
জমতে থাকবে আঁধার তবে
ওই ছেলেটার ঘরে।

না খসলে ওর চক্ষু থেকে
অন্ধকারের ঠুলি,
বৃথাই লিখি রাত্রি জেগে
মজার ছড়াগুলি।

সন্দেশী কমিক্স

দেবাশিস সেন

কমিক্স বা চিত্রকাহিনী সম্বন্ধে একটা ভুরু কোঁচকানো, অবজ্ঞার ভাব রয়েছে অনেকের মধ্যেই। তাঁদের মতে কমিক্স পড়লে বই পড়ার অভ্যাস নষ্ট হয়ে যায়, কল্পনা শক্তির বিকাশ ঘটে না। সত্যিই কি তাই? কমিক্সপ্রেমীরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারেন, 'না'। স্বয়ং সত্যজিৎ রায় কমিক্স পড়তে অসম্ভব ভালোবাসতেন। *'আমার নিজের ছেলেবেলায় কমিক্স পড়তে খুব ভালো লাগত। এখনও লাগে, তবে যেমন তেমন কমিক্স হলে চলে না। ছবিতে গল্প বলার একটা বিশেষ কায়দা আছে। সেই কায়দাটা যার ভালো করে জানা, আর সেই সঙ্গে ছবি আঁকার হাতটিও পাকা, তাঁর হাত দিয়েই ভালো কমিক্স বেরোয়।'* (কমিক্স শিল্পী উইনসর ম্যাক্‌কে/সত্যজিৎ রায়। 'সন্দেশ' বৈশাখ ১৩৮৫।) আমেরিকার এক প্রেসিডেন্টকে একবার এক জরুরী মিটিং-এর আগে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। খোঁজ- খোঁজ- খোঁজ। শেষে দেখা গেল তিনি নিভৃতে বসে কমিক্স পড়ছেন। রোজ ভোরবেলা খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে অনেকেরই প্রথমে চোখ পড়ে দ্বিতীয় পৃষ্ঠার নিচের দিকে —যেখানে থাকে একটা লম্বা স্ট্রিপে অরণ্যদেব, রিপ কার্বি (অবশ্য রিপ সম্প্রতি অবসর নিয়েছে), টারজান, কিম্বা স্পাইডারম্যানের কীর্তিকলাপ। এক কথায় বলা যায় কমিক্স জনপ্রিয় ছোট-বড় সবার কাছেই। কমিক্স-এর নামকরণটি এসেছে 'কমিক' এই শব্দটি থেকে অর্থাৎ মজাদার ঘটনার চিত্ররূপকেই 'কমিক্স' বলা হ'ত। কিন্তু কমিক্সের জনপ্রিয়তার অস্বাভাবিক বৃদ্ধির দৌলতে আজ সব ধরনের চিত্রকাহিনীই কমিক্স। তা সে মজার গল্পই হোক, বা দুঃখের কাহিনীই হোক।

সন্দেশে কখনোই নিয়মিত কমিক্স প্রকাশিত হয়নি। সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে সন্দেশী চিত্রকাহিনী সম-সাময়িক অন্যান্য শিশু-কিশোর পত্রিকাগুলির থেকে অবশ্যই পিছিয়ে থাকবে। কিন্তু সন্দেশী চিত্র-কাহিনীগুলো স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল।

বাংলায় চিত্রকাহিনীর শুরু পঞ্চাশ দশকের শেষ ভাগে। প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈল চক্রবর্তী, তুষার চ্যাটার্জী, ময়ূখ চৌধুরী, নারায়ণ দেবনাথরা এই বিভাগের পথিকৃত। এই পথিকৃতদের একজন এবং বাংলার অন্যতম সেরা কমিক্স শিল্পী ময়ূখ চৌধুরীই এঁকেছিলেন

সন্দেশে প্রথম চিত্রকাহিনীটি। ময়ূখ চৌধুরী নামে জনপ্রিয় হলেও 'ঋণশোধ' নামের সেই চিত্রকাহিনীটির লেখক ও শিল্পী হিসাবে নাম ছিল প্রসাদ রায়ের। প্রকাশিত হয় ১৩৬৮-এর ফাল্গুন সংখ্যায় (প্রথম বর্ষ। একাদশ সংখ্যা)। —*আফ্রিকার জঙ্গলের নিগ্রো উপজাতী নান্দী গোষ্ঠীর এক শিকারী 'মভূ'র গল্প। হায়নার গ্রাস থেকে এক ব্ল্যাক প্যান্থার শিশুকে রক্ষা করে মভূ। ব্ল্যাক প্যান্থার এসে ওর শাবককে নিয়ে যায়। কিছু পরে এক পাইথনের কবলে পড়ে মভূ। বনের বাতাসে খবর পেয়ে কৃতজ্ঞ ব্ল্যাক প্যান্থার এসে নিজের প্রাণ দিয়ে বাঁচায় মভূকে...'* তিন পাতার ছোট চিত্রকাহিনী। সন্দেশে প্রথম কমিক্স-এর সম্মান পাওয়া ছাড়াও ঋণশোধের আরও দু'টি বৈশিষ্ট্য আছে। তিন পাতার কমিক্সের পরে চতুর্থ পাতায় ছিল চরিত্রগুলির পরিচয়। নান্দী, প্যান্থার, পাইথন ও হায়না সম্বন্ধে ছিল কিছু তথ্য। ময়ূখ চৌধুরীর চিত্রকাহিনীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল শিল্পীর অসাধারণ লেটারিং। কিন্তু ঋণশোধের লেটারিং ছিল মুদ্রিত।

ঋণশোধের পরের চিত্রকাহিনীটি প্রকাশিত হয় ১৩৭০-এর আশ্বিন সংখ্যায়। আবার সেই প্রসাদ রায়, আবার সেই আফ্রিকার পটভূমি। এবার নায়ক এক জেব্রা, যার নাম পেক্কা। সিংহের কবল থেকে সে তার দলকে কিভাবে রক্ষা করছে তারই এক রুদ্ধশ্বাস গল্প। এই চিত্রকাহিনীটির লেটারিং শিল্পীর নিজের।

এরপরে সন্দেশে চিত্রকাহিনীর দীর্ঘ বিরতি। তৃতীয় চিত্রকাহিনীটি প্রকাশিত হয় নবম বর্ষের কার্তিক সংখ্যাতে। তৃতীয় কাহিনীতে প্রসাদ রায় ফিরে এসেছেন স্বনামে (ময়ূখ চৌধুরী নামটি অবশ্য ছদ্মনাম)। 'সাক্ষী ছিল চাঁদ'—এর পট ভূমিও জঙ্গল। এর পরের চিত্রকাহিনীটিও জঙ্গলের পটভূমিতে সিংহের শত্রু (শরৎ ১৩৭৭)। ১৩৮১-এর বৈশাখে প্রকাশিত হয় ময়ূখ চৌধুরীর 'এক নাম অন্য মুখ—ম্যাক ডোনাল্ড'। এটিকে অবশ্য সেই অর্থে চিত্রকাহিনী বলা যাবে না। দু'পাতা জোড়া এই চিত্রকাহিনীর মোট চারটি বক্সে রয়েছে চারজন ম্যাকডোনাল্ডের অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী, অবশ্যই ছবি সহ। প্রতিটি বক্সই স্বয়ং-সম্পূর্ণ।

পরের বছর ময়ূখ চৌধুরীর কাছ থেকে আমরা পাই 'ইতিহাসে পলাতক'। দু'পাতা জোড়া চিত্রকাহিনী। চরিত্রগুলির মুখে কোনও কথা না থাকলেও দু'পাতা জোড়া এই চিত্রকাহিনীগুলি যথেষ্ট

উত্তেজক।

১৩৭৭ অর্থাৎ দশম বর্ষ থেকে 'সন্দেশ' প্রকাশিত হতে শুরু করে বড় আকারে দ্বিমাসিক পত্রিকা হিসেবে। প্রথম সংখ্যাতেই ছিল প্রচ্ছদে চিত্রকাহিনী, প্রথম ও দ্বিতীয় প্রচ্ছদে প্রকাশিত মজার চিত্রকাহিনী 'খুড়ো ভাইপো আর দুদাড়ি'-এর লেখক-শিল্পী দীপক চক্রবর্তী। শিল্পী শৈল চক্রবর্তীর পুত্র পেশায় চিত্রাভিনেতা দীপক অধিক পরিচিত 'চিরঞ্জিত' নামে।

দীপক চক্রবর্তী

দশম বর্ষের 'সন্দেশ' বাংলা কমিক্স-সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বছরের সন্দেশেই কমিক্স-প্রেমীরা পেল কমিক্স - শিল্পী সত্যজিৎ রায়কে। চার সংখ্যায় চারটি প্রচ্ছদ চিত্রকাহিনী এঁকেছিলেন তিনি। দুটো লম্বা স্ট্রিপে শুধু ছবির সাহায্যে কোনও কথা ছাড়াই অসাধারণ চারটি গল্প বলছেন সত্যজিৎ রায়।

এই চারটি কার্টুন কমিক্স ছাড়া সত্যজিৎ রায় আর কোনও চিত্রকাহিনী না আঁকলেও সন্দেশী চিত্রকাহিনীতে রয়েছে সত্যজিতের আরও অনেক অবদান। ১৩৮২-এর ফাল্গুন থেকে ১৩৮৩-এর কার্তিক এবং ১৩৮৩-এর অগ্রহায়ণ থেকে ১৩৮৪-এর আষাঢ় অবধি সন্দেশে 'ইন্সপেক্টর বিক্রম'-এর দুটো অ্যাডভেঞ্চার প্রকাশিত হয়েছিল ধারাবাহিক ভাবে। মূল কাহিনী আবিদ সুর্তি এবং ছবি প্রতাপ মল্লিকের। কিন্তু দু'টি গল্পেই রয়েছে সত্যজিতের ছোঁয়া। সত্যজিৎ রায় যে শুধু গল্প দু'টির অনুবাদ করছেন তা নয়, প্রতি সংখ্যায় দু'পাতা জোড়া প্রতিটি স্ট্রিপের লেটারিংও করেছেন অফুরন্ত ব্যস্ততার মধ্যেও। এখানেই শেষ নয়, দেশী বিদেশী কার্টুনের সঙ্গে সত্যজিতের সংযোজনা কার্টুনগুলিকে পৌঁছে দিয়েছে অন্য উচ্চতায়। এ প্রসঙ্গে পরে আসছি।

'ইন্সপেক্টর বিক্রম' অবশ্য সন্দেশের প্রথম ধারাবাহিক চিত্রকাহিনী নয়। ধারাবাহিক চিত্রকাহিনীর পথিকৃত সেই ময়ূখ চৌধুরীই। বড় আকারের দ্বি-মাসিক 'সন্দেশ' প্রকাশিত হয়েছিল তিন বছর। ১৩৭৯-তে তিন সংখ্যায় (কার্তিক—চৈত্র) প্রথম ধারাবাহিক চিত্রকাহিনী প্রকাশিত হয়। ঐতিহাসিক পটভূমিতে ওই ধারাবাহিকটির নাম ছিল 'মহাকালের মন্দির'।

১৩৮২ থেকেই সন্দেশী চিত্রকাহিনীর একটি নতুন অধ্যায় শুরু হ'ল। ১৩৮২ থেকে ১৩৮৬ এবং ১৩৯১ থেকে সন্দেশে প্রচুর

সত্যজিৎ রায়
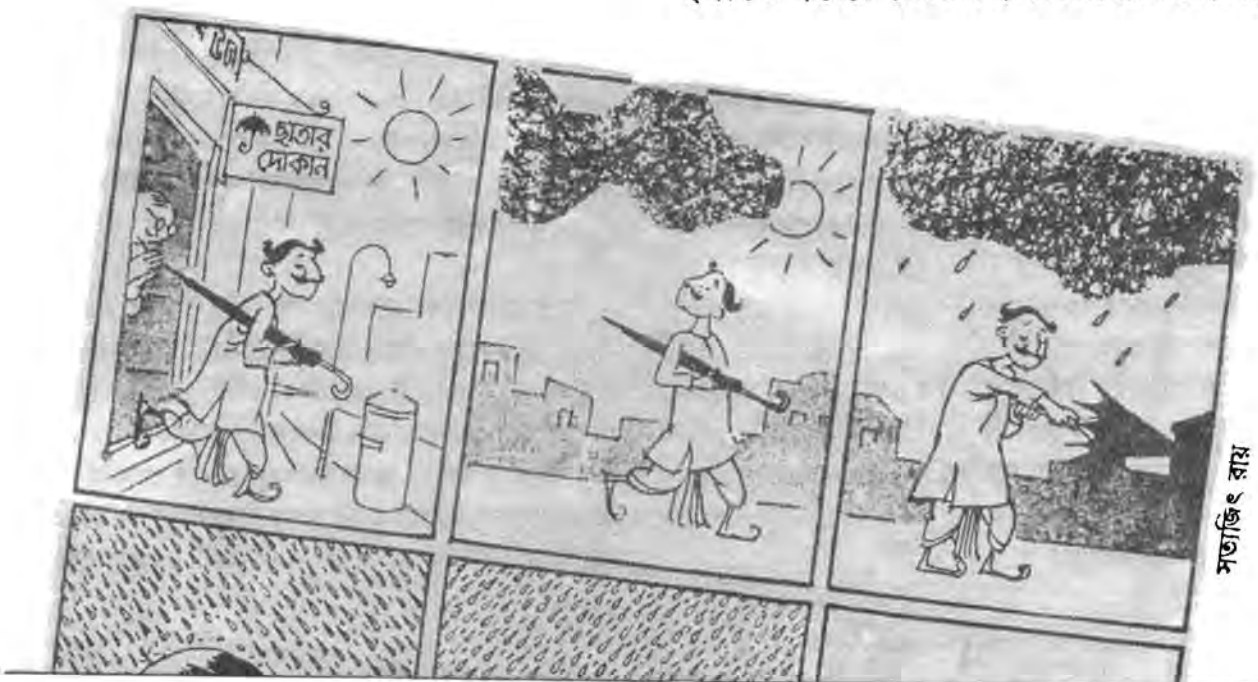
রাতবিরেতে । সুবীর রায়

দেশী কমিক্স প্রকাশিত হয়েছে। ইন্সপেক্টর বিক্রম শেষ হতেই ১৩৮৪-এর শারদীয়া সংখ্যা থেকে শুরু হ'ল সুবীর রায়ের 'রাতবিরেতে'। এই প্রতিবেদকের মতে রাতবিরেতে সন্দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রকাহিনী তো বটেই, সর্বশ্রেষ্ঠ বললেও বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। মজা-রহস্য-উত্তেজনা- রসবোধ এবং ছবির ভাষার নিখুঁত সংমিশ্রণে রাতবিরেতে সার্থক চিত্রকাহিনী। নন্দ আর গুপী এই দুই ছিঁচকে চোরকে দেখে গ্রামের কুকুরের ডাক শিল্পীর হাতে হয়েছে —*আর র রে, ঘৌন ঘো, ঘৌর, ঘৌর- চৌর-চৌর; এখানে রোবটের হার্ট দুর্বল, বেশি উত্তেজনা সহ্য করতে না পারলে অজ্ঞান হয়ে যায়। জঙ্গলের মধ্যে থেকে নেশাগ্রস্ত ডাকাত আড়াল থেকে রোবট বিক্রমের গলায় ইংরেজী শব্দ শুনে মানুষ ও ইন্জিরির সমীকরণ করে 'পুলিশ' সমাধানে পৌঁছয়...'* পরপর কয়েকটি বক্সে বাঘ, ভূত, সাপ ও ডাকাতের ছবি দিয়ে খালিদপুরের জঙ্গলের ভয়ঙ্করতা বোঝানো হয়, ডাকাত সর্দার যখন হাসতে হাসতে তার বন্দী দু'জনকে হাড়ি-কাঠে বলি দেবার আদেশ দেয় তখন বন্দী দু'জনের ভাবনায় পরপর কয়েকটি ছবির সাহায্যে ডাকাত সর্দারের হাসি রূপান্তরিত হয় হাড়িকাঠে।

সুবীর রায়ের (সহ-লেখক রুদ্র সেন) দ্বিতীয় চিত্রকাহিনী 'শাহজাহানের আজব কথা'ও অসাধারণ চিত্রকাহিনী। এটিও ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৮৫-র মাঘ থেকে ১৩৮৬-র অগ্রহায়ণ অবধি। এখানেও রয়েছে মজা- রহস্য-অ্যাডভেঞ্চার- কল্পবিজ্ঞানের আমেজ।

১৩৯১তে চিত্রকাহিনী শুরু করলেন প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়। 'সন্দেশ' সম্পাদিকা নলিনী দাশ সন্দেশীদের কাছে পরিচিত তাঁর চার মেয়ে-গোয়েন্দা নিয়ে গোয়েন্দা গণ্ডালুর জন্য। তিনি সন্দেশীদের জন্য এবার সৃষ্টি করলেন এক নতুন চরিত্র। শুরু হ'ল ধারাবাহিক 'টোটোর অ্যাডভেঞ্চার'। তরুণ টোটো, বিজ্ঞানী অধ্যাপক চারুচন্দ্র চাকলাদার এবং শিম্পু নামের শিম্পাঞ্জীর গল্প। শিম্পু রীতিমতো সভ্য মানুষ, থুড়ি জানোয়ার, যে কি না শার্ট-প্যান্ট পরে এবং মাঝে মাঝে উলটো করে ধরে 'সন্দেশ' পড়ে। টোটোর মোট তিনটি অ্যাডভেঞ্চার প্রকাশিত হয়েছিল। দু'টি আফ্রিকার পটভূমিতে (বৈশাখ ১৩৯১ থেকে বৈশাখ ১৩৯২ এবং জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৫-চৈত্র ১৩৯৫)। এবং একটা লাদাকের পটভূমিতে জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৬-চৈত্র ১৩৯৬)। টোটোর অ্যাডভেঞ্চারের অপূর্ব ছবি এঁকেছেন প্রশান্ত। সন্দেশের সম্পাদকের দপ্তরে খোঁজ নিয়ে জানা গেল এই চিত্রকাহিনীতেও রয়েছে সত্যজিৎ রায়ের হাতের অদৃশ্য ছোঁয়া।

কিন্তু টোটোর অ্যাডভেঞ্চার নয়, কমিক্স শিল্পী হিসেবে প্রশান্ত অনেক বেশি বাহবা পাবেন তাঁর অন্য চারটি চিত্রকাহিনীর জন্য। রূপকথাধর্মী চিত্রকাহিনী সন্দেশে একটিই প্রকাশিত হয়েছিল। প্রশান্তর লেখা এবং আঁকায় 'মৎস্যকন্যা ও রাজকুমার' (পুজো ১৩৯৫)-এ রূপকথার আমেজ যেমন রয়েছে তেমনই ছবিও অসাধারণ। সব মিলিয়ে একটি সার্থক চিত্রকাহিনী। চিত্রকাহিনীর মান হিসেবে 'রাতবিরেতে'র থেকে খুব একটা পিছিয়ে থাকবে না

মৎস্যকন্যা।

প্রশান্ত আরও একটি দুর্দান্ত চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন সন্দেশের পাতায়। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাঃ রায়ের নাতি জোজো। ডাঃ রায় ভিন গ্রহের প্রাণীদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য একটা ফোন বানিয়েছেন। উনি এই ব্যাপারে সফল না হলেও তাঁর নাতি জোজো

মৎস্যকন্যা ও রাজকুমার

ছবি/লেখা প্রশান্তকুমার মুখোপাধ্যায়

এক দেশে এক মস্ত রাজা ছিলেন। তিনি একদিন মৃগয়াতে গিয়ে একটা আশ্চর্য সুন্দর কালো ঘোড়া দেখতে পেলেন

বাঃ ঘোড়াটি তো অপূর্ব

মহারাজা একে প্রাসাদে নিয়ে চলুন।

ফিম আর জন সাহেব। প্রশান্ত মুখার্জী

এই ফোনে বহুদূরের এক গ্রহে এক বন্ধু পাতিয়েছে। ডাঃ রায় অবশ্য সেটা জানেন না। জোজোর সেই ভিনগ্রহী বন্ধুর নাম ফিম। ফিমও জোজোর মতো ইস্কুলে পড়ে। এই জোজো আর ফিমের তিনটি অ্যাডভেঞ্চার এঁকেছেন প্রশান্ত—'জোজো আর ফিমের ডাকাত ধরা' (বৈশাখ ১৩৯৬), 'ফিমের বাড়িতে দুর্গাপুজো' (শারদীয়া-১৩৯৬), এবং 'ফিম আর জনসাহেব' (বৈশাখ- ১৩৯৭)। তিনটি গল্পেই রয়েছে রহস্য, মজা এবং সন্দেশী গল্পের নিজস্বতা। একটা ছোট ছেলের কল্পনার জগতের দুর্দান্ত ছবি ফুটে উঠেছে ফিমের কমিক্সে। রাক্ষসকে হারিয়ে দেবার ঘটনাও যেমন রয়েছে তেমনই রয়েছে ভূতের ভয়ে শিউরে ওঠাও।

নব্বই দশকের প্রথম দিকে সন্দেশে প্রচুর চিত্রকাহিনী করেছেন সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়। সত্যিকারের অ্যাডভেঞ্চার ভিত্তিক তিনটি চিত্রকাহিনী, 'নরেন ও তার গেরিলা বাহিনী' (পুজো ১৩৯১) টি প্রবন্ধ প্রথম মহাযুদ্ধে আরব দেশের কাহিনী, 'দুঃসাহসী' (পুজো ১৩৯২) গল্পে উত্তর মেরুতে অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী, আবার 'দুঃসাহসী' (পুজো ১৩৯৩) নামে জিম করবেটের শিকার কাহিনী। এই তিনটি সত্যি ঘটনা ছাড়াও সিদ্ধার্থ এঁকেছেন আরও তিনটি অ্যাডভেঞ্চার কমিক্স। মঞ্জিল সেনের কাহিনী অবলম্বনে 'দানোর সন্ধানে' প্রকাশিত

দানোর সন্ধানে। ছবি সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়

হয়েছিল ধারাবাহিক ভাবে (বৈশাখ থেকে চৈত্র ১৩৯২)। ১৩৯৪-এর পুজোয় প্রকাশিত 'বোম্বেটে বেলামী'র কাহিনীকারও মঞ্জিল সেন। ১৩৯৩-এর পুজোয় প্রকাশিত হয়েছিল 'ভুতুড়ে মহাকাশযান'। দানোর সন্ধানে ছাড়াও বাকি সব ক'টি কাহিনীর চিত্রনাট্য অরুন্ধতী মুন্সীর।

৯০'-এর দশকটা সিদ্ধার্থ-প্রশান্তর দখলে ছিল। সিদ্ধার্থ-প্রশান্তর অনুপস্থিতিতে সন্দেশী চিত্রকাহিনীর মান ধরে রাখতে এগিয়ে এসেছেন অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়। বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে প্রথম কয়েকটি চিত্রকাহিনী করেছেন অভিজিৎ। 'দ্বীপরহস্য' (পুজো ১৪০১), 'এবার তোমার চাল' (পুজো ১৪০২) এবং 'হীরক রহস্য' (পুজো ১৪০৩) পুরোদস্তুর সিরিয়াস এবং অ্যাডভেঞ্চারসুলভ। বিদেশী গল্পের মায়া ত্যাগ করে অভিজিৎ এর পরে ঝুঁকলেন বাংলা গল্পের দিকে। পরপর তিনটি সত্যজিৎ রায়ের গল্পের চিত্ররূপ দিলেন অভিজিৎ। 'ব্রাউন সাহেবের বাড়ি' (১৪০৪), 'বাদুড় বিভীষিকা' (১৪০৫) এবং 'সেপ্টোপাসের খিদে' (১৪০৬)। এই তিনটি গল্পই প্রকাশিত হয়েছিল ধারাবাহিক ভাবে। গল্পগুলির লেটারিং সন্দীপ রায়ের, শুধু সেপ্টোপাসের খিদের শেষ অংশের লেটারিং শিবশঙ্কর ভট্টাচার্যের।
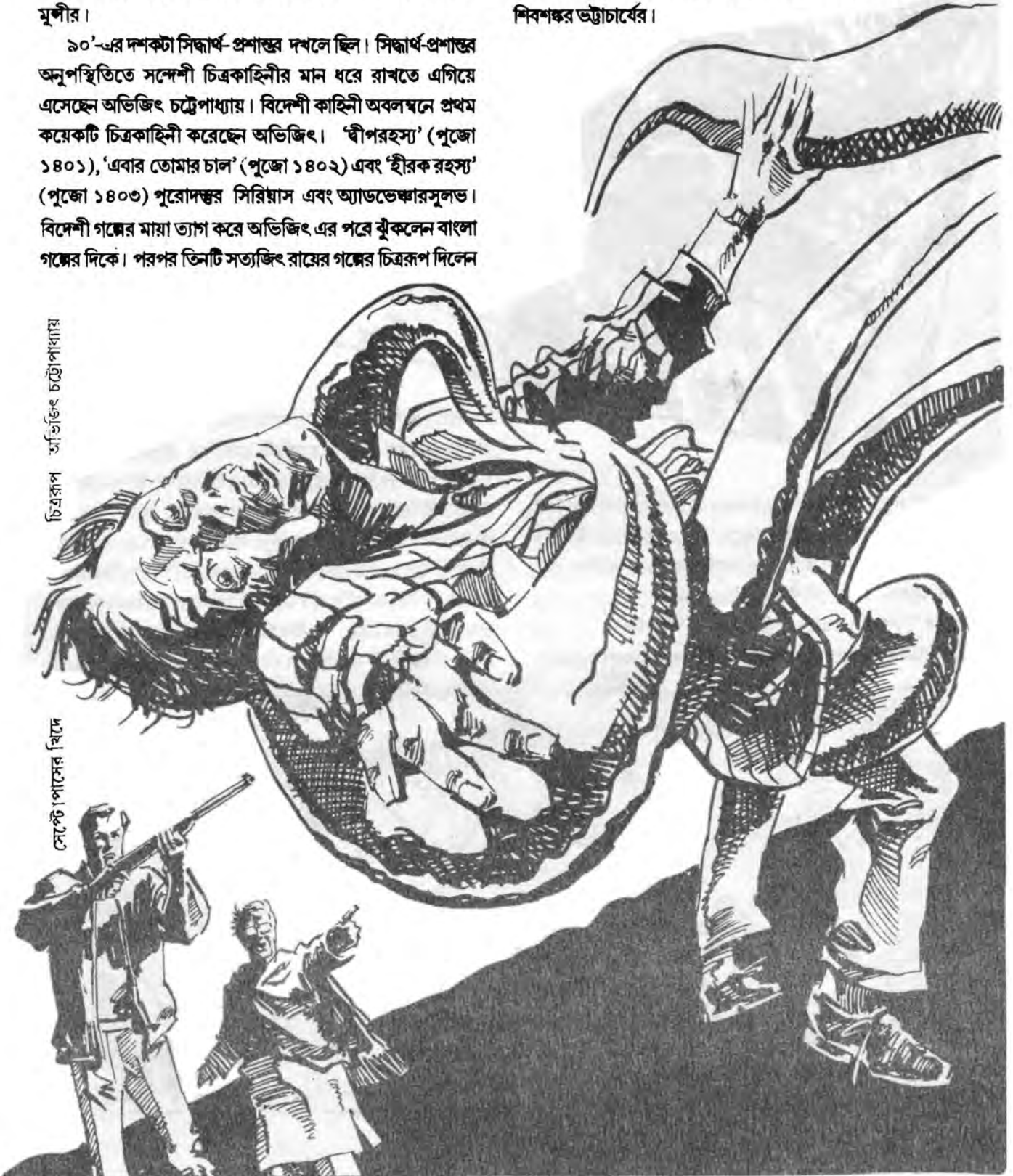
সেপ্টোপাসের খিদে চিত্ররূপ অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

নিশাচর। অরিজিৎ দত্তচৌধুরী

এই সময়ে সন্দেশের আরেকজন উল্লেখযোগ্য কমিক্স শিল্পী হলেন অরিজিৎ দত্ত চৌধুরী। 'লুডো' (পুজো ১৪০২), 'নিশাচর' (পুজো ১৪০৩) গল্প দু'টিতে রহস্যরোমাঞ্চ থাকলেও অরিজিৎ দুর্দান্ত কাজ করেছেন 'সত্যান্বেষী চন্দ্রকান্ত' চিত্রকাহিনীতে (অগ্রহায়ণ ১৪০৩ থেকে বৈশাখ ১৪০৪)। ঐতিহাসিক পটভূমিতে এই চিত্রকাহিনীতে রয়েছে রহস্য গোয়েন্দাও সরসতার অপূর্ব সংমিশ্রণ।

বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত সাহিত্যিকদের বিখ্যাত গল্প-কবিতা অবলম্বনে বেশ কিছু চিত্রকাহিনী প্রকাশিত হয়েছে সন্দেশে। সুকুমার রায় ('গন্ধবিচার', পুজো ১৩৯৪), উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ('মজন্তালী সরকার', বৈশাখ ১৩৯৫, 'বুদ্ধুর বাপ', পুজো ১৪০৬), ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ('হনলুলুর মাকুদা', পুজো ১৪০৭) গল্পের চিত্ররূপ দিয়েছেন রামগরুড়। লীলা মজুমদারের ('দ্বিতীয় টিকটিকি', বৈশাখ ১৪০৫) কাহিনীর ছবি এঁকেছেন যুগ্মভাবে হর্ষমোহন চট্টরাজ ও অভীক কুমার মৈত্র। অভীক বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনেও একটি চিত্রকাহিনী করেছিলেন ('নর নেকড়ে' পুজো, ১৪০৫)।

সত্যান্বেষী চন্দ্রকান্ত। অরিজিৎ দত্ত চৌধুরী

মজন্তালী সরকার। ছবি রামগরুড়

ক্লাসিক সাহিত্যের চিত্ররূপ ছাড়াও রামগরুড় করেছেন আরও দুটো চিত্রকাহিনী। একটার কাহিনীকার শিল্পী নিজেই ('অথ আধুলি গঠিত', অগ্রহায়ণ ১৪০৫) অন্যটির গল্প লিখেছেন ধ্রুবজ্যোতি চৌধুরী ('বালাগড়ে বুমেরাং', পুজো ১৪০০)।

এক পাতা বা দু'পাতার চিত্রকাহিনীগুলি সারা পৃথিবীতেই খুবই জনপ্রিয়। ডেনিস দ্য মেনাস, আর্চি, হেনরি ইত্যাদি ইত্যাদি বহু চরিত্র বহুদিন ধরেই লোকের মন জয় করে আসছে, বাংলা চিত্রকাহিনীতে তেমনই কয়েকটি চরিত্র জনপ্রিয়। বাঁটুল দি গ্রেট, হাঁদা ভোঁদা কিম্বা নন্টে ফন্টের নাম শোনেনি এমন বাঙালী সাহিত্যপ্রেমী খুঁজে পাওয়া ভার। সন্দেশে তেমনভাবে কোনও চরিত্র বিখ্যাত না হলেও বেশ কয়েকটি চরিত্র সৃষ্টি করেছেন কয়েকজন শিল্পী। সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায় এঁকেছেন 'বাহাদুরের বাহাদুরী'। কাহিনীকার ছিলেন নন্দিনী দাশ, রামগরুড় এঁকেছিলেন বুদ্ধু ভুতু। এটি ছিল এক পাতার কমিক্স। ১৩৯৩ ও ১৩৯৪তে নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছিল বুদ্ধু ভুতু, মোট ১১টি গল্প। এর আগে রামগরুড় 'চোরের কপাল'

দ্বিতীয় টিকটিকি। চিত্ররূপ: অতীক কুমার মৈত্র ও হর্ষমোহন চট্টরাজ

বুদ্ধু-ভুতু। রামগরুড়

ন্যাড়া। হিজিবিজবিজ

নামে দু'টি একপাতার চিত্রকাহিনী করেছিলেন (কার্তিক ১৩৯৩)। ১৪০১-এর জ্যৈষ্ঠতে অরিজিৎ দত্ত চৌধুরী নিয়ে এলেন এক পাতার কমিক্স (মাঝে মাঝে দু'পাতা জুড়েও) এক দুষ্টু বেড়ালকে, নাম তার 'পান্না'। ওই বছরে পান্নার দুষ্টুমি ছাপা হয়েছিল কয়েকটি সংখ্যায়। তবে এই ধরনের কমিক্সে হিজিবিজিবিজের 'ন্যাড়া' প্রকাশিত হয়েছে সবচেয়ে বেশি। ১৩৯৪-এর বৈশাখে যাত্রা শুরু করে ন্যাড়া নিয়মিত হাজিরা দিয়েছে সন্দেশের আসরে। ছোট ছোট এক পাতার কমিক্সের পাশাপাশি ন্যাড়ার কিছু বড় গল্পও প্রকাশিত হয়েছে সন্দেশের পাতায়। যেমন 'ন্যাড়ার মহাকাশ যাত্রা' (১৩৯৭), 'ন্যাড়া ও মৎস্য কন্যা' (পুজো ১৩৯৮), 'ন্যাড়ার শিল্প সাধনা' (বৈশাখ ১৩৯৯), 'ন্যাড়ার নুড়োজাহাজ' (পুজো ১৪০১) ইত্যাদি। অতি সম্প্রতি অরিজিৎ দত্ত চৌধুরী সৃষ্টি করেছেন তিন নতুন চরিত্রের —ঘোত্না, বাবাই ও বিল্টুর কীর্তিকলাপ, 'তিনমূর্তি' নামের কমিক্সে প্রকাশিত হয়েছে ১৪০৭-এর শারদীয়া সংখ্যায়।

কার্টুন ও বিদেশী চিত্রকাহিনীতে সত্যজিতের ছোঁয়া

সন্দেশে প্রথম দশকে চিত্রকাহিনী সংখ্যায় তেমন প্রকাশিত না হলেও কার্টুন কিন্তু নিয়মিতই প্রকাশিত হ'ত। সন্দেশে প্রথম কার্টুন প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৬৯-এর শ্রাবণ সংখ্যায়। অমল চক্রবর্তীর সেই কার্টুনটির ছবিটি ছিল একটা মৌমাছি স্ট্র দিয়ে ফুল থেকে মধু খাচ্ছে। নিচে ক্যাপশান 'কোকাকোলা নয় কিন্তু।'। অমল এঁকেছেন অনেক বক্স কার্টুন, মাঝে মঝে একাধিক বক্সের কার্টুনের সাহায্যে এক পাতা জোড়া গল্প। কখনও বা লম্বা একটা স্ট্রিপের কার্টুন। অমল ছাড়া অসংখ্য কার্টুন করেছেন সুফি। এ ছাড়াও মাঝে মাঝেই কার্টুন এঁকেছেন গৌতম বেনেগাল, শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য, শঙ্কর দাস, হিজিবিজিবিজ ও আরও অনেকে।

সন্দেশী কার্টুন সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে শুধু একটি বিষয়েই আলোকপাত করা যাক। বক্স-কার্টুন এবং তার সঙ্গে ছোট ছোট ক্যাপশন প্রকাশিত হয় প্রায় সব পত্রিকাতেই। কিন্তু সন্দেশে প্রকাশিত অমলের তিনটি বক্স কার্টুনের সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের সরস ছড়ার সংযোজনে কার্টুনগুলিকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছে। ১৩৭০-এর আষাঢ়ে প্রথম ছড়াসমেত কার্টুন প্রকাশিত হয়েছিল। ছবিটি ছিল ঢুলুঢুলু চোখে একটি মোরগ আড়মোড়া ভাঙছে, পাশেই ঘড়িতে অ্যালার্ম বাজছে, সঙ্গে ছড়া:

'ঠিক শুনেছি ঘড়ির আওয়াজ ঘুমজড়ানো চক্ষে
নইলে ওঠা কঠিন হ'ত ভোরে আমার পক্ষে'

এছাড়া আরও দুটো অসাধারণ ছড়া ছিল সেই বছরের দুটি কার্টুনের সঙ্গে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে জলের ধারে ডাঙায় দাঁড়িয়ে আছে বক। জলের নিচে মাছ, ওর চোখে পেরিস্কোপ। সঙ্গে ছড়া:

*'ডাঙার কাছে ঘুরে-বেড়াই পেরিস্কোপের জোরে
বকের এখন সাধ্যিও নেই আমায় নেয় ধরে'*

তৃতীয় বক্স কার্টুনটিতে রয়েছে একটি শকুনি, চোখে দূরবীণ লাগিয়ে আকাশে উড়ছে। সঙ্গের ছড়াটিতে আছে:

*একে টেকো তায় বুড়ো, চোখে ক্ষীণ দৃষ্টি
দূরবীণে ধরে ফেলি আছে কোথা কিস্টি'*

পরবর্তী পর্যায়ে সুফি এবং অন্যান্য কয়েকজনের কার্টুনের সঙ্গে ও সংযোজিত হয়েছে সত্যজিতের ছড়া।

আমাদের এই আলোচনায় দেশী চিত্রকাহিনী বা কার্টুন সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়নি। কয়েকটি চিত্রকাহিনীতে রয়েছে সত্যজিতের ছোঁয়া। ১৩৮৫-এর বৈশাখে প্রথম প্রকাশিত হয় উইনসর ম্যাক্কের 'দুঃস্বপ্ন'। অনুবাদ এবং লেটারিং সত্যজিৎ রায়ের। অনুবাদের বৈশিষ্ট্য এখানেই, লেখাগুলি পড়লে কখনোই মনে হয় না এতে আছে অনুবাদের গন্ধ। ১৩৯১তে এক পাতার একটি বিদেশী কমিক্স স্ট্রিপ বেরিয়েছিল ছ'টি সংখ্যায়। বব দ্য মুরের সৃষ্ট ওই চরিত্রটি সত্যজিতের হাতে পড়ে হয়েছে 'নন্দখুড়ো'। শুধুমাত্র নামকরণের জোরেই যে হয়ে যায় আমাদের আপনজন।

হীথ্ রবিনসনের কার্টুনগুলি সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা না করলে দেশী চিত্রকাহিনী/কার্টুনের প্রসঙ্গ অসমাপ্ত থেকে যাবে। ওগুলো

উইনসর ম্যাককে

নন্দ খুড়ো। বব দ্য মুর
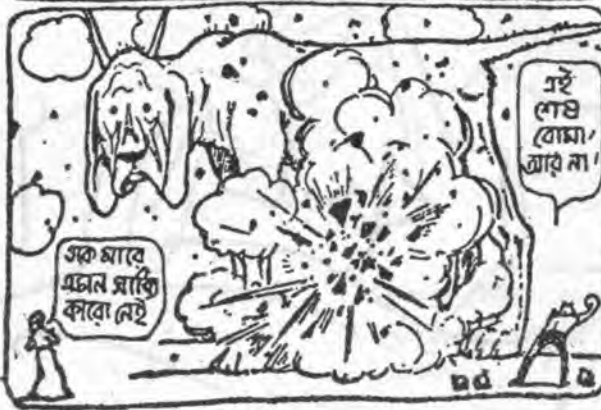
অবশ্যই বিদেশী কার্টুন, কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের অসাধারণ ছড়ার সংযোজনে বিদেশী কার্টুনগুলিতে এসেছে দেশী আমেজ। বিদেশে 'রেলওয়ে রিবল্‌ড্রি' নামে একটি বইতে উইলিয়ম হীথ্ রবিনসনের প্রচুর কার্টুন প্রকাশিত হয় (তথ্য হীথ রবিনসন। সন্দীপ রায়, বৈশাখ ১৩৮৮)। ১৩৮৭ ও ১৩৮৮তে 'রেলগাড়ির আদিপর্ব' নামে এর কয়েকটি কার্টুন সন্দেশে প্রকাশিত হয়। এছাড়া হীথ রবিনসনের অন্যান্য বেশ কয়েকটি কার্টুনও সন্দেশে প্রকাশিত হয়। ১৩৭৪-এর কার্তিক সংখ্যায় হীথের প্রথম কার্টুনটি ছাপা হয়। ওই কার্টুনগুলির সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল সত্যজিতের কয়েকটি অনবদ্য ছড়া।
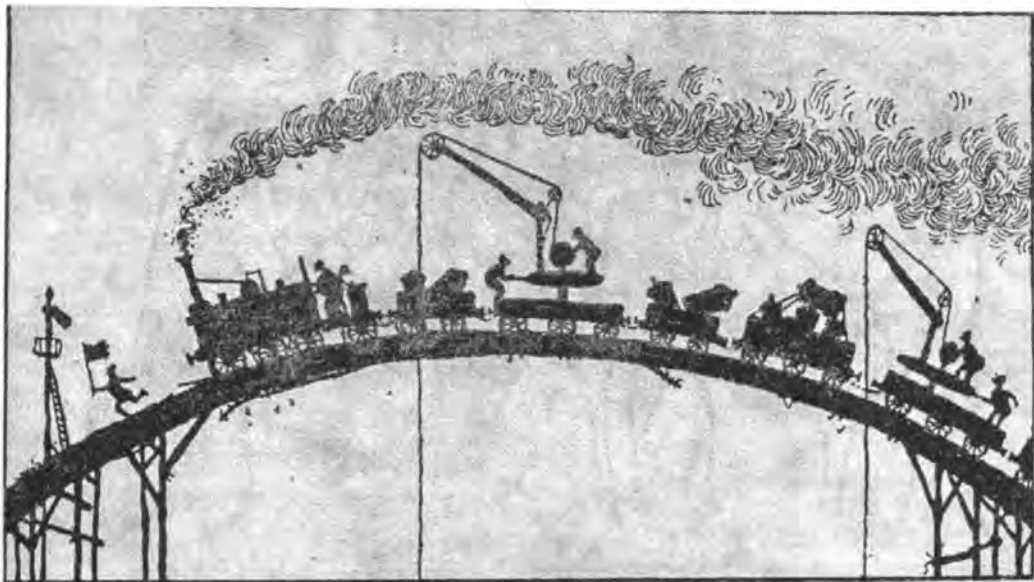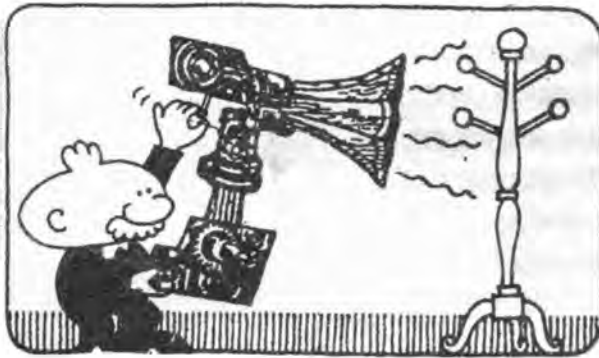
উইলিয়াম হীথ রবিনসন

কলিকাতা কোথা রে!

সুকুমার রায়

গিরিধি আরামপুরী, দেহ মন চিৎপাত;
খেয়ে শুয়ে হু হু ক'রে কেটে যায় দিনরাত;
হৈ চৈ হাঙ্গামা হুড়োতাড়া হেথা নেই;
মাস বার তারিখের কোনো কিছু ল্যাঠা নেই;
খিদে পেলে তেড়ে খাও, ঘুম পেলে ঘুমিও—
মোট কথা কি আরাম বুঝলে না তুমিও।
ভুলেই গেছিনু কোথা এই ধরা মাঝেতে
আছে সে শহর এক কলকেতা নামেতে—
হেনকালে চেয়ে দেখি চিঠি এক সমুখে,
চায়েতে অমুক দিন ভোজ দেয় অমুকে।
'কোথায়? কোথায়?' বলে মন ওঠে লাফিয়ে,
তাড়াতাড়ি চিঠিখানা তেড়ে ধরি চাপিয়ে,

ঠিকানাটা চেয়ে দেখি নিচু পানে ওধারে
লেখা আছে 'কলিকাতা' —সে আবার কোথা রে!
স্মৃতি কয় 'কলিকাতা? রোসো দেখি; তাই তো,
কোথায় শুনেছি যেন মনে ঠিক নাই তো।'
কোতিক শুধালেম সাধুরাম ধোপারে;
সে কহিল, 'হলে হবে উশ্রীর ওপারে।'
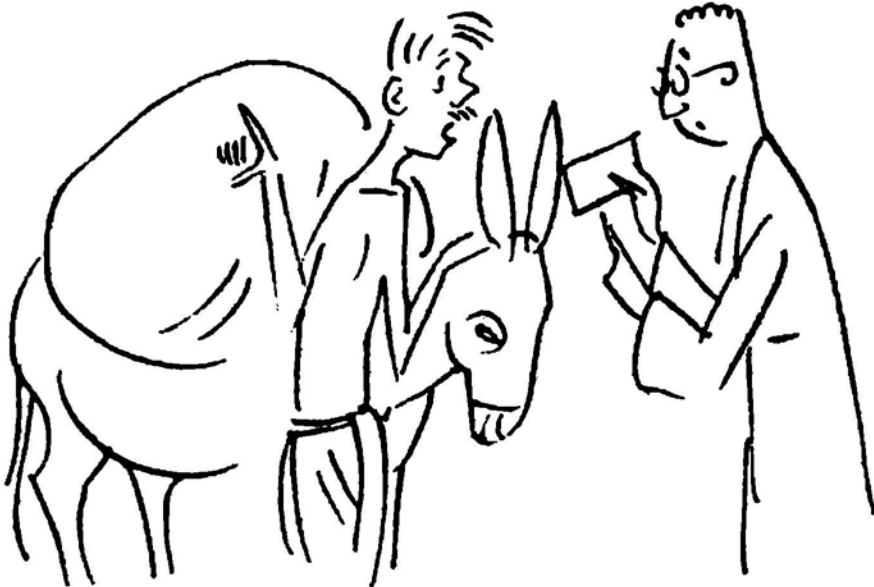
ওপারের জেলে বুড়ো মাথা নেড়ে কয় সে,
‘হেন নাম শুনি নাই আমার এ বয়সে।’

তারপরে পুছিলাম সরকারী মজুরে;
তমাম মুলুক সে তো বাৎলায় ‘হুজুরে’
বেস্তাবাদ, বরাকর, ইদিকে পচম্বা
উদিকে পরেশনাথ পাড়ি দাও লম্বা,
সব তার সড়গড় নেই কোনো ভুল তায়—
‘কলিকাতা কাঁহা’ বলি সেও মাথা চুলকায়।

অবশেষে নিরুপায় মাথা যায় ঘুলিয়ে,
'টাইমটেবিল' খুলে দেখি চোখ বুলিয়ে।
সেথায় পাটনা, পুরী, গয়া, গোমো, মাল্দ,
বজবজ, দমদম, হাওড়া ও শিয়াল্দ,
ইত্যাদি কত নাম চেয়ে দেখি সামনেই;
তার মাঝে কোনোখানে কলিকাতা নাম নেই।
—সব ফাঁকি বুজরুকী রসিকতা-চেষ্টা।
উদ্দেশে 'শালা' বলি গাল দিনু শেষটা।।

সহসা স্মৃতিতে যেন লাগিল কি ফুৎকার
উদিল কুমড়া হেন চাঁদপানা মুখ কার।
আশে-পাশে টিপিটুপি পাহাড়ের পুঞ্জ,
মুখ চাঁচা ময়দান, মাঝে কিবা কুঞ্জ।
সে শোভা স্মরণে ঝরে নয়নের ঝরণা;
গৃহিনীরে কহি, 'প্রিয়ে! মারা যাই ধর না।'
তারপরে দেখি ঘরে অতি ঘোর অনাচার—
রাখে না কো কেউ কোনো তারিখের সমাচার
তখনি আনিয়া পাঁজি দেখা গেল গণিয়া,
চায়ের সময় এল একবারে ঘনিয়া।

হায় রে সময় নাই, মন কাঁদে হতাশে—
কোথায় চায়ের মেলা! মুখশশী কোথা সে।
স্বপন শুকায়ে যায় আঁধারিয়া নয়নে,
কবিতায় বলি তাই গাহি শোক শয়নে।

হোম ভিলা, বারগণ্ডা, গিরিধি
৮/১/১৯২২

(মিসেস এস.কে.দত্তকে লেখা কবিতায় চিঠি।)

অলঙ্করণ : সত্যজিৎ রায়

রেবন্ত গোস্বামী

গল্পটা লিখেছিলেন নাট্যকার মন্মথ রায়, বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর। মন্মথ রায়ের স্কুলজীবনের ঘটনা। একদিন ব্যাকরণ ক্লাসে যখন মাস্টারমশাই পড়াচ্ছেন, তিনি তখন একমনে পেনসিল কাটছিলেন। মাস্টারমশাই হঠাৎ পড়ানো বন্ধ করে তাঁকে দাঁড়াতে বলে জিজ্ঞেস করলেন, সব শেষে তিনি কোনটা পড়াচ্ছিলেন। বলা বাহুল্য, মন্মথ বলতে পারেননি। তখন মাস্টারমশাই তাঁকে বলেছিলেন, 'মন্মথ, দ্বিকর্মক ক্রিয়া হলেও দ্বিকর্মক কর্তা হয় না। ক্লাসের পড়া শোনা আর পেনসিল কাটা—দুটো কাজ একসঙ্গে করা যায় না।'

এর বেশ কয়েক বছর পরের ব্যাপার। তখন তিনি এক লাগাতার পেট ব্যথায় ভুগছিলেন। অনেক ডাক্তার দেখানো হল। পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হল। প্রেসক্রিপশনের এক বই তৈরি হয়ে গেল। কিন্তু উপসর্গের উপশম না হওয়াতে কেউ একজন পরামর্শ দিলেন, বিধান রায়কে দেখানো হক। একজন মুরুব্বি যোগার করে তাঁর সঙ্গে যাওয়া হল ডাক্তার বিধান রায়ের চেম্বারে। অনেক রোগীর ভিড়। মন্মথনাথের ডাক পড়লে অভিভাবকের সঙ্গে ভেতরে ঢুকে তিনি দেখলেন, চেয়ারে বসে এক দীর্ঘাঙ্গ ব্যক্তি। পাশে দু'তিনটে টেলিফোন হরদম বেজে যাচ্ছে আর তিনি একটার পর একটা ধরে কথা বলছেন। ইঙ্গিতে দু'জনকে বসতে বললেন বিধানচন্দ্র। টেলিফোন রেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে তোমার?' রোগীর সঙ্গী ভদ্রলোক বলতে শুরু করতেই আবার টেলিফোন। সে ব্যাপার চুকতেই পুরনো প্রশ্নে ফিরে না গিয়ে বললেন, 'আগে চিকিৎসা হয়েছে, দেখি।' এগিয়ে দেওয়া হল সেই প্রেসক্রিপশন আর রিপোর্টের ফাইল। দু'এক পাতা উলটিয়ে দেখতে না দেখতে আবার টেলিফোন। তিনি ফাইলটা ফেরৎ দিয়ে টেলিফোনে কিছু কথা বললেন। কথা শেষ হলে রোগীর জন্য খসখস করে প্রেসক্রিপশন লিখে রোগীর অভিভাবকের হাতে দিয়েই পরের রোগীকে ডাকতে বললেন।

হতাশ হয়ে ফিরে চললেন মন্মথনাথ ও তাঁর অভিভাবক। নামেই বড় ডাক্তার। কিছুই তো দেখলেন না, শুনলেন না। তবুও প্রেসক্রিপশনে লেখা ওষুধ কিনে নিয়মমতো খেতেই হল তাঁকে। তারপর—মন্মথনাথ লিখেছিলেন, সেই যে পেটের ব্যথা অদৃশ্য হল, আশি বছর পর্যন্ত অন্তত ওই উপসর্গে আর ভুগতে হয়নি। তিনি তখন মনে মনে বলেছিলেন, 'না, পণ্ডিতমশাই। আপনি ভুল বলেছিলেন। দ্বিকর্মক কর্তাও হয়—কখনোসখনো।'

এই লেখা পড়ার বেশ কয়েক বছর পরে আমি নিজে এলাম এক দীর্ঘাঙ্গ ব্যক্তির সান্নিধ্যে। নিঃসন্দেহে তাঁর সময়ে কলকাতার ব্যস্ততম অরাজনৈতিক ব্যক্তি। কিন্তু তাঁকে টেলিফোন করলে কোনওদিন দুইবার রিং হতে শুনিনি। তার আগেই সেই জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর। তাঁর বাড়ির দরজায় ঘন্টি বাজালে স্বয়ং নিজেই দরজা খুলেছেন। এমন কি, প্রয়োজন না থাকলেও, চলে আসার সময় দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এসে নিজেই দরজা বন্ধ করেছেন। তোমরা তো জানোই কার কথা লিখছি। হ্যাঁ, সত্যজিৎ রায়। তবে আমাদের কাছে ছিলেন সর্বজনীন মাণিকদা।

প্রথম দেখেছিলাম এক বিদেশী সিনেমার প্রদর্শনীতে সরলা মেমোরিয়াল হলে। সামনের সীটেই একজন লম্বা লোক বসে থাকাতে, বলা বাহুল্য, একটু অস্বস্তি হচ্ছিল। ছবি শেষ হওয়ার পর লোকের ভীড়ে তাঁকে দেখলাম একেবারে পাশে। শুনেছিলাম, সন্দেশে আমার প্রথম যে ধারাবাহিক গল্পটি প্রকাশিত হচ্ছে, তার সচিত্র নামাঙ্কনটা তিনিই করেছেন। কিন্তু তখন তো পরিচয় নেই, পরিবেশও অন্য রকম। পরে পরিচয় হলে তাঁর কাছে অগুন্তিবার গিয়েছি নানা উপলক্ষ্যে। কখনও একা, কখনও অন্য কারো সঙ্গে। কখনও সন্দেশের মীটিং-এ। একটা চলচ্চিত্রের কাজ শেষ করে পরেরটি আরম্ভ করার আগে ওই বিষয়ে কাজের চাপ কিছু কম থাকত। তখন অনেকক্ষণ কাটাতাম তাঁর কাছে। দরজায় সেলোটেপে আঁটা কাগজখণ্ডের বক্তব্যটা যে আমাদের —সন্দেশের লেখকদের প্রতি প্রযোজ্য নয়, সেটা তো বুঝেই ফেলেছিলাম। তখন দেখতাম, ছবি আঁকতে আঁকতেই টেলিফোন ধরছেন। হয়তো একতাড়া চিঠি নিয়ে বসেছেন, কিন্তু মনে রেখেছেন, সামনে বসে আছি, আমি বা অন্য কেউ। চিঠি পড়তে পড়তেই মাঝে মাঝে বলছেন, 'তারপর শিশিরের খবর কী? তোমার ওপর নাকি রেগে আছে? মঞ্জিল কেমন আছে?' ইত্যাদি। এরকম সজাগ সৌজন্য দেখানোর ক্ষমতা বা প্রতিভা—দুটোই অনেক তথাকথিত ব্যস্ত বুদ্ধিজীবিদের নেই। সন্দেশের কুড়ি বছর পূর্তির পর বাছাই লেখা নিয়ে 'সেরা সন্দেশ'

সত্যজিৎ রায়, রেবন্ত গোস্বামী, অচল চৌধুরী, ভবানীপ্রসাদ দে
ও জীবন সর্দার।

(নামকরণ তাঁর) প্রকাশ করার প্রস্তাব নিয়ে আমরা যখন গেলাম, ঠাট্টা করে বলেছিলেন, 'পঁচিশ বছরেই তো রজতজয়ন্তী হয়, জানি। এটা কি তবে টিন-জয়ন্তী?' আমি গল্প কবিতা দুটোই লিখে যাচ্ছি বলে তিনি বলেছিলেন, রেবন্তর দুই রকম লেখাই যাবে। অনেক গর্ববোধের মধ্যে এটাও আমার একটি।

আজ মনে এক অপরাধবোধ আসে, যখন ভাবি, তাঁর কাছে গিয়ে সময় কাটিয়ে তাঁর যে সময়টা নষ্ট করেছি, সেই সময়টাতে হয়তো কিছু সৃষ্টি হতে পারত। এমন কি, হয়তো এমন সময়ে টেলিফোন করেছি, যে সময়ে কোনও ছবি আঁকছিলেন বা কিছু লিখছিলেন। মনঃসংযোগ কিছু তো নষ্ট হয়েছিল। আবার ভাবি, তিনি তো ইচ্ছে করলেই অন্য কাউকে টেলিফোন ধরার জন্য বা দরজা খোলার জন্য বলতে পারতেন। তা তো করেননি। কারণ, এই পৃথিবীতে খুব কম ব্যক্তিই জন্মগ্রহণ করেন, যাঁরা দ্বিকর্মককর্তা। একটু ভুল বললাম। তিনি তো ছিলেন বহু-কর্মককর্তা। সৌজন্য প্রদর্শনও সব কর্মের মধ্যে মিশে থাকত।

মাণিকদার প্রসঙ্গে এই নগণ্য লেখকও কয়েকটি ব্যাপারে গর্ববোধ করি। একটি তো বলেইছি। একবার সন্দেশে 'মৃত্যুবাণ' নামে একটি গল্প লিখেছিলাম। গল্পের নামটা বড় বড় করে লেখার সময় একটা ওস্তাদি করেছিলাম। নামটায় য-ফলা বা আ-কারটাকে আমার অক্ষম হাতেই একটা ছোরার মত করে এঁকে দিয়েছিলাম। গল্পের হেডপীস মাণিকদাই করেছিলেন। যখন দেখলাম, আমার খেয়ালিপনাকেই নামাঙ্কনে রূপ দিয়েছেন, তখন এক আশ্চর্য আনন্দ অনুভূতি জেগেছিল। আর একবার একটি গল্প লিখে তার কোনও নামকরণ না করে সঙ্গে একটা চিরকুটে লিখে দিলাম; গল্পটি পছন্দ হলে একটা নাম যেন মাণিকদাই দিয়ে দেন। গল্পটির নামকরণ তিনি করেছিলেন- 'শ্যামল পালের সমস্যা'। এটা বোধহয় পাঠকদের ভালোই লেগেছিল। কারণ, সন্দেশের এই গল্পটি পড়েই আনন্দমেলার সম্পাদক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী আমাকে চিঠি লিখেছিলেন। তার উল্লেখ তো আমি 'লেখক হওয়ার গপ্পো'-তেই করেছি। এমন কি, গল্পটির নামের প্রথম শব্দটি বদল করে আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি সম্পাদকীয় লেখার শিরোনামও করা হয়েছিল।

মানিকদা আমাকে বাড়িতে একবারই টেলিফোন করেছিলেন। সেটা তাঁর শেষ ছবি 'আগন্তুক'-এর বিশেষ প্রদর্শনীতে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে। আর তাঁর শেষ যে চিঠিটি ডাকে আমার বাড়ির ঠিকানায় আসে, সেটি আমার নামে নয়, আমার মেয়ের নামে। এবং সেটি তাঁর মৃত্যুর কয়েক মাস আগে। আমি নিজে তেমন সুস্থ না থাকায় ডাক মারফৎ তাঁকে আমন্ত্রণপত্র পাঠিয়েছিলাম মেয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে। তখন তাঁর শরীর অন্য দিক থেকে সুস্থ থাকলেও ছবির জন্য কিছুই করতে পারছেন না। আঁকা তো দূরের কথা, লেখাতেও অসুবিধা হচ্ছে। সেই কারণে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার অক্ষমতা জানিয়ে, পত্র পাঠালেন। আমার মেয়েকে লেখা সেই আশীর্বাদপত্র সংরক্ষিত আছে আমার পরিবারে।

এবারের সন্দেশ

অশোককুমার মিত্র

'যা হা হউক আমরা যে সন্দেশ খাই তাহার দুইটি গুণ আছে। উহা খাইতে ভালো লাগে আর উহাতে শরীরে বল হয়। আমাদের এই যে পত্রিকাখানি সন্দেশ নাম লইয়া সকলের নিকটে উপস্থিত হইতেছে উহাতে যদি এই দুটো গুণ থাকে অর্থাৎ ইহা পড়িয়া যদি সকলের ভালো লাগে আর কিছু উপকার হয় তবে ইহার সন্দেশ নাম সার্থক হইবে।'

সন্দেশের প্রথম পর্যায়ের প্রথম সংখ্যায় প্রথম সম্পাদক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এমন একটি মনোবাসনা ব্যক্ত করে-ছিলেন। তাঁর সে আশা সর্বাংশে পূর্ণ হয়েছিল। মাত্র কয়েক বছরের অস্তিত্বে (প্রথম পর্যায় ১৩২০-৩৩) 'সন্দেশ' বাংলা শিশুসাহিত্য সাময়িক পত্রের ক্ষেত্রে শুধু নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যে এক অবিস্মরণীয় প্রভাব রেখে গেছে। বুদ্ধদেব বসুর কথায়—'সাহিত্যের সেই প্রথম অবস্থায় খুব বেশি কেউ চাইতে শেখেনি, কিন্তু প্রাণের অব্যক্ত ইচ্ছা পূর্ণ হয়ে উঠল একটি পত্রিকায়। ছোটদের আশার হরিণকে দিগন্তের দিকে ছুটিয়ে দিয়ে মাসে মাসে আসত 'সন্দেশ', আসত তার আশ্চর্য মলাট আর ভেতরকার মনোহরণ ছবি নিয়ে, আসত দুই মলাটের মধ্যে সাহিত্যের বিচিত্র ভোজে উজ্জ্বল পাইকা অক্ষরের পরিবেশনে কবিতা-গল্প -উপকথা-পুরাণ-প্রবন্ধ-ছবি-ধাঁধা—সন্দেশের ভোজ্য তালিকায় এমন কিছু ছিল না যা সুস্বাদু নয়, সুখাদ্য নয়, যাতে উপভোগ্যতা আর পুষ্টিকরতার সঙ্গে সমন্বয় ঘটেনি।'

ছোটদের সাহিত্যপত্রের সঙ্গে উপেন্দ্রকিশোরের সখ্যতা সেই 'সখা'র যুগ থেকে, 'সন্দেশ' প্রকাশের তিরিশ বছরেরও বেশি সময় আগে থেকে। 'সাথী' ও 'মুকুল' গড়ার কালেও তাঁর ভূমিকা ছিল। আধুনিক পথ নির্মাতারা যেমন কাজ শুরু করার আগে প্রভাবিত অঞ্চলের জরিপ করেন, সমীক্ষা করেন, পরিকল্পনা করেন, পরে নির্মান কাজে হাত দেন—উপেন্দ্রকিশোরের ক্ষেত্রে 'সন্দেশ' প্রকাশের প্রকৃত উদ্যোগ গ্রহণের আগে পরিকল্পনা ইত্যাদি প্রাক-নির্মান পর্বের স্তরগুলি রপ্ত করেছিলেন পূর্বে প্রকাশিত পত্রিকাগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থেকে। নইলে প্রথম প্রকাশেই পত্রিকাটির মান এত উন্নত হ'ল কী করে!

ছোটদের পত্রিকা প্রকাশের মধ্য দিয়ে সেকালে একটি সামাজিক দায়িত্ব পালিত হ'ত—তাই শুধুমাত্র সম্পাদকের ডেস্কে বসেই উপেন্দ্রকিশোর তাঁর দায়িত্ব শেষ করতেন না। তিনি কলকাতার বাইরে যেতেন, সুযোগ পেলেই গ্রাহক, পাঠকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ গড়ে তুলতেন। 'সন্দেশ'-এর প্রথম বছরের গ্রাহক ও পরবর্তীকালের নিয়মিত লেখক ও প্রখ্যাত কবি সুনির্মল বসুর সাক্ষ্য, '....শোনা গেল UR অর্থাৎ 'সন্দেশ' সম্পাদক উপেন্দ্রবাবু কিছুদিনের জন্য গিরিডি বেড়াতে আসছেন,...একদিন উপেন্দ্রবাবু এলেন বারগান্ডা অঞ্চলে হোম ভিলাতে (অমলচন্দ্র হোমের বাড়ি)। তাঁর দাড়িওলা সুন্দর চেহারা দেখে আমরা ধন্য হলাম।...উপেন্দ্রবাবু গ্রহ-নক্ষত্র নিয়ে একটা বক্তৃতা দেবেন। আকাশের দিকে আঙুল তুলে আমাদের কাছে গ্রহ নক্ষত্রদের পরিচয় দিতে লাগলেন। ভারি সরস বক্তৃতা। কোনটা কালপুরুষ, কোনটা সপ্তর্ষিমণ্ডল...এসব আমাদের চিনিয়ে দিলেন।

'স্থানীয় ব্রাহ্ম সমাজে রবিবার বিকেলে ছেলেমেয়েদের জন্য নীতি বিদ্যালয় খোলা হয়েছিল, এখানেও উপেন্দ্রবাবু আসতেন। বেহালা বাজাতেন, আর নীতিমূলক গল্প বলতেন—বেহালা বাজিয়ে ছেলেদের গান শেখাতেন।'

প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে 'সন্দেশ' শিশু-প্রিয় পত্রিকা হয়ে ওঠে। যেমন বিষয় বৈচিত্রে প্রতিটি সংখ্যা ঝলমল করত, তেমনই আকর্ষণীয় ছিল এর লেখার তালিকা। কে লেখেননি সন্দেশে? উপেন্দ্রকিশোর ছাড়াও লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ, শিবনাথ শাস্ত্রী, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, বিজয়চন্দ্র সরকার, সুকুমার রায়, সুখলতা রাও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কালিদাস রায়, সুনির্মল বসু, কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত, অসিত হালদার, কুমুদরঞ্জন রায়, সীতা দেবী, প্রিয়ংবদা দেবী, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় (জগন্নাথ পণ্ডিত), ইত্যাদি সেকালের লেখক লেখিকারা। আর কিশোর পাঠক হিসেবে সুনির্মলের আনন্দঘন উপলব্ধি—'বাড়ি এসে সন্দেশের মধ্যে ডুবে গেলাম। কী সুন্দর ছবি, গল্প, কবিতা, ধাঁধা আমায় যেন এক নতুন রাজ্যে নিয়ে গেল। প্রতি সংখ্যায় প্রথমেই রঙিন ছবি আর ভেতরে শিল্পীর নাম UR লেখা। ইনি যে উপেন্দ্রকিশোর রায় তা আর বুঝতে দেরি হ'ল না।

'এই 'সন্দেশ' আমার জীবনে এক আনন্দময় যুগ নিয়ে এল।

প্রতি মাসের পয়লা তারিখে ডাকের পথ চেয়ে থাকতাম—আমাদের লোক ভোরবেলা (গিরিডির) ডাকঘরে গিয়ে চিঠি নিয়ে আসত, 'সন্দেশ' যদি পয়লা তারিখে তার হাতে না দেখতাম মুখ শুকিয়ে যেত। তারপর দিন আবার আকুল হয়ে প্রতীক্ষা করতাম—দূর থেকে লক্ষ্য করতাম লোকটার হাতে অন্যান্য চিঠিপত্রের মধ্যে উঁচু হয় আছে সন্দেশের বাদামী মোড়ক—আনন্দে প্রাণ নেচে উঠত।'

সন্দেশের বয়স, যখন আড়াই বছর তখন মাত্র বাহান্ন বছর বয়সে উপেন্দ্রকিশোরের জীবনাবসান হয়, এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সুকুমার রায় ২৮বছর বয়সে সন্দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সন্দেশের পাতায় তাঁর লেখা গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ এবং S R স্বাক্ষরিত ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হ'ত। সন্দেশের সম্পাদনার ভার নেবার পর তাঁর কলম যেন শতমুখী ঝর্ণার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে বাংলা শিশু সাহিত্যের দু'কূল ভাসিয়ে নিয়ে যায়। পৌনে আট বছরে সন্দেশের জন্য নিজেকে উজাড় করে দিয়ে নিজের ছত্রিশ বছর পূর্ণ হবার আগেই দুরারোগ্য কালাজ্বরে সুকুমার রায় লোকান্তরিত হ'ন। তাঁর মধ্যম ভ্রাতা সুবিনয় রায়ের আন্তরিক চেষ্টা থাকলেও তাঁর সম্পাদনাকালে রক্তাল্পতায় ভুগে ভুগে 'সন্দেশ' একদিন বন্ধ হয়ে যায়।

বছর পাঁচেক বন্ধ থাকার পর ১৩৩৮-এর শরৎকালে 'কার্তিক'-এ সন্দেশের পুনরাবির্ভাব ঘটে। এবারও উদ্যোক্তা—সুবিনয় রায়-চৌধুরী, সঙ্গী বন্ধু সুধাবিন্দু বিশ্বাস। মাত্র তিন বছর প্রকাশের পর আবার পত্রিকাটির জীবনী শক্তি ফুরিয়ে যায়।

তারপরে সিকি শতাব্দী সময় পার হয়ে গেছে। বদলে গেছে দেশের ইতিহাস, ভূগোল। যুদ্ধ-মহামারী-দাঙ্গা-দেশভাগ একের পর এক ঘটে গেছে। সুকুমার রায়ের একমাত্র পুত্র সত্যজিৎ রায় তাঁর সাফল্যের প্রথম সরণি গ্রাফিক শিল্পচর্চাকে গৌণ করে তখন চলচ্চিত্রশিল্পে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েছেন। ততদিনে অপু ট্রিলোজি ছাড়াও 'জলসাঘর', 'পরশপাথর' ও 'দেবী'র পর রবীন্দ্র শতবর্ষে 'তিন কন্যা' ছবির কাজ চলছে।

অরুণিমা রায়চৌধুরী, জীবন সর্দার (বই মেলায়)

রাহুল মজুমদার ও সত্যজিৎ রায়

সুকুমার ভট্টাচার্য, রাহুল মজুমদার, শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

সত্যজিৎ রায়

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

শিশিরকুমার মজুমদার ও মঞ্জিল সেন

সেই সময় একদিন বন্ধু কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় 'সন্দেশ' পুনঃপ্রকাশের প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। ছোটদের গ্রন্থ প্রকাশনায় এম. সি. সরকার ও মূলতঃ সিগনেট প্রেসের সঙ্গে সত্যজিতের যোগাযোগ ছিল। ছোটদের পত্রিকা রংমশালেও তিনি কিছু কাজ করেছিলেন। ১৩৫০-এ ওই পত্রিকায়, বিশেষতঃ সুকুমার রায় সংখ্যায় (অগ্রহায়ণ) তাঁর প্রথম পত্রিকা-প্রচ্ছদ আঁকা (সুকুমার রায়কে নিয়ে এটি প্রথম একটি পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা)। তারপরে ১৩৫৩ ও ১৩৫৪ সালেও প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছেন, সঙ্গে কিছু ইলাসট্রেশন, ক'টি হেড-পিস। আর এখন তো তিনি নতুন পথের পথিক। আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন চলচ্চিত্রকার। প্রতিষ্ঠিত। ব্যস্তও। তাই সন্দেশের পুনঃ প্রকাশের প্রস্তাবে তাঁর সম্মতি থাকলেও দায়িত্ব গ্রহণে কিছু দ্বিধা ছিল। তবে প্রস্তাবটিতে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ যিনি দেখিয়েছিলেন তিনি সত্যজিৎ-জননী সুপ্রভা রায়। অবশ্য সন্দেশের পুনঃপ্রকাশ তিনি দেখে যেতে পারেননি, তার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। উপেন্দ্রকিশোরের কনিষ্ঠ পুত্র সুবিমল রায়ও এই ভাবনাটির রূপ দিতে আগ্রহী হ'ন।

ইউ. রায়. এন্ড কোম্পানির স্বত্ব যাঁরা কিনেছিলেন—তাঁদের খুঁজে বের করা হ'ল। তাঁদের কাছ থেকে 'সন্দেশ' প্রকাশের অনুমতি সংগ্রহ করা গেল। তবু নতুন এক বিপত্তি দেখা দিল। 'সন্দেশ' পত্রিকার নাম-স্বত্ব সংগ্রহ করেছিলেন হাওড়া জেলার নবাসন গ্রামের তারাপদ সাঁতরা। তারাপদবাবু প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার মানুষ। একদা রাজনীতি করতেন। তাঁর 'সন্দেশ' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকায় শ্রমিক আন্দোলন বিষয়ে নিবন্ধ ও সংবাদ প্রকাশিত হ'ত। 'সন্দেশ' নামের সরকারী ছাড়পত্র তখন তাঁরই হাতে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পুরনো রাজনৈতিক যোগাযোগের সুবাদে সহজে তাঁর কাছে পৌঁছনো গেল। তিনিও নব-পর্যায়ের 'সন্দেশ' প্রকাশোদ্যোগীদের হাতে নামস্বত্ব তুলে দিতে দ্বিধা করলেন না। ১৭২ নং ধর্মতলা স্ট্রিট (লেনিন সরনি)-এর দোতলায় অফিস ঘর ভাড়া নেওয়া হ'ল। সম্পাদক হলেন সত্যজিৎ রায় ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়। বিজ্ঞাপন দিয়ে গ্রাহক সংগ্রহ শুরু হয়ে গেল। ১৩৬৮র বৈশাখ (১৯৬১র মে) মাসে এ বারের (তৃতীয় পর্যায়ের) সন্দেশের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হ'ল। ৩ নং লেক টেম্পল রোড, কলকাতা-২৯ থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকার মূল্য ছিল ৭৫ পয়সা, বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা সডাক ন'টাকা। কাগজের মাপও এখনকার মতো (২৩ × ১৮ সেমি.), পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৬৪।

এ পর্যায়ের সন্দেশের প্রথম সংখ্যায় পুনঃপ্রকাশিত সন্দেশে প্রথম সম্পাদকীয় ছাড়া ও পুণ্যলতা চক্রবর্তী লিখেছিলেন পুরনো সন্দেশের কথা। সত্যজিৎ রায়ের অলঙ্করণে পুনর্মুদ্রিত হ'ল উপেন্দ্রকিশোরের অসাধারণ গল্প দুখীরাম। মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় লিখলেন রবীন্দ্রনাথের কথা 'কত্তাবাবা'। সুখলতা রাও, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় কবিতা লিখেছেন। দু'টি ধারাবাহিক উপন্যাস শুরু করেন বিখ্যাত লীলা মজুমদার ও 'ববির বন্ধু'-খ্যাত গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, নাম যথাক্রমে 'টংলিং' ও 'পিকলুর সেই ছোটকা'। 'পাপাঙ্গুল' শিরোনামে এডওয়ার্ড লিয়রের বিখ্যাত কবিতা Jumblies-এর চমৎকার বাংলা রূপান্তর ঘটালেন সত্যজিৎ রায়। যাঁরা সন্দেশের সম্পাদনার কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যে একমাত্র সম্পাদক সত্যজিৎই এই কাগজে লিখেই লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। এই সংখ্যায় শুরু হয় অরুণনাথ চক্রবর্তীর 'দাদুর গল্প'। জ্যোতিভূষণ চাকীর 'কোথা থেকে গল্প এল'। সম্পাদক সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখলেন বনমানুষের গল্প—'জেনি মেমসাহেব নয়'। তবে চমকপ্রদ প্রকাশনা অমল দাশগুপ্তের প্রবন্ধ 'মহাকাশে মানুষ'। ওই বছরে ১২ই এপ্রিল য়ুরি গ্যাগারিন মহাকাশ যাত্রা করেন এবং মে মাসের প্রথমেই সেই বিস্ময়কর ঘটনাকে ভিত্তি করে লেখা প্রকাশ ছোটদের মাসিক পত্রিকার পক্ষে নিশ্চয় গৌরবের এবং পরিচালকদের কিশোর পাঠক সম্পর্কে গভীর দায়িত্ববোধের পরিচয় বহন করে।

'সন্দেশ' প্রকাশের খবর পেয়ে পুরানো দিনের সন্দেশের অনেক গ্রাহকও চিঠি লিখে এই প্রয়াসকে সাধুবাদ জানান। বিহারের শোনপুর থেকে প্রবোধকুমার ভট্টাচার্য লেখেন —'প্রায় ৩০ বছর আগে ছাত্রাবস্থায় আমি অনেকদিন সন্দেশের গ্রাহক ছিলাম এবং আমার গ্রাহক নম্বর ২ ছিল, তাহা আজও মনে আছে। আজ সন্দেশের পুনরাবির্ভাবের সংবাদ পাইয়া আমার এক পুত্র আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে।'

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসটি পাঁচটি সংখ্যায় শেষ হয়ে যায়। আর 'টং লিং' পুজো সংখ্যা বাদে সারা বছর প্রকাশিত হয়ে চৈত্রে শেষ হয়।

সত্যজিৎ লুই ক্যারল ও এডওয়ার্ড লিয়রের ছড়া কবিতার অনুবাদ প্রকাশ করেন এ বছর আরও পাঁচটি সংখ্যায়। তা ছাড়া তাঁর আশ্চর্য চরিত্র প্রোফেসর শঙ্কুকে হাজির করেন পুজো সংখ্যায়। 'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি' বের হয় পর পর তিন সংখ্যায়। বিরাট উল্কা-পাতের ফলে সুন্দরবনে যে গর্ত সৃষ্টি হয়েছিল সেখানে পাওয়া গেল এক বিচিত্র খাতা, যার রঙ বদল হয় আপনা থেকেই, যে খাতা ছেঁড়ে না, আগুনে পোড়ে না, কপি হলেই যার পাতা খেয়ে ফেলে ডেঁয়োপিঁপড়ে। সুকুমার রায়ও হেঁসোরাম হুঁশিয়ারের ডায়রি হাজির করেছিলেন, তবে সেটি লিখেছিল হেঁসোরামের ভাগ্নে চন্দ্রখাই। আর প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদা অবশ্য নিজেই তাঁর কৃতিত্বের কাহিনী শুনিয়েছেন, তবু প্রোফেসর শঙ্কুর সঙ্গে তাঁদের কারও তুলনা চলে না।

তারও পরে পর পর দু' সংখ্যায় দু'টি মৌলিক গল্প লেখেন 'বন্ধুবাবুর বন্ধু' (মাঘ) ও 'টেরোড্যাক্টিলের ডিম' (ফাল্গুন)। আর ছোটদের সাহিত্যে স্থায়ী আসনের জবরদস্ত দাবীদার হিসেবে তখনই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

প্রথম বছরেই 'সন্দেশ' নজর-কাড়া যে সব লেখকদের রচনা প্রকাশ করে তাঁদের তালিকায় ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি ভালুক শিকারের আশ্চর্য গল্প শুনিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'সম্পত্তি সমর্পণ'-এর নাট্যরূপ দিয়েছিলেন ক্ষিতীশ রায়। ক্ষিতিমোহন সেনের গল্প 'গাছের নাম বাঘ শাল'। উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার, সুবিনয়, কুলদারঞ্জনের লেখার পুনর্মুদ্রণ ছাড়াও নতুন রচনাকারীদের মধ্যে ছিলেন সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যয়, বিমল দত্ত, অজিত দত্ত, অশোকানন্দ দাশ, সুকুমার দে সরকার, বিষ্ণু দে, বিমলচন্দ্র ঘোষ, আশাপূর্ণা দেবী, কল্যাণী কার্লেকার, নলিনী দাশ, বিজয়া রায়, সুবিনয় রায়, প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যয়, উপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক। অশোক মিত্র ছিলেন তখনকার সেন্সাস কমিশনার। তিনি চমৎকার একটা রচনা উপহার দিলেন, 'সারা ভারতের রোলকল', জনগণনা বিষয়ে তথ্যপূর্ণ লেখা। গৌরী চৌধুরী (তখনও ধর্মপাল হননি) ধারাবাহিক 'মালশ্রীর পঞ্চতন্ত্র' লিখেছেন। পূর্ণেন্দু পত্রী ইতিহাসের সচিত্র গল্প লিখলেন —'জলের ডাকাত ডাঙার রাজা'। বিখ্যাত ফুটবলার শৈলেন মান্নার লেখাও এ বছর বেরিয়েছিল।

দ্বিতীয় বছরে শুরু হ'ল চার মূর্তিকে নিয়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস 'ঝাউ বাংলোর রহস্য'। প্রথম বছর পুজো সংখ্যায় তিনি লিখেছিলেন 'হরিশপুরের রসিকতা'। পরে 'কম্বল নিরুদ্দেশ' নামে আরও একটি ধারাবাহিক উপন্যাসও সন্দেশে লিখেছেন। সন্দেশের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। দ্বিতীয় বছর ঢাকা থেকে শামসুর রহমান 'কলের কাহিনী' নামক কবিতায় নিখেছিলেন —

মেনে নিলাম সবই হ'ল
কলের জাদুবলে
বলতে পার মানুষ গড়ার
কলটি কোথায় চলে?

ওই বছরেই পাওয়া গিয়েছিল —সৈয়দ মুজতবা আলির কবিতা এবং জসীমউদ্দিনের ছড়া। গিরিবালা দেবী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সমকালীন কবি, প্রথম পর্যায়ের 'সন্দেশ' নিয়ে নিজের বাড়িতে ছোটদের মধ্যে কড়াকড়ি দেখে তিনি এক দীর্ঘ কবিতা লিখেছিলেন। সেটি সংগ্রহ করে এই পর্যায়ের সন্দেশে প্রকাশ করা হয়। সেই দীর্ঘ কবিতার শেষ কটি পংক্তি—

এমনি সন্দেশ মাসে মাসে যদি
এনে দাও তুমি, ভাই,
মা তো পড়ে শোনাবে আমাকে
খাবার সন্দেশ ছাই।

দ্বিতীয় বছরে শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র অলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুর কয়েকটি গল্প লিখেছিলেন। ওই বছর নবীন বাংলার রূপকার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যু হয়, তাঁকে নিয়ে স্মৃতিকথা লেখেন তাঁরই ভ্রাতুষ্পুত্রী রেনু চক্রবর্তী। উত্তর বাংলার চা বাগান ও উপজাতি শ্রমিকদের তথ্যবহুল লেখেন সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার। জোসেফ ও' কেসেলরিং-এর 'কিং-কোব্‌রা' অবলম্বনে বাদল চট্টোপাধ্যায় লেখেন 'নাগরাজ'। তবে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সদাশিব', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভবানন্দের কাশীযাত্রা', শিবরাম চক্রবর্তী, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিদের লেখায় এ বছর সন্দেশের পাক ভালো জমে।

তৃতীয় বছরের গোড়ায় সন্দেশের মালিকানা এল সুকুমার সাহিত্য সমবায়ের হাতে। সমবায় গড়ে ছোটদের পত্রিকা প্রকাশে এদেশে সম্ভবত এই প্রথম প্রয়াস। প্রকাশক হলেন অশোকানন্দ দাশ, সম্পাদক সুভাষ মুখোধ্যায়ের বদলে হলেন লীলা মজুমদার। এ বছরই ছিল প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক উপেন্দ্রকিশোরের জন্মশতবর্ষ। তাঁর লেখা গল্প, কবিতা, ছড়া, প্রবন্ধ, গান ও গানের স্বরলিপি পুনর্মুদ্রিত হয় বৈশাখ সংখ্যাতে। সুবিমল রায়ের দীর্ঘ স্মৃতিমূলক রচনা 'উপেন্দ্রকিশোর রায়ের কথা' ও ছাপা হ'ল এই সংখ্যায়। নলিনী দাশ ছিলেন মেধাবী ছাত্রী ও শিক্ষাবিদ। তিনি তাঁর এক গণ্ডা কিশোরী গোয়েন্দা দলের কীর্তিকাহিনী শুনিয়ে তা যেমন তাদের সঙ্গে আমাদের পরিচিত করিয়েছেন, তেমনই নিজেও লেখিকা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি তাঁদের নিয়ে অনেকগুলি উপন্যাস ও বড় গল্প লিখেছেন। সন্দেশের সম্পাদনার কাজটিও করেছেন দীর্ঘকাল। ওঁর বাসগৃহ (১৭২/৩ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ) সন্দেশ কার্যালয় হওয়ায় সেটা ছিল সবার মিলনস্থল। তাঁর সস্নেহ প্রশ্রয় অনেককে সন্দেশে টেনে এনেছে আমাদের, এবং তাঁর জহুরি চোখ অনেক সুপ্ত প্রতিভাকে উসকে দিয়ে বেশ ক'জন নবীন লেখককে নিয়মিত লিখিয়েছেন যাঁদের ভেতর অনেকে প্রতিষ্ঠাও পেয়েছেন।

তৃতীয় বছরেই শুরু হ'ল ধারাবাহিক উপন্যাস 'গ্রুমালার দেশে'। ওই উপন্যাসটির দু'টি অধ্যায় ১৩৪৭-এর রংমশালে প্রকাশিত হয়েছিল। তখন প্রেমেন্দ্র মিত্র ছিলেন লেখক। এবার সহ-লেখিকা লীলা মজুমদার। উপন্যাসটি সন্দেশে সম্পূর্ণ হয়। কার্লো কল্লোদির বিখ্যাত শিশু উপন্যাস 'অ্যাডভেঞ্চার অফ পিনোচিয়ো'র অনুপ্রেরণায় লেখা প্রিয়ংবদা দেবীর 'পঞ্চুলাল'ও এবছরে প্রকাশিত ধারাবাহিকের অন্যতম।

যাদুকর এ. সি. সরকার ম্যাজিক প্রদর্শনের মতো ছড়া রচনাতেও পারদর্শী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে সুর্মিল বসু অন্যত্র লিখেছিলেন—

ছন্দের যাদুকর সরকার এ. সি.
পরিচয় এর চেয়ে জানি না তো বেশি।

সেই এ.সি. (অতুল চন্দ্র) সরকার সন্দেশের পাতায় অনেক ম্যাজিক কবিতা লিখেছেন। ম্যাজিকও শিখিয়েছেন। বুদ্ধদেব গুহের শিকার কাহিনী, জয়ন্ত ভাদুড়ির রূপকথাও রয়েছে তৃতীয় বছরের ঝুলিতে।

দ্বিতীয় বছরে সত্যজিৎ রায় গল্প লিখেছেন 'অনাথবাবুর ভয়', 'দুই ম্যাজিশিয়ান', 'সদানন্দের খুদে জগৎ', 'সেপ্টোপাসের খিদে'। আর তৃতীয় বছরে তিনি লিখলেন 'বিপিন চৌধুরীর স্মৃতিভ্রম', 'পটলবাবু ফিল্ম স্টার', 'শিবু আর রাক্ষসের গল্প', 'বাদুড় বিভীষিকা', 'প্রোফেসর শঙ্কু ও হাড়'।

চতুর্থ বছরে লীলা মজুমদার রামায়ণের আখ্যান নিয়ে লিখলেন দু'টি নাটক—'লঙ্কাদহন পালা' এবং 'বালী-সুগ্রীব কথন'। এর আগে 'বক বধ পালা' বেরিয়েছে তাঁর। আসলে কিন্তু বড়দা সুকুমার রায়ের 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল'। আগের বছরগুলোর মতো এবারও নলিনী দাশের গোয়েন্দা গণ্ডালু হাজির। এই গণ্ডালুর দলই তাঁকে বাংলা শিশু সাহিত্যের সেরা সম্মান বিদ্যাসাগর পুরস্কারে ভূষিত করেছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে লীলা মজুমদার, সত্যজিৎ রায় ও পরবর্তীকালের দুই সন্দেশী শিশিরকুমার মজুমদার ও অজেয় রায় বিদ্যাসাগর পুরস্কার লাভ করেছেন।

চতুর্থ বছরেই শুরু হয়েছিল প্রভাতরঞ্জন রায়ের ধারাবাহিক উপন্যাস 'অন্য গ্রহে আমি'। পুণ্যলতা চক্রবর্তী লেখেন 'রাজবাড়ি'। শিবরাম চক্রবর্তীর গল্প 'প্রথম পুরস্কার' ও 'মেলায় গেলেন হর্ষবর্ধন' প্রকাশিত হয়। ধারাবাহিক ভাবে বেরুতে শুরু করে কুলদারঞ্জন রায় অনূদিত। জুল ভার্নের 'মিস্টিরিয়াস আইল্যান্ড'। লুইস্ ক্যারলের 'White Kinght's Song-এর ভাবান্তর করেন সত্যজিৎ রায়—'আদ্যিবুড়োর পদ্যি'। তাছাড়া 'প্রোফেসর শঙ্কু ও ম্যাকাও', 'প্রোফেসর শঙ্কু ও আশ্চর্য পুতুল', 'ঈজিজিও রহস্য'। আর পরের বছর আত্মপ্রকাশ করে ফেলুদা। ১৩৭২-এর অগ্রহায়ণ-মাঘ পর পর তিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয় ফেলুদার প্রথম কীর্তি—'ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি'। পরের বছর শুরু হয়ে যায় ধারাবাহিক ফেলুদার কাহিনী 'বাদশাহী আংটি', বলা যেতে পারে প্রথম আবির্ভাবেই কিস্তিমাৎ। বাংলা সাহিত্যে জনপ্রিয়তম গোয়েন্দাদের নাম জানতে চাইলে সকলে এক বাক্যে বলবে ফেলুদা। প্রদোষচন্দ্র মিত্র। এবং প্রদোষচন্দ্রের কাণ্ডকারখানার অধিকাংশই প্রকাশিত হয়েছে 'সন্দেশ'-এর পাতায়।

সন্দেশের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক উপেন্দ্রকিশোর সারা জীবন নানা পত্রিকায় লিখে পঞ্চাশ বছরে পৌঁছে সন্দেশ পত্রিকা শুরু করেন। আরেক সম্পাদক সুকুমার রায় লেখা শুরু করেছেন অন্য কাগজে, সম্পাদনার দায়িত্ব পাবার আগে সন্দেশে অনেক লিখেছেন এবং ছবি এঁকেছেন। আর সম্পাদক হবার পরে কত ধরনের লেখা যে লিখেছেন তা গবেষণা করে বের করতে হয়। কিন্তু চল্লিশ বছর বয়সে 'সন্দেশ' সম্পাদনার ভার নিয়ে লেখক হলেন সত্যজিৎ। তাঁর স্পষ্ট স্বীকারোক্তি, 'আমি কোনও দিন লেখক হ'ব, মাথাতেই আসেনি।' তবু সন্দেশের জন্যে লেখা শুরু করে 'there was no stopping'। প্রায় একত্রিশ বছরের লেখক জীবনের নানাবিধ ফসল প্রধানত সন্দেশের গোলাতেই উঠেছে। শঙ্কু কাহিনী, ফেলুদা পর্ব ছাড়াও তারিণীখুড়োর গপ্পো, 'একেই বলে শুটিং' পর্বের প্রবন্ধও সন্দেশের পাতাতেই বেরিয়েছিল।

সন্দেশের পূর্বসূরী দু' সম্পাদকের মতো তিনিও 'সন্দেশ'-এর অলঙ্করণে প্রধান ভূমিকা পালন করেছেন। অবশ্য একটানা একত্রিশ বছর 'সন্দেশ' সম্পাদনা করার সুযোগ তিনি পেয়েছেন—কিন্তু তিনি ছিলেন আন্তর্জাতিক মানের চলচ্চিত্রকার। তাঁর স্তরের একজন ব্যস্ত মানুষের পক্ষে সন্দেশের মতো অব্যবসায়িক পত্রিকার খুঁটিনাটি বিষয়ে জড়িত হওয়া, একান্ত ভালোবাসার পরিচয়। চূড়ান্ত পর্বে নির্বাচনের জন্য প্রতিটি লেখা তিনি পড়তেন, মনোনীত করতেন, সংশোধন বা পরিবর্তনের সম্পাদকীয় নির্দেশ দিতেন। কত তরুণ সদ্য-লেখকের গল্প কবিতায় যে ছবি এঁকে লেখককে উদ্দীপিত করেছেন তার হিসেব দেওয়া যায় না।

ষষ্ঠ বছরের মধ্যে সন্দেশের আসরে তরুণ সাহিত্যিকদের ভিড়। বয়স্কদের সঙ্গে তারাও আছে। স্বপনবুড়ো লিখেছেন দু'টি গল্প, 'মানতি মাসীর মোড়লি' আর 'শশীশেখরের শিক্ষানবিশি', মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় চমৎকার রূপকথা লিখেছেন—'গোলাপ-কুমারী'। রম্যানি বীক্ষ্য-খ্যাত লেখক সুবোধ কুমার চক্রবর্তীর লেখা 'আমাদের দেশ', এই পর্বে মহীশূর। উপেন্দ্রকিশোরের ভ্রাতুষ্পুত্র হিতেন্দ্রকিশোর লিখেছেন 'গিরিডির স্মৃতিকথা'।

দশম বর্ষে 'সন্দেশ' দ্বিমাসিক পত্রে রূপান্তরিত। বৈশাখ -জ্যৈষ্ঠ-এর বদলে গ্রীষ্ম সংখ্য, বর্ষা সংখ্যা ইত্যাদি ছ'টি করে সংখ্যা বছরে বের করবার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। আকারেও বড় (২৮×২০ সেমি.)। সম্পাদকেরা জানালেন—'আমাদের বড় ইচ্ছা তোমাদের হাতে এমন একটা প্রথম শ্রেণীর কাগজ তুলে দেব, যার জুড়ি বাংলা ভাষায় খুঁজে পাওয়া শক্ত। কিন্তু প্রতি সংখ্যা তেমন ভালো করে করতে হলে আমাদের হাতেও একটু সময় থাকা চাই তো।'

আরও লেখা হ'ল— 'জানো তো, পত্রিকাকে ইংরাজিতে ম্যাগাজিন বলে, অথচ কথাটা কিসের থেকে এসেছে তা জান কি? যেখানে গোলা-বারুদ জমা রাখা হয় তাকে ম্যাগাজিন বলে। আবার যে সব দোকানে খাবার-দাবার ও দরকারি জিনিস পাওয়া যায় ফ্রান্সে ও অন্যান্য দেশে তাকেও ম্যাগাজিন বলা হয়। আমাদের এই ম্যাগাজিনেও যে বারুদের শক্তি আর দোকানের ভাণ্ডার থাকবে তাতে আর আশ্চর্য কি?'

প্রথম সম্পাদকীয় যা এই প্রতিবেদনের শুরুতে উল্লেখ করা

হয়েছে সেখানে প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদকও এ অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করেছিলেন।

অবশ্য তিন বছরের শেষে ত্রয়োদশ বর্ষে 'সন্দেশ' ফের মাসিক পত্রিকা হিসাবে ফিরে আসে এবং আগের চেহারায়। এ প্রসঙ্গে ১২শ বর্ষের শীত সংখ্যায় চিঠিপত্রের কলমে জানানো হয় একটা নতুন খবর —'যে তোমাদের অধিকাংশেরই যখন ইচ্ছা ও অনুরোধ, ১৩৮০ (ত্রয়োদশ বর্ষ) থেকে আবার আমাদের প্রিয় পত্রিকা আগেকার ছোট আকার নিয়ে মাসে মাসে বেরুবে।'

দশম বছরে শারদীয়া সংখ্যায় অজেয় রায়ের প্রথম উপন্যাস 'মুন্সু' প্রকাশিত হয়। আরেক সন্দেশী শিশিরকুমার মজুমদারের উপন্যাস 'আকাশে আগুন পাতালে আগুন' শীত ও বসন্ত সংখ্যায় বেরোয়। সন্দেশে লেখা শুরু করে এঁরা প্রতিষ্ঠা পান। আগেই বলেছি শিশু সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য এঁদের বিদ্যাসাগর পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। এ বছরেই সত্যজিৎ রায় এডোয়ার্ড লিয়রের অনুবাদ 'লিপলি বিলের ধারে সাতটি পরিবারের ইতিকথা' প্রকাশ করেন, সঙ্গে ছাপা হয় লিয়রের আঁকা ছবি।

লিখছেন বাণী রায়, মহাশ্বেতা দেবী, শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ ইত্যাদি। পুণ্যলতা চক্রবর্তী ছোটদের ছোট গল্প তখনও শোনাচ্ছেন। শিশিরকুমার মজুমদারের উপন্যাস 'নাখনাটিয়ার রহস্য', অজেয় রায়ের 'কেরোমন' বেরিয়ে গেছে। বিজ্ঞানের ছাত্র অমিতানন্দ দাশ ইটিংকার গল্প লিখলেন।

১৩৮২ থেকে লীলা মজুমদার, সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে নলিনী দাশও সম্পাদক হলেন। আমৃত্যু ১৩৯৯-এর চৈত্র পর্যন্ত তিনি সম্পাদক ছিলেন। ১৩৯৯-এর বৈশাখে সত্যজিতের জীবনাবসান হলে। ১৪০০ সালের বৈশাখ থেকে প্রাক্-শারদীয়া সংখ্যা পর্যন্ত লীলা মজুমদার একাই ওই দায়িত্বভার বহন করেছেন। ওই বছর শারদীয়া সংখ্যা থেকে বিজয়া রায়, ও দৈনন্দিন কাজে সন্দীপ রায়, তাঁর সঙ্গী হন। এ পর্যন্ত সেই ব্যবস্থাই চলছে।

ছোটদের পত্রিকার একটি বড় আকর্ষণ খেলার জগৎ। সে জগতের খবর বহুকাল যোগান দিয়েছিলেন অজয় হোম। তিনি অবশ্য গল্পও লিখেছেন বেশ কিছু। এ বিভাগে আরও যাঁরা লিখেছেন তাঁরা হলেন শচীন কুণ্ডু, শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, সুজয় সোম, বল বয়।

জীবন সর্দার সন্দেশের পাতায় প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর খুলেছেন দ্বিতীয় বছরের পুজো সংখ্যা থেকে। এমন বিভাগ বাংলার ছোটদের কোনও পত্রিকায় নেই। এ দপ্তরের পোড়োদের নিয়ে মাঝে মাঝে প্রকৃতি পাঠের যে অভিযান হয় তারও কোনও জুড়ি নেই। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে জীবন সর্দার একাই এ বিভাগের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন।

সন্দেশে তরুণের দল ভিড় করে এলেন— যে দলে ছিলেন, কার্তিক ঘোষ, ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়, সুধীন্দ্র সরকার, ভবানীপ্রসাদ দে, প্রণব মুখোপাধ্যায়, শৈবাল চক্রবর্তী, ভবানীপ্রসাদ মজুমদার, আদিনাথ নাগ, অরুণিমা রায়চৌধুরী, সিদ্ধার্থ ঘোষ, ইন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায়, সলিল চট্টোপাধ্যায়, রাহুল মজুমদার, শৈলেন কুমার দত্ত, শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য, ইত্যাদি।

আশাপূর্ণা দেবী মীরা বালসুব্রমনিয়াম, শৈল চক্রবর্তী, ধীরেন্দ্র-লাল ধর, ছাড়াও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, নবনীতা দেবসেন সন্দেশে অনেক লিখেছেন। যেমন লিখেছেন অন্নদাশঙ্কর রায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সর্বক্ষণ রায়, প্রদীপকুমার রায় ইত্যাদি।

এক বা একাধিক উপন্যাস লিখেছেন সন্দেশের পাতায়, সত্যজিৎ রায়, লীলা মজুমদার, নলিনী দাশ, শিশিরকুমার মজুমদার, মহাশ্বেতা দেবী, অজেয় রায়, প্রবাসজীবন চৌধুরী, মঞ্জিল সেন, জীবনকৃষ্ণ দাশ, অনিল মিত্র, সঙ্কর্ষণ রায়, নিরঞ্জন সিংহ, প্রণব মুখোপাধ্যায়, দীপেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, রেবন্ত গোস্বামী, পরেশ দত্ত, রাধারমন রায়, শচীন্দ্রনাথ বসু, সলিল চট্টোপাধ্যায়, রাহুল মজুমদার, শৈবাল চক্রবর্তী, সায়নদেব মুখোপাধ্যায়, দেবাশিস সেন।

১৩৯৫ ছিল উপেন্দ্রকিশোরের জন্মের ১২৫ বছর। এই বৈশাখে প্রথম বছরের প্রথম কবিতাটি উপেন্দ্রকিশোরের লেখা — 'সন্দেশ'-এর কথা ছাড়াও পুণ্যলতা চক্রবর্তীর 'বাবার কথা', কল্যাণী কার্লেকারের 'আমার দাদামশাই', নলিনী দাশের 'সন্দেশ সম্পাদক উপেন্দ্রকিশোর' এবং সত্যজিৎ রায়ের 'উপেন্দ্রকিশোরের সন্দেশ' প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া সারা বছর ধরে ওঁর নানা লেখা পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

প্রতি বছরে শারদীয়া সংখ্যা ছাড়াও কয়েকটি বিশেষ সংখ্যা বেরিয়েছে সন্দেশে। সুকুমার রায়ের জন্মশতবর্ষ বিশেষ সংখ্যা ১৩৯৪ বৈশাখে পুণ্যলতা চক্রবর্তীর 'দাদার ছেলেবেলা', কল্যাণী কার্লেকারের 'সুকুমার রায়', নলিনী দাশের 'সন্দেশ সম্পাদক সুকুমার রায়' ও সত্যজিৎ রায়ের 'বাবার খেরোর খাতা' ছাপা হয়।

সন্দেশের আরেক সম্পাদক সুবিনয় রায়ের জন্ম শতবর্ষ ছিল ১৩৯৮-এ। এ বছর অগ্রহায়ণ সংখ্যায় লীলা মজুমদার লেখেন 'মণিদা', কল্যাণী কার্লেকারের 'রচনার নাম সুবিনয় রায়', আর সত্যজিৎ রায়ের লেখা 'কাকামণি'।

সত্যজিৎ রায়ের প্রয়াণের পরে শ্রাবণ ১৩৯৯-এ প্রকাশিত হয় 'সত্যজিৎ স্মরণ সংখ্যা'। ওই বছর কার্তিকে প্রকাশিত হয় 'প্রথম সত্যজিৎ' সংখ্যা। এই অভিনব পরিকল্পনায় সন্দেশে প্রকাশিত বিশেষ বিশেষ বিষয়ের প্রথম রচনাটি এই সংখ্যায় স্থান পেয়েছে।

১৪০৩-এর বৈশাখে সন্দেশে আরেকটি সত্যজিৎ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। লিখেছিলেন অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত, নীরেন্দ্রনাথ

চক্রবর্তী, অজয় চক্রবর্তী ইত্যাদি। এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ ছিল সত্যজিৎ-কৃত পোস্টমাস্টার গল্পের সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য।

১৪০২ সালের অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ—তিন মাসে প্রকাশিত হয় তিনটি 'ফেলুদা-৩০' বিশেষ সংখ্যা; সত্যজিতের গোয়েন্দা ফেলুদা আবির্ভাবের ত্রিশ বছর উপলক্ষে এর প্রথম সংখ্যাটি ফেলুদাপ্রেমীদের মধ্যে প্রচণ্ড সাড়া জাগায়।

'সন্দেশ'-এর সম্পাদক নলিনী দাশ এবং সন্দেশের বন্ধু শিশির-কুমার মজুমদারের জীবনাবসান ঘটে অল্প সময়ের ব্যবধানে। এঁদের স্মৃতির উদ্দেশে একটি বিশেষ স্মরণ সংখ্যা হিসাবে 'সন্দেশ' ১৪০০ সালের শ্রাবণ সংখ্যাটি উৎসর্গিত হয়। এই স্মরণ সংখ্যায় সন্দেশীদের আবেগের নির্ভেজাল প্রকাশ ঘটেছিল সব ক'টি লেখায়, স্মৃতিকথায়। নব পর্যায়ের সন্দেশের অন্যতম কর্ণধার বাংলা শিশু সহিত্যের প্রধান রূপকার শ্রীমতী লীলা মজুমদার নব্বই বছরে পৌঁছলে ১৪০৫-এর বৈশাখ সংখ্যাটি 'লীলা মজুমদার ৯০' হিসাবে প্রকাশিত হয়। এ সংখ্যায় লেখক তালিকায় ছিলেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, হাসি ঘোষ, প্রসাদরঞ্জন রায়, অনিতা অগ্নিহোত্রী, গৌরী ধর্মপাল, সুপ্রিয় ঠাকুর, সলিল চট্টোপাধ্যায়, প্রণব মুখোপাধ্যায়, অজেয় রায় প্রভৃতি।

১৪০৫-এর কার্তিক-এ আরেকটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সুকুমার রায়ের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'আবোল তাবোল'-এর ৭৫ বছর পূর্তিকে উপলক্ষ্য করে এই সংখ্যার প্রকাশ। এই সংখ্যাতে লিখেছেন নবনীতা দেব সেন, সিদ্ধার্থ ঘোষ, ভবানীপ্রসাদ মজুমদার, রেবন্ত গোস্বামী, প্রণব মুখোপাধ্যায়। সত্যজিৎ রায়ের ডকুমেন্টরি ছবি, 'সুকুমার রায়'-এর চিত্রনাট্য এই সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল।

সন্দেশে বেশ কয়েকটা পুনর্মুদ্রণ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে ১৪০০, ১৪০১ সালের পৌষ-মাঘ ও ১৪০৩-এর মাঘ উল্লেখযোগ্য। এখানে পূর্ববর্তী পর্যায়ের অনেক লেখাও পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল।

বিশেষ গল্প সংখ্যা বেরিয়েছে এ বছরই (১৪০৭) অগ্রহায়ণ-পৌষ-এ। এর আগে ১৪০৪-এও একটি বেরিয়েছিল, তাতে 'শেয়াল দেবতা রহস্য'-এর চিত্রনাট্য ছাপা হয়েছিল। বিশেষ ধরনের গল্প নিয়ে কয়েকটি সংখ্যা বেরিয়েছে। যেমন ১৪০৬-এর বৈশাখ হাসির গল্প নিয়ে, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ে ভূতের গল্প নিয়ে। পৌষে গোয়েন্দা গল্প নিয়ে। প্রধানত খ্যাতনামা গল্পকারেরাই এই বিশেষ সংখ্যার লেখক-তালিকাভুক্ত ছিলেন। গোয়েন্দা সংখ্যায় আব্রাহাম লিঙ্কনের একটি রচনার অনুবাদও ছাপা হয়েছিল।

ক্রিকেট বিশেষ সংখ্যা হিসাবে বেরিয়েছে ১৪০৫-এর মাঘে। এ সংখ্যায় উপেন্দ্রকিশোরের লেখা রণজিৎ সিংহজীর পরিচয় আছে, তেমনই পঙ্কজ রায়, সম্বরণ ব্যানার্জীর সাক্ষাৎকারও আছে। আছে অজয় বসু, প্রসাদরঞ্জন রায়, সিদ্ধার্থ ঘোষের লেখা।

খেলা নিয়ে বেরুল ১৪০৭-এর জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় সংখ্যা।

এ পর্যায়ের 'সন্দেশ' যখন বেরুতে শুরু করে তখন বাংলায় অনেকগুলি ছোটদের কাগজ চলছিল, তার মধ্যে অন্যতম সুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'মৌচাক'। সুকুমার রায় সম্পাদিত 'সন্দেশ' বেরুবার সময়েই 'মৌচাক' প্রথম প্রকাশিত হয় (১৩২৭ সালে)। মৌচাক ছাড়াও ছিল আশুতোষ লাইব্রেরির 'শিশুসাথী'। 'রামধনু', 'শুকতারা', 'আগামী', 'রোশনাই'। এর মধ্যে অধিকাংশ কাগজই এখন টিকে নেই। তার মাঝে 'সন্দেশ' সেই পুরানো আদর্শবোধ বজায় রেখে তার আস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। পূর্ববর্তী দু'পর্যায়ের 'সন্দেশ' জীবনকালে যা ছিল তার যোগফলের অনেক বেশি তৃতীয় পর্যায়ের জীবন; যা অচিরে এই দুই পর্যায়ের গুণফলকে অতিক্রম করে যাবে।

আনন্দের কথা 'সন্দেশ' দীর্ঘ জীবনেও তার আদর্শে দৃঢ় থেকে একদিকে যেমন তাকে প্রসারিত করেছে, নবীনদের মধ্যে তার ভাবনাকে সঞ্চারিত করেছে অন্যদিকে নান্দনিক রুচিকে উন্নত করেছে। প্রকৃত অর্থে সন্দেশের বেঁচে থাকা একটা সদর্থক কল্পনারই বাস্তবায়ন। তাই 'সন্দেশ' বেঁচে থাক, 'সন্দেশ' দীর্ঘজীবী হোক।

বিদায় স্যার ডন

প্রসাদরঞ্জন রায়

জন্ম : ২৭শে আগস্ট, ১৯০৮, কুটামুন্ড্রু
মৃত্যু: ২৫শে ফেব্রুয়ারি, ২০০১, এডিলেড

অবশেষে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন স্যার ডোনাল্ড জর্জ ব্র্যাডম্যান। এর আগে অনেকবার গুজব ছড়িয়েছিল তাঁর প্রয়াণের —এবার তা সত্য প্রমাণিত হ'ল। সারা ক্রিকেট দুনিয়ায় নেমে এল এক অপরিসীম শূন্যতা। ক্রিকেট-প্রেমীদের কাছে তিনি ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান। তীক্ষ্ণধী, উচ্চাকাঙ্খী এবং নির্দয় ক্রিকেট ক্যাপ্টেন আর একজন দক্ষ ক্রিকেট প্রশাসক ও সমালোচক। তিনি কত বড় ক্রিকেটার ছিলেন তা আজ খুব স্পষ্ট নয় আমাদের কাছে, কিন্তু রেকর্ড বইতে অন্যান্য সেরা ব্যাটসম্যানদের তিনি অনেক পিছনে ফেলে দিয়েছেন। তাঁকে নিয়ে ৬০টা বই লেখা হয়েছে—যত আলোচনা হয়েছে তার সিকি ভাগও হয়নি আর কোনও ক্রিকেটারকে নিয়ে। নিঃসন্দেহে তিনি বিশ্বে সর্বাধিক পরিচিত ক্রিকেটার, সর্বাধিক পরিচিত অস্ট্রেলিয়ানও বটে—'ডন ব্র্যাডম্যান, অস্ট্রেলিয়া'— লিখলেই চিঠি তাঁর কাছে পৌছে যেত। অথচ তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সব সময় ছিল পাদপ্রদীপের আলোর বাইরে।

গ্রামের ছেলে ব্র্যাডম্যান আড়াই বছর বয়সে কুটামুন্ড্রা গ্রাম ছেড়ে সিডনির কাছে বাউরাল গ্রামে আসেন। এখানেই তাঁর ক্রিকেটে হাতেখড়ি। এক সময়ে 'বাউরাল বয়' নামে পরিচিত ছিলেন তিনি। আজ এই গ্রামের ক্রিকেট মাঠটি 'ব্র্যাডম্যান ওভাল' নামে পরিচিত। আর তার পাশেই গড়ে উঠেছে 'স্যার ডন ব্র্যাডম্যান ক্রিকেট মিউজিয়াম'। খেলার সঙ্গী ছিল না, তাই দিনের পর দিন বাড়ির পিছনে একটা দেয়ালে গল্‌ফ্ বল ছুঁড়ে সেটাকে খেলতেন একটা স্ট্যাম্প দিয়ে। প্রতিদিনের এই নিরলস প্রচেষ্টায় তাঁর রিফ্লেক্স দ্রুত হয়েছিল, চোখ আর হাতের সমঝোতা গড়ে উঠেছিল।

বাউরাল গ্রামে ব্র্যাডম্যান ১০ বছর বয়সে প্রথম ক্রিকেট ম্যাচ খেললেন, ১১ বছর বয়সে স্কুল ম্যাচে সেঞ্চুরি করেন, ১৩ বছর

বয়সে বাউরাল ক্লাবের হয়ে খেলতে আরম্ভ করেন, ১৬ বছর বয়সে ৩০০ রান করেন একটা ম্যাচে। ১২বছর বয়সে বাবার সঙ্গে সিডনিতে টেস্ট খেলা দেখতে যান—মাঠটা দেখেই বাবাকে বলেন, 'এখানে ক্রিকেট না খেললে জীবনই বৃথা।' বাবার মুখে তখন প্রশ্রয়ের হাসি। জীবনের দ্বিতীয় টেস্ট খেলা দেখেন নিজে খেলতে গিয়ে। ১৮ বছর বয়েস সিডনিতে গ্রেড ক্রিকেট খেলতে আরম্ভ করেন—তখন খেলার দিনে ভোর পাঁচটায় বেরিয়ে বাড়ি ফিরতেন রাত বারোটায়। পরের বছর থেকে সিডনিতে চাকরি আর থাকার বন্দোবস্ত হয়। তখন থেকে সিডনিতেই থেকেছেন, ১৯৩৫ সালে চাকরির সুবাদে এডিলেড যাবার আগে পর্যন্ত।

১৯২৭-২৮ মরশুমে ব্র্যাডম্যান নিউ সাউথ ওয়েলস্ দলের হয়ে শেফিল্ড শীল্ড খেলতে নামেন—প্রথম আবির্ভাবেই সেঞ্চুরি। সে বছরে শেষ ম্যাচেও সেঞ্চুরি। সেই তাঁর জয়যাত্রা শুরু। ১৯২৮-২৯ সালে সফরকারী এম.সি.সি দলের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচেই করেন ৮৭ ও ১৩২*। সেই সুবাদে প্রথম টেস্টে সুযোগ পেয়ে এবারে রান পেলেন ১৮ ও ১। দ্বিতীয় টেস্টেই দল থেকে বাদ, জীবনের প্রথম ও শেষবার দ্বাদশ ব্যক্তির দায়িত্ব পালন করলেন। তৃতীয় টেস্টে দলে ফিরেই ৭৯ ও ১১২। আবার শেষ টেস্টে সেঞ্চুরি। ভালো খেলেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তার থেকে বেশি সাড়া ফেলেছিলেন তরুণ ব্যাটসম্যান আর্চি জ্যাকসন, যিনি অল্প বয়সে মারা যান। অস্ট্রেলিয়া সিরিজটা ৪-১ ম্যাচে হেরেছিল—ব্র্যাডম্যানের মনে তা দারুণ রেখাপাত করেছিল।

১৯২৮-২৯ মরশুমে ডন ১৬৯০ রান করলেন—এটা একটা অস্ট্রেলীয় রেকর্ড। পরের বছর ২১ বছর বয়সী ডন মরশুম শুরু করেন ১৫৭, ১২৪ আর ২২৫ দিয়ে। কুইন্সল্যান্ডের সঙ্গে ফিরতি ম্যাচে করলেন ৪৫২*, তৎকালীন বিশ্বরেকর্ড। সামনে ১৯৩০ সালের ইংল্যান্ড সফর। ১৯২৮-২৯ মরশুমের শেষে ইংল্যান্ড ও পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সুইং বোলার 'মরিস' টেট তাঁর খেলার কিছু টেকনিক্যাল ত্রুটি সংশোধন করতে বলেছিলেন—বলেন তা নইলে ইংল্যান্ডে রান পাবে না। ডন শুনলেন মনোযোগের সঙ্গে, কিন্তু নিজের খেলার পদ্ধতি পরিবর্তন করলেন না। পরে টেট বলেছিলেন, উপদেশটা ছিল নির্বুদ্ধিতার নামান্তর।

ইংল্যান্ড সফরে ব্র্যাডম্যান কি করলেন? তাঁর উত্তর : টেস্ট ইনিংসে রান ৮ ও ১১৩, ২৫৪ ও ১, ৩১৪, ১৪, ২৩২; সিরিজে মোট ৯৭৪ রান (গড় ১৩৯.১৪), লীডস টেস্টে একদিনে ৩০৯ রান, সমগ্র ট্যুরে ২৯৬০ রান (গড় ৯৮.৬৬), ১০টা সেঞ্চুরি। অস্ট্রেলিয়া সিরিজটা জেতে ২-১ ম্যাচে—ব্র্যাডম্যানের বিধ্বংসী ব্যাটিংই জয় এনে দেয়, কারণ ক্ল্যারি গ্রিমেট ছাড়া কোনও বিশ্ব-মানের বোলারই অস্ট্রেলিয়ার ছিল না। রাতারাতি ২১ বছর বয়সী ব্র্যাডম্যান প্রবাদ-পুরুষ হয়ে উঠলেন— খবর কাগজের হেডলাইন বেরোল, 'ব্র্যাডম্যান বনাম ইংল্যান্ড'। সেই যে খ্যাতি তাঁর পিছনে তাড়া করল, তা শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর পিছন ছাড়েনি।

ইংল্যান্ডের পরিবেশে ব্র্যাডম্যানের খেলার খুঁত? খুঁত নিশ্চয়ই ছিল কিছু, চার-চার বার ইংল্যান্ড সফরে ব্র্যাডম্যান রান করেছেন : ২৯৬০, ২০২০, ২৪২৯ আর ২৪২৮। ৪১ টা সেঞ্চুরি। মে মাসের মধ্যে ১০০০ রান করেছেন, ১৯৩০ আর ১৯৩৮ সালে। টেস্ট ম্যাচে ১৯৩০ সিরিজের পরও ১৯৩৪ সিরিজে করেছেন ৩০৪ ও ২৪৪, ১৯৪৮ সিরিজে আরও দুটো। শুধু শেষ ইনিংসে এরিক হলিস-এর গুগলি বলে শূন্য রানে বোল্ড হ'ন। চোখ জলে ভরা থাকলে গুগলি খেলা সহজ নয়। লীডস ছিল তাঁর সেরা টেস্ট ম্যাচ মাঠ। এখানে ডনের রান—৩৩৪, (১৯৩০), ৩০৪ (১৯৩৪),১০৩ আর ১৬, (১৯৩৮), আর ৩৩ ও ১৭৩* (১৯৪৮)। আর কিছুটা অদ্ভুত সাফল্যের কাহিনী উরস্টারশায়ার দলের বিরুদ্ধে। ট্র্যাডিশন অনুসারে ইংল্যান্ড সফরে অস্ট্রেলিয়া খেলা শুরু করে উরস্টারে—সেই প্রথম

ম্যাচে তাঁর রান ২৩৬, ২০৬, ২৫৮ আর ১০৭।

অবশ্যই ব্র্যাডম্যান দেশ ও বিদেশে তাঁর সেরাটা খেলাটা রেখে দিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে—৫০২৮ রান, গড় ৮৯.৭৮, সেঞ্চুরি ১৯। ইংল্যান্ড ছাড়া আর কোনও দেশে টেস্ট সফরে যাননি—ওয়েস্ট ইন্ডিজ, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতের সঙ্গে খেলেছেন একটি করে টেস্ট সিরিজ মাত্র। ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে বৃষ্টিভেজা উইকেটে করেন ২২৩ ও ১৫২, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে চার টেস্টে চারটি সেঞ্চুরি— শেষ টেস্টে ২৯৯*, ৩০০-তম রানটি নিতে গিয়ে তাঁর পার্টনার রান আউট হয়। ভারতের বিরুদ্ধে চারটি সেঞ্চুরি, অমরনাথের বলে জীবনে প্রথম ও শেষ বার হিট উইকেট হন।

ব্র্যাডম্যান কি শুধুই রেকর্ড গড়ার কারিগর? রেকর্ড-বইতে তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য ও তাঁর সঙ্গে পরবর্তীদের পার্থক্য দেখলে তাই মনে হবার কথা। কালক্রমে তাঁর রানের রেকর্ডই আজ টিকে নেই তবে রেকর্ড বইতে তাঁর আজও উজ্জ্বল উপস্থিতি।

ডন ব্র্যাডম্যানের বিশ্ব রেকর্ড

টেস্ট ম্যাচে

* সর্বাধিক গড় রান ৯৯.৯৪ (তাঁর পরেই গ্রেম পোলক, হেডলি ও সাটক্লিফ ৬০);
* টেস্ট ম্যাচে ১২ টা ডাবল সেঞ্চুরি ও দু'টি ট্রিপল্ সেঞ্চুরি;
* এক টেস্ট সিরিজে সর্বাধিক ৯৭৪ রান (১৯৩০);
* এক দিনের সর্বাধিক ৩০৯ রান, লীডস (১৯৩০);
* টেস্টে দ্রুততম ১০০০, ২০০০, ৩০০০, ৪০০০, ৫০০০ ও ৬০০০;
* পর পর ৬ টি টেস্ট সেঞ্চুরি;
* দু'টি পজিশনে সর্বাধিক রান: ৫ নং স্থানে ৩০৪, ৭ নং স্থানে ২৭০;
* দুটি উইকেটে রেকর্ড পার্টনারশিপ: ৫ম উইকেটে ৪০৫ (বার্নসের সঙ্গে), ৬ষ্ঠ উইকেটে ৩৪৬ (ফিঙ্গলটনের সঙ্গে);
* এক দেশের বিরুদ্ধে সর্বাধিক ৫০২৮ রান, ১৯ টা সেঞ্চুরি (বনাম ইংল্যান্ড)।

প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে

* সর্বাধিক গড় রান ৯৫.১৪ (তাঁর পরেই বিজয় মার্চেন্ট ৭২);
* প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে ৩৭ টা ডাবল সেঞ্চুরি ও ছ'টি ট্রিপল্ সেঞ্চুরি;
* পর পর ৬ টি ইনিংসে সেঞ্চুরি;
* সফরকারী দলের হয়ে ইংল্যান্ডে সর্বাধিক ২৯৬০ রান (১৯৩০) ও সর্বাধিক ১৩ টা সেঞ্চুরি (১৯৩৮);
* অস্ট্রেলিয়াতে এক মরশুমে সর্বাধিক ১৬৯০ রান (১৯২৮-২৯) ও সর্বাধিক ৮ টা সেঞ্চুরি (১৯৪৭-৪৮);
* ৫ম উইকেটে (রেকর্ড পার্টনারশিপ) ৪০৫;
* দু-'দুবার মে মাসের মধ্যে: ১০০০ রান;
* মাত্র ২৯৫ ইনিংসে ১০০ টা সেঞ্চুরি;

শুধুমাত্র ডনকে আটকাতেই বডিলাইন বোলিং উদ্ভাবন করেন জার্ডিন। লেগস্ট্যাম্পের উপর গা লক্ষ্য করে জোরে বল করা এই বডিলাইনের প্রয়োগ ছিল নির্মম—উডফুল, ফিঙ্গলটন, ওল্ডফিল্ড আহত হ'ন। ব্র্যাডম্যানও বাঁধা পড়েছিলেন মাঝারিয়ানার মধ্যে — চারটে টেস্টে ৩৯৬, রান একটা মাত্র সেঞ্চুরি, গড় ৫৬। লারউডের বলে চারবার আউট হলেও তিনি ছিলেন দলের সফলতম ব্যাটস্‌ম্যান। অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ডের ক্রিকেট-সম্পর্ক ভাঙার মুখে দাঁড়িয়েছিল, শেষ পর্যন্ত জার্ডিনকেই কিছুটা দুর্নামের ভাগী হয়ে বিদায় নিতে হয়। আর ব্র্যাডম্যান? তিনি জার্ডিন বা লারউডের সঙ্গে আর জীবনে কখনও কথা বলেননি।

ব্র্যাডম্যানকে বলা হয়েছে নির্মম অধিনায়ক। ওঁর নিজের প্রথম ক্যাপটেন উডফুলও তাই লিখেছেন। উডফুল অবশ্যই ছিলেন ভালো-মানুষ—বডিলাইন সিরিজে মারও খেয়েছেন, সিরিজও হেরেছেন ৪-১, যেমন ১৯২৮-২৯ মরশুমে হেরেছিলেন। ক্যাপ্টেন ব্র্যাডম্যান সহজে হারতে চাননি, হারেনওনি কোনও সিরিজে। ২৪টি টেস্টে জিতেছেন ১৫টি (হেরেছেন মাত্র তিনটিতে)। তাঁর অধিনায়কত্বের প্রথম দিকটায় কোনও ভালো ফাস্ট বোলারই ছিল না তাঁদের। শেষ দু'টি সিরিজে মিলার-লিন্ডওয়ালকে পেয়ে যদি তাঁদের একটু বেশি প্রয়োগ করে থাকেন তাঁকে কি সে জন্য দোষ দেওয়া যায়? বডিলাইনের অভিজ্ঞতা তো তাঁর ছিলই। ১৯৩৬-৩৭ সিরিজে অধিনায়ক হয়েই প্রথম দুটো টেস্ট হারেন, শতরানও পাননি। তৃতীয় টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে করলেন ২৭০, পরের দু'টি টেস্টে ২১২

ও ১৬৯, সিরিজ জিতলেন ৩-২। মহাযুদ্ধের পরে ১৯৪৬-৪৭ সিরিজে হ্যামন্ডের ইংল্যান্ড দলের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন ব্র্যাডম্যান—প্রথম টেস্টে ২৮ রানের মাথায় ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়েরা নিশ্চিত যে ডন আইকিনের হাতে ধরা পড়েছেন। ডন নড়েননি, আম্পায়ার আউট দেননি—ডন থামলেন ১৮৭ তে। পরের টেস্টেই ২৩৪। অস্ট্রেলিয়ার বিজয়-রথ আর থামল না। এই ব্যবহারে আজকের দিনে কেউ বিস্মিত হন কি? বিরোধী ক্যাপ্টেন হ্যামন্ড কড়াভাবে তাঁর সমালোচনা করেছেন বটে, বেডসার-প্রমুখ বিরোধী বোলারের মতে ব্রাডম্যান সত্যিকারের ভদ্রলোক—মাঠের ভিতরে ও বাইরে। মাঠে গালাগালি বা 'স্লেজিং' তিনি কখনও করেননি, বরদাস্তও করেননি।

তবে ব্র্যাডম্যান তো যন্ত্র ছিলেন না, মানুষই ছিলেন। লেগ স্পিন-গুগলি বল বুঝতে তাঁর অসুবিধা হ'ত—তবু পারতপক্ষে গুগলিতে আউট হননি। 'লেগ থিওরি' অবলম্বনে জোরের বল তিনি পছন্দ করতেন না, কেই বা করে? 'বডিলাইন' খেলেছেন, কিন্তু মাথা নোয়াননি। নিজে অত্যন্ত শৃঙ্খলাপরায়ণ ছিলেন, সকলের কাছেই সেই ডিসিপ্লিন আশা করতেন। তার ঘাটতি দেখেছেন বলে ফিঙ্গলটন, বার্নেস, বা মিলারকে তিনি সেরকম পছন্দ করতেন না—অনেকেই মনে করেন যে নির্বাচক হিসাবে ব্রাডম্যানের সমর্থন পেলে হ্যাসেটের পর ক্যাপ্টেন হতেন মিলারই। কিন্তু এক্ষেত্রেও ব্র্যাডম্যান ছিলেন অটল, অনড়।
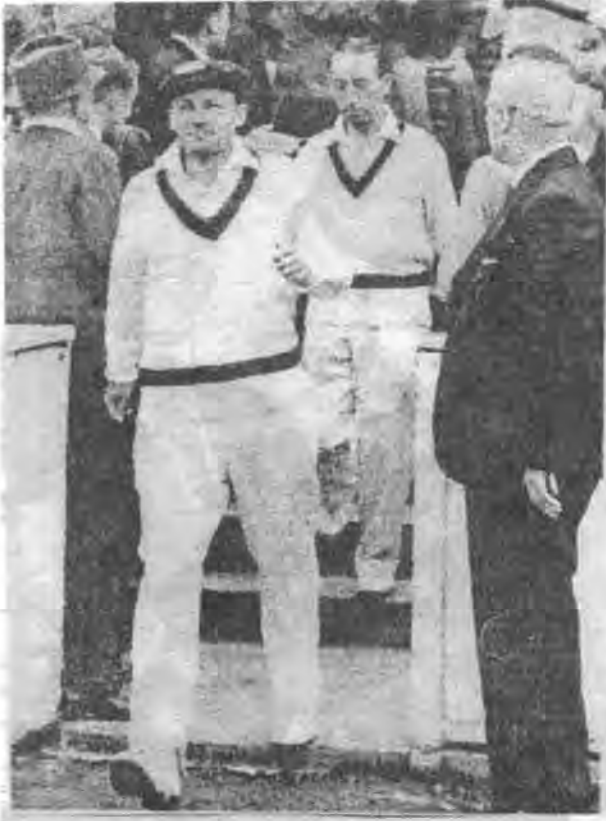
ব্যাটসম্যান ব্র্যাডম্যান সম্পর্কে আরও কিছু কথা আছে। তিনি বল মাটি থেকে তুলতেন না—সারা জীবনে মাত্র ৪৬টা ছয় মেরেছেন। ৭০-৮০র ঘরে বড় একটা আউট হতেন না, ৫০ পেরোলেই সেঞ্চুরির দোরগোড়ায় পৌঁছে যেতেন। তাই গড়ে প্রতি তিনটে ইনিংসে তাঁর একটা করে সেঞ্চুরি আছে। গড়ে প্রতি ইনিংসে দলের এক চতুর্থাংশ রান তিনি একাই করেছেন। গড়ে প্রতি ইনিংসে তিনি উইকেটে থাকাকালীন, অন্যান্য ব্যাটসম্যানের সঙ্গে, মোট ১৫৬ রান করেছেন। কিন্তু রান করতেন অস্বাভাবিক দ্রুত হারে—গড়ে ঘণ্টায় ৪২ রান করেছেন, সেঞ্চুরি করলে ঘণ্টায় ৪৭, ডবল সেঞ্চুরিতে ঘণ্টায় ৪৯—অর্থাৎ যত বেশি রান করবেন, ততই যেন দ্রুত চলবেন। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায় ৪৫২* করেছিলেন ৪১৫ মিনিটে, ৩৬৯ করেছিলেন ২৩৩ মিনিটে। আর লীডসে? লাঞ্চের আগে ১১৫, চা পানের বিরতিতে ২২০, দিনের শেষে ৩০৯। এ সব কৃতিত্ব হব্‌স্‌ বা বয়কট বা গাভাসকর বা বর্ডারের ক্ষেত্রে ভাবা যায় কি?

ব্রাডম্যান তো কুড়ি বছর বয়সে খেলা শুরু করেছেন, শেষ করেছেন চল্লিশে। এর মধ্যে মহাযুদ্ধের জন্য ছ'টি মরসুম টেস্ট খেলা হয়নি। ১৯৩৪ সিরিজের শেষে অ্যাপেন্ডিসাইটিসে আক্রান্ত

হ'ন—প্রায় বাঁচার আশাই ছিল না—এ জন্য ১৯৩৪-৩৫ মরশুমে খেলতেই পারেননি, ১৯৩৫-৩৬ সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে যেতে পারেননি। মহাযুদ্ধের সময় ভোগেন ফাইব্রোসাইটিসে—সেনাবাহিনী ছাড়তে হয়, মহাযুদ্ধের পরে খেলতেও অসুবিধা হয়—তবু খেলেছেন দেশের জন্য। যদি বর্ডারের সমান টেস্ট খেলতেন, হয় তো বা ২০,০০০ রান করতেন—গাভাসকরের সমান খেললে হয় তো সেঞ্চুরি হ'ত ৬০টা। এ সব তথ্য অবশ্য যাঁরা ব্রাডম্যানের রেকর্ড ভেঙেছেন তাঁরাও স্বীকার করেছেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায়।

এ তো গেল খেলোয়াড়ব্রাডম্যানেরকথা। আর মানুষব্রাডম্যান? তাঁর ব্যক্তিগত জীবনটা ব্যক্তিগত রাখতে চেয়েছেন বারবার, সব সময় সফল হননি। একান্ত অনুরক্ত ছিলেন স্ত্রী জেসির—৬৫ বছর বিবাহিত জীবনের পর তিনি ১৯৯৭-এ বিদায় নিলে একা হয়ে পড়েন ডন। তাঁর ভাষায়: "তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পার্টনারশিপ"। এক পুত্রকে হারান অল্প বয়সে, মেয়ে ভুগেছিল দুরারোগ্য কঠিন ব্যধিতে। অন্য পুত্র জন 'ব্রাডম্যানের ছেলে' হবার দুরূহ সম্মান এড়াতে নিজের নাম পাল্টে ব্র্যাডসেন করে দেন। প্রতি টেস্ট খেলে মাত্র ৫০ ডলার পেতেন। ট্যুরে গেলে মাইনে কাটা যেত। পয়সার জন্য খবরের কাগজে লিখলে ফাইন হয় ৫০০ ডলার। সমস্যা এড়াতে বিলেতে প্রোফেশনাল হিসেবে খেলবেন ঠিক করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত আর একটা চাকরি পাওয়ায় তা করতে হয়নি।

আজকের খেলোয়াড়দের নিরিখে ক্রিকেটার ব্রাডম্যান আর মানুষ ব্রাডম্যান দুই-ই আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। তাই উইসডেনের শতকের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হন ১০০র মধ্যে ১০০ ভোট পেয়ে—তাঁর পরে সোবার্স (৯০), হবস (৩০), ওয়ার্ন (২৭) আর রিচার্ডস (২৫)। এটাই ব্রাডম্যানের সঙ্গে অন্যান্যদের পার্থক্য। সে পার্থক্য মেনে নিয়েই রইল তাঁর উদ্দেশ্যে আমাদের শেষ নমস্কার।

ব্র্যাডম্যানের ক্রিকেট কেরিয়ার			
	রান	গড়	সেঞ্চুরি
টেস্ট (ম্যাচ ৫২)	৬,৯৯৬	৯৯.৯৪	২৯
প্রথম শ্রেণীর ম্যাচ	২৮,০৬৭	৯৫.১৪	১১৭
সব ম্যাচ	৫০,৭৩১	৯০.২৭	২১১

বলতে গেলে ব্যাপারটা মেজোমামাই (সুবিনয় রায়-ই) শুরু করেছিলেন, মানে মেজোমামার লেখা গল্পগুলোর নায়ক, সরস সমাচারের সম্পাদক, সেই সত্যসহায় সেনশর্মা, যিনি পরপর একই অক্ষর দিয়ে শুরু হয় এমন শব্দ বসিয়ে মজার মজার খবর লিখতেন। ডলি, নিনি, লতু, কল্যাণ সবাই সেগুলো পড়তে ভালোবাসত। 'হনলুলুতে হাস্যকর হদিস'-এর গল্প পড়ে কল্যাণের এমনই ভালো লেগে গেল যে সে তার নতুন ডায়রির প্রথম পাতায় লাল-নীল পেনসিল দিয়ে বড় বড় অক্ষরে লিখে ফেলল, 'হাজারিবাগে হাস্যকর হদিস'।

কল্যাণের ডায়রি অবশ্য খুবই গোপনীয় এবং মূল্যবান ছিল, কিন্তু সমস্ত গোপনীয় জিনিসের মতো এগুলোও যথাসময়ে সবাই জেনে যেত। দিদি, লতু, নিনি হাসাহাসি করত। ডলি অবশ্য হাসত না, কিন্তু গোপন কথাগুলো ফাঁস করে দিয়ে সেই প্রথমে গোল বাধিয়ে দিত। কল্যাণ বিরক্ত মুখে অন্য দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করে বলত, 'হাসবার কি আছে? আড়ি!' না হয় সে নানকুমামা (সুবিমল রায়)-এর অনুকরণে লালনীল লঙ্কের কালি আর পেনসিল দিয়ে মজার মজার কথা ডায়রিতে লেখেই তাকে হয়েছেটা কি? কতগুলো আজে বাজে নিরস সত্যি ঘটনা লিখে পাতা না ভরিয়ে কেবল ইন্টারেস্টিং কথা লেখাই তো ভালো, নাই বা সবগুলো পুরোপুরি সত্যি হোক, ক্ষতিটা কি?

দুপুরে খাবার টেবিলে বসে কল্যাণ বিড় বিড় করে কি যেন বলছিল। পিসিমা বললেন, 'কি বলছিস কলু? জোরে বলিস না কেন?'

ডলি বলে উঠল, 'বলছে যে এখন থেকে কেবল হদিসই লেখা হবে।'

'কার হদিস? কিসের হদিস? হদিস মানে, সন্ধান না ঠিকানা?'

নানাজনের নানা প্রশ্নের উত্তরে কল্যাণ বিড় বিড় করে কি যেন বলল, কেউ শুনতে পেল না। কিন্তু ডলি আবার জোরে প্রচার করল, 'হাস্যকর হদিস—মানে সেই যে একই অক্ষর দিয়ে সব কথা শুরু হয়।'

তার ব্যাখ্যা শুনে সবাই হাসাহাসি করল বটে কিন্তু 'হাস্যকর হদিস' নামটা ভালোভাবেই চলে গেল, আর সবাই মিলে হদিস বানাতে লেগে গেল।

হাটের দিন বাড়ি ফিরে এসে চিন্তামণি দারুণ ভিড়ের কথা বলতে না বলতেই নিনি বলে উঠল, 'চিঁড়েচ্যাপ্টা চিন্তামণির চিচিৎকার।'

চিচিৎকার কি? নাকি খুব বেশি চিৎকার করলে চিচিৎকার হয়।

সকালবেলা ডলির হাঁকডাক, 'ও দাদা, দেখে যা, সাত সকালে সাতটা শালিকের শয়তানি। সাড়ে সাতটা লিখবি? একটা 'স' তাহলে বাড়বে।'

লতু বল, 'দ্যাখ দ্যাখ, মাঠের মাঝে মস্ত মেষ। ওটা অবশ্য আসলে ছাগল। কিন্তু তাহলে তো হদিস হয় না।'

দিদি কোনও হদিস বানায় না কেবল হাসি ঠাট্টা করে। কল্যাণ বিরক্ত মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে বিড় বিড় করে আর তার ডায়রির পাতা খালিই পড়ে থাকে।

বড়মামিমা মাণিককে নিয়ে যেদিন এলেন, দেউকি চাপরাশিকে সঙ্গে নিয়ে কল্যাণ হাজারিবাগ রোড স্টেশনে তাঁদের আনতে গেল।

কল্যাণ অবশ্য একলাই যেতে চেয়েছিল, কিন্তু শেষরাতে বের হতে হবে বলে জেঠিমা রাজি হলেন না। ওদিকে দেউকি তো তার মামিমাদের চেনে না, কাজেই বাড়ির একজনকে যেতেই হয়।

এত দায়িত্বপূর্ণ একটা কাজের ভার পেয়ে কল্যাণের চেহারাই পাল্‌টে গেল। হঁ-হঁ বাবা। মাত্র দেড় দু'মিনিট ট্রেন থামে, তারই মধ্যে ভোরের অন্ধকারে মামিমাদের খুঁজে বের করে তাদের মালপত্র সব গুণে-গেঁথে নামানো আবার হাজারিবাগের বাসে সব তোলানো সহজ কথা নাকি? তখন হয়তো লাল মোটর কোম্পানীর কোনও বাসই থাকবে না, হ্যাসলপের হলদে বাসে আসতে হবে। কল্যাণের ভাঁট দেখে কে।

বেলা হবার আগেই মামিমারা হাজারিবাগে পৌঁছে গেলেন। সে কি হাসাহাসি হৈচৈ—সবাই এক সঙ্গে কথা বলতে লাগল, কেউ কারও কথা শুনতে পেল না। অবশেষে কিছুটা ঠাণ্ডা হয়ে সবাই খেতে বসল।

মামিমা বললেন, 'আরে, ফ্লুরির একটা কেক এনেছি যে। চায়ের সঙ্গে খাও সবাই।'

'ওমা! টুলু কেক এনেছে! আমি কেক খেতে বড্ড ভালোবাসি।' সহাস্যে বলে উঠলেন পিসিমা।

'তোমার দেখি কেকের নামে জিভে জল আসছে দিদি।' বললেন জেঠামশাই, কিন্তু নিজেও উঠতে উঠতে আবার বসে পড়লেন।

পিসিমা রেগে বললেন, 'আহা, জিভে জল এল কখন আবার? নেহাৎ টুলু আদর করে দিচ্ছে, না খেলে দুঃখিত হবে তাই—'

পাশের ঘরে ততক্ষণে হইচই পড়ে গেল, 'টিফিন বাক্সটা কোথায় গেল? এই তো মামিমার আর মাণিকের স্যুটকেশ রয়েছে, ওদিকে হোল্ডল ছোট এটাচিকেসটাও আছে, কেবল টিফিন বাক্সটা গেল কোথায়?'

কল্যাণের মুখ চুন।

'ও দাদা, টিফিন বাস্কেটটা নামিয়েছিলি তো?' প্রশ্ন করল লতু।

নিনি বলল, 'সেটা বোধহয় এতক্ষণে মোগলসরাই পৌঁছে গেল।'

দেউকি হাঁ হাঁ করে উঠল, 'আমি তো সেটা নিজে মাথায় করে নামিয়েছিলাম, কি জানি খাবার উবার আছে, কুলির হাতে দিইনি — যদি...'

'তাহলে হয়তো বাসের মাথায় থেকে গেছে, নামানো হয়নি।'

দিদি হেসে বলল, 'তাহলে এতক্ষণে হ্যাসলপের অফিসে ফ্লুরির কেকের ভোজ লেগেছে।'

তাড়াতাড়ি জেঠামশাইয়ের চিঠি নিয়ে দেউকি বাস টার্মিনাসে ছুটল। 'লস্ট লাগেজ' রাখা বাস্কেটটা নিয়ে হাসতে হাসতে সে আধঘণ্টার মধ্যে ফিরে এল। যদিও তখন বেশ বেলা হয়ে গিয়েছিল, তবু যখন মামিমা কেক কেটে সবাইকে দিলেন, কেউ খেতে আপত্তি করল না।

সবচেয়ে আনন্দ কল্যাণের। তখনই সে ডায়রিটা গোপন জায়গা থেকে বার করে প্রথম পাতায় লিখে ফেলল, 'হলদে হ্যাসলপের হাঁদামিতে হ্যাম্পার হারানো'।

সবাই এবার স্বীকার করল যে এটা একটা হাস্যকর হদিস বটে! দিদি অবশ্য ঠাট্টা করল, 'তোমরা টিফিন বাস্কেটটা নামাতে ভুলে গেলে আর হাঁদামো হ'ল কিনা হ্যাসলপের।'

কল্যাণ অন্য দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল, অত সব কথা শুনতে গেলে কি চলে?

রবিবার জেঠামশাই বোকারো ফল্‌স্ দেখতে যাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। ফলসের নিচে বসে খাওয়া দাওয়া হ'ল, অনেক ছবি তোলা হ'ল। ওমা! মাণিক গলায় ক্যামেরা ঝুলিয়ে খাড়া পাথর বেয়ে হামচে-খামচে একেবারে ঝরণার মাথায় চড়ে গেল। কল্যাণ ডায়রিতে লিখল, 'ডেয়ারিং ডেসপারেডোর ডানপিটেমি।' মাণিক বলল, 'ছবিটা কেমন চমৎকার হয়েছ তাও লেখ।'

অনেকগুলো মাংসের বড়া বাড়তি হয়েছিল, মিটসেফে রাখা ছিল। ছানা কেটে একটা ঝাড়নে বেঁধে জল ঝরাবার জন্য টাঙানো ছিল।

সকালে খাবার টেবিলে বসে জেঠিমা চিন্তামণিকে বলছেন যে দুপুরে ছানার ডালনা হবে আর বড়াগুলো গরম করে দেওয়া হবে। চিন্তামণি কিছুই বুঝতে পারছে না। ওদিকে লতুনিনিরা হেসেই আকুল।

ব্যাপার কি? না মিটসেফের দরজা খোলা, বড়া উধাও। ওদিকে ঝাড়নের গিঁটটাই শুধু টাঙানো রয়েছে, তলা থেকে ঝাড়নশুদ্ধ ছানা কে খেয়ে গেছে? কে আবার নিশ্চয় সেই চোট্টা কেলে হুলোটা —বড় বাড় বেড়েছে ব্যাটার।

কল্যাণ আবার ডায়রিতে লিখল—'বড়-ঘরে বড়া-খাওয়া বেড়ালের বাড়াবাড়ি'।

ডলি আপত্তি করেছিল, 'ও দাদা, ঘরে লিখেছিস কেন, খাওয়াই বা লিখেছিস কেন? তাহলে হদিস হবে কি করে?'

কল্যাণ ধমক দিল, 'দেখছিস না, হাইফেন দিয়ে জুড়ে দিয়েছি।' যথারীতি ডলি এখবরও প্রচার করে দিল। লতু নিনি স্বীকার করল যে হদিসটা ভালো হয়েছে। কিন্তু দিদি কেবল হাসতে থাকে কেন। কল্যাণ মুখ ঘুরিয়ে বিড় বিড় করে কি যেন বলতে লাগল।

রাত্রে দিদি শুয়েছিল ঠিক জানলার ধারে। ঘুম আসছিল না, তাই জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল। ওদিকে খাটে মামিমা ঘুমোচ্ছেন। পাশের ঘর থেকে পিসিমার মৃদু নাক ডাকার শব্দ। অন্ধকারে আবছা দেখা গেল পাঁচিলের ওপর দিয়ে কি যেন আসছে।

কেলে হুলোটা না? চুপ করে সে শুয়ে রইল—কেলেকে জব্দ করতে হবে। রোজ রোজ চুরি করে খাওয়া বন্ধ করতে হবে। পাঁচিল থেকে এক লাফে যেই হুলোটা জানলায় পড়েছে অমনি সে চেঁচিয়ে উঠল—

'হ্যাস!!'

বেড়াল তো এক নিমেষে হাওয়া। এদিকে মামিমা আচমকা ঘুম ভেঙে ডাক দিয়েছেন, 'শৈলদি। ও শৈলদি।।'

আর পিসিমা নাক ডাকা থামিয়ে ধুম চিৎকার জুড়েছেন—'চোর! চোর!! চোর! অরুণ! কল্যাণ!! মানিক!!! চিন্তামণি—' বাড়ি সুদ্ধু সবাই ততক্ষণে জেগে উঠেছে। মানিক থেকে চিন্তামণি পর্যন্ত সবাই লাঠি, লন্ঠন নিয়ে চারদিকে খোঁজখুঁজি শুরু করেছে। কিন্তু কই চোর, কোথায় চোর?

ওদিকে দিদি এত বেশি হাসছে যে তার কথা কেউ বুঝতেই পারছে না। সে সমানে বসে চলেছে, 'কেলে হুলো চোর। বড়া খাওয়া চোর!!'

আবার পরদিন ডায়রি খুলে বসল কল্যাণ। ঠিক হয়েছে, দিদির ভালো নাম কল্যাণী, এবার তার কথাই লিখতে হচ্ছে—'ক্যাটাবলোকনে কল্যাণীর ক্যাডাভেরাস কাঁদাকাটি।'

এবারকার হদিস শুনে সবাই খুব হাসল। দিদি প্রথমে রেগে গিয়েছিল, 'আমি মোটেই কাঁদিনি, হাসছিলাম।' কিন্তু কল্যাণকে বকতে গিয়ে সেও হেসে ফেলল।

হদিস লেখা চলতেই লাগল। ছুটির দিনে মামিমা চমৎকার পোলাও রেঁধেছেন, কিন্তু তাতে কালো কালো কি সব দিয়েছেন, কিছুতেই সে রহস্য ফাঁস করছেন না।

কল্যাণ খেতে বসে একটু শুঁকেই বিড় বিড় করে কি বলল। যথারীতি ডলি ঘোষণা করল, 'বলছে যে পিঁপড়ের পুঁটুলির পোলাও।'

'সে আবার কি?' জেঠিমা জিজ্ঞাসা করলেন।

নিনি বলল, 'পশ্চিমী পিঁপড়ের পিছনের পুঁটলির পোলাও। পিছনের পুঁটুলিটাই তো বেশি বড় আর নিশ্চয় খুব সুস্বাদু।'

মামিমা তো শুনে ছ্যা, ছ্যা করে উঠলেন।

পিসিমা বললেন, 'ওয়াক থু। আমার বমি আসছে।'

জেঠামশাই বললেন, 'তাহলে দিদি, তোমার ভাগের পোলাওটা আমাকেই দাও, তুমি বরঞ্চ পাঁউরুটি খাও।'

কোনও উত্তর না দিয়ে পিসিমা নিজের প্লেটটা আরও কাছে টেনে এনে খেতে শুরু করলেন।

লিখবার সময়ে কল্যাণ আরও এক কাঠি বাড়িয়ে লিখল 'পশ্চিমী পাজি পিঁপড়ের পিছনের পুঁটলির পোলাও'।

গোরস্থানের পাশ দিয়ে রাত্রে হড়হড়ু গ্রামে যাবার সময়ে দেউকি সেদিন ভয় পেয়েছিল। কিসের যেন শব্দ শুনেছিল।

কল্যাণ ডায়রিতে লিখল, 'গ্রেভইয়ার্ডের গোরগুলো গজগজিয়ে গান গাইছিল।'

ডলি এবার ভয় পেল, 'ও দাদা, ও সব লিখিস না। শেষে যদি গোরগুলো সত্যিই একদিন গান গেয়ে ওঠে?'

'তাহলে এবার কেবল খাওয়া-দাওয়া নিয়েই লিখি—কি বলিস?'

বিকেলে যেই জেঠিমা সুজির সঙ্গে কিসমিস বাদাম আর আরও কিসব মিশিয়ে হালুয়া বানিয়েছেন—কল্যাণ লিখল 'হাজারিবাগের হলদে হুলোর হালুয়া'।

ডলির কাছে খবর পেয়ে দিদি আপত্তি জানাল, 'হুলোর আবার হালুয়া কি। তাছাড়া হুলোটা তো কালো।'

কোনও উত্তর না দিয়ে কল্যাণ লাল পেনসিলে লিখল—'হুলোর হাঁটুর হালুয়া'।

আরও কত যে উদ্ভট খাবারের নাম লেখা হতে লাগল।

জেঠিমা জিজ্ঞেস করলেন, 'জন্মদিনে কি খেতে চাও কল্যাণ? সামনের সপ্তাহেই তো তোমার জন্মদিন।'

কল্যাণ কিছু বলবার আগেই জেঠামশাই, পিসিমা, সবাই নিজেরা যে যা খেতে ভালোবাসেন সেই সব জিনিসের নাম করতে লাগলেন। পিসিমা বললেন, 'কল্যাণ মাংস খেতে বড্ড ভালোবাসে।'

লতু আর নিনি কিন্তু বলল, 'কি খাওয়া হবে, তার মেনু আমরা ঠিক করে দেব।'

'কি মেনু? আগে থেকে না বললে সব কিছু জোগাড় করে রাঁধা যাবে কি করে?'

ওরা কিন্তু রহস্যময় হাসি হেসে কেবল বলে সময় হলেই সবাই দেখতে পাবে।'

ওদের কথায় কান না দিয়ে জেঠিমা অবশ্য চিন্তামণিকে দিয়ে মাছ-মাংস আনালেন, গোয়ালার কাছ থেকে বেশি করে দুধের ব্যবস্থা করলেন, পায়েস হবে।

তবু লতু, নিনির সেই মেনুর বিষয়ে আর কিছু শোনা গেল না। তারাও জেঠিমার সঙ্গে কিসমিস বাছা, দুধ ঘন করার কাজে সাহায্য করতে লাগল।

অবশেষে সেই বিশেষ দিনটি এসে গেল, সকালে ঘুম থেকে উঠে সবাই দেখতে পেল যে খাবার ঘরের দেয়ালে একটা মস্ত বড় কাগজ টাঙানো রয়েছে, তার চারধারে বাহারে বর্ডার দেওয়া আর ওপরে খুব বড় অক্ষরে লেখা আছে....

'মেনু'

তারপরে লাল নীল পেনসিলে লেখা নানা বিচিত্র খাবারের নাম—

কলকাতার কদর্য কলহপ্রিয় কচ্ছপের কঙ্কালের কটকটে কচুরি।
ল্যাপল্যান্ডের ল্যাংড়া লেমুরের ল্যাজের ল্যাগুল্যাণ্ডে ল্যাংচা।
নবদ্বীপের নচ্ছার নধর নকুলের নাকের নরম নকুলদানা।
কুমেরুর কুচুটে কুচকুচে কুচ্ছিত কুকুরের কুঁচকির কুড়মুড়ে কুলপি।
মারডেকার মারাত্মক মাতব্বর মাতঙ্গের মাথার মালাইকারি।
রচেস্টারের রক্তচক্ষু রোমশ রাইনোসরাসের রগের রগরগে রোস্ট।
চক্রধরপুরের চটকদার চকচকে চামচিকের চোখের চমৎকার চচ্চড়ি।
ক্রয়ডনের ক্রিকেটপ্রিয় কৃশ কৃকলাসের ক্রাম্পেট।
বহরমপুরের বদমেজাজী বয়স্ক বন্য বরাহের বগলের বড় বড় বড়া।
রংপুরের রকবাজ রগুড়ে রামছাগলের রসাল [illegible]।
তিরুচিরাপল্লির তিরিক্ষি তিক্ত তরতাজা তক্ষকের তালুর তপ্ত তন্দুরি।

শব্দ-ছকের উত্তর

পাশাপাশি

১। কালিদাস
৪। মুদিখানা
৭। খামখেয়াল
১১। মারমুখো
১৩। বিটপ
১৫। লালা
১৬। মালমশলা
১৮। কটমট
২০। লাভ
২১। বাই
২৩। টিকা
২৫। কাল
২৬। পাউন্ড
২৭। গজগমন
২৯। আকবর
৩০। কারাবাস
৩৩। বাচাল
৩৫। তথা
৩৬। মশান
৩৮। টাইম
৩৯। বাহার
৪১। খাতক
৪৩। নামকরণ
৪৫। দানাপানি
৪৮। ললনা
৫০। বাহাল
৫১। কলা
৫৩। নগরপাল
৫৪। কানা
৫৫। তান
৫৬। বিল
৫৭। লতা
৫৮। সরগরম
৬১। দোর
৬৩। দক্ষ
৬৪। নাও
৬৫। রকম
৬৬। নিলামঘর
৬৭। পিকদান
৬৮। কল
৬৯। বাদশা
৭০। রাজভবন
৭২। স্বপনপুরী
৭৩। চতুর
৭৪। বন্ধ

উপর-নীচ

১। কাহারবা
২। দামামা
৩। সরল
৪। মারমুখো
৫। খাবি
৬। নাটক
৮। মলাট
৯। খেলা
১০। লণ্ডভণ্ড
১২। মুমতাজ
১৪। পটকা
১৭। লাটিম
১৯। মলমাস
২০। লাউ
২২। ইতিকথা
২৪। কানকাটা
২৬। পাতাবাহার
২৭। গরম
২৮। গগনতল
২৯। আতরদান
৩১। রাই
৩২। বামনাবতার
৩৪। চারণকবি
৩৭। শাখা
৩৯। বাকল
৪০। ব্যাপার
৪২। কলকাতা
৪৪। মহানগর
৪৬। নাগরদোলা
৪৭। নিপাত
৪৯। নানা
৫২। লালনপালন
৫৭। লক্ষ
৫৮। সওদাগর
৫৯। রকবাজ
৬০। মম
৬২। রমজান
৬৩। দরবারী
৬৪। নাক
৬৬। নিঃস্ব
৬৭। পিশাচ
৬৮। কবন্ধ
৭০। রাকা
৭১। ভব

লেখক সত্যজিৎ : গোড়ার কথা

দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

জান তোমায় বলছি শোন,
হব যখন তোমার মত বড়।
লিখব লেখা ঝুড়ি ঝুড়ি,
পাঠিয়ে দেব তোমার বাড়ি
তুমি তোমার সন্দেশেতে
লেখাগুলি সাজাবে বসে
এই আনন্দে দিচ্ছি গড়াগড়ি।

আট বছরের সত্যজিতের এটি মনের বাসনা হলেও প্রাপ্ত বয়সের পর সচেতন সত্যজিৎ কখনও ভাবেননি তিনি লেখক হবেন। অথচ কালক্রমে তিনিও হয়ে উঠলেন বাংলা সাহিত্যের 'বেস্ট সেলার'—তালিকা-শীর্ষ। মৃত্যুর নয় বছর পরেও। আশ্চর্য, পুরানো লেখা নতুন সঙ্কলন, প্রকাশেও এর হেরফের ঘটে না। পিছন ফিরে দেখলে বিস্মিত হতে হয়, কি সহজাত প্রতিভায় তিনি আজ আমাদের অতিপ্রিয় লেখক।

১৯৪১ সালে। কুড়ি বছরের সত্যজিৎ তখন শান্তিনিকেতনের ছাত্র। কলাভবনে নন্দলাল বসুর কাছে আঁকা শিখছেন। ওই বছরের গোড়ার দিকে কাগজে একটি ছোট্ট সংবাদ প্রকাশিত হয়— ল্যাটিন আমেরিকার এক বিখ্যাত শিল্পীর প্রদর্শনীতে যে চিত্রটি সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয়েছিল পরে দেখা যায় সেটি নাকি উল্টো টাঙানো। ময়মনসিংহের রায়চৌধুরী পরিবারের মানুষ সত্যজিতকে এই ছোট্ট সংবাদটি একটি গল্প লিখতে অনুপ্রাণিত করে। গল্পে নিজেকে প্রকাশ করতে চান না বলেই গল্পকার হিসেবে নাম দিয়েছিলেন 'S. RAY' সেটা আবার ছাপা হয়েছিল 'S. ROY'। উত্তরাধিকারকে অস্বীকার করা শক্ত! সেই সময় ইংরেজিতে স্বচ্ছন্দ সত্যজিৎ লিখে ফেলেন জীবনের প্রথম গল্প 'অ্যাবস্ট্রাকশন্'। কৌতুকময় গল্পটিতে শেষ দেখা যায় প্রদর্শণীতে প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত 'দ্য সমন্যামবুলিস্ট' নামাঙ্কিত চিত্রটি, যেটি আসলে ছবিতে ব্যবহার করার আগে রঙের মিশেল ঠিক করার জন্য যে কাগজটিতে তুলি দিয়ে রঙের ছোপ লাগানো হয়, সেই বিচিত্রিত কাগজ-চিত্র। অর্থাৎ নির্দ্বিধায় বলা যাবে দৈনিকপত্রে প্রকাশিত সামান্য একটি সংবাদ ভবিষ্যতে বাংলা ভাষায় সর্বাধিক বিক্রিত সাহিত্যিকের লেখার আর্গল খুলে দিয়েছিলেন। এবং ইলাস্ট্রেশনে যিনি একদা যুগান্ত আনবেন তাঁর গল্পে ছবি এঁকেছিলেন তখনকার বিখ্যাত চিত্রকর শৈল চক্রবর্তী। নন্দলাল বসুর ছাত্র সত্যজিৎও তাঁর গুরুর মতো শিল্পে বাস্তবতার অনুরাগী এবং বিমূর্ত শিল্প (অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট) তাঁর মনে কখনোই সাড়া জাগায় না। এ কথা শিল্প সংক্রান্ত কথোপকথনে নিজেরাই জানিয়েছিলেন। 'অ্যাবস্ট্রাকশন' গল্পেও তাঁর শিল্প চেতনার ভাবধারা সম্পূর্ণ প্রকাশ পায়। দশ মাস পরে প্রকাশিত তাঁর দ্বিতীয় গল্পটিও ('শেডস্ অফ্ গ্রে', ২২শে মার্চ ১৯৪২ তারিখে প্রকাশিত) চিত্রশিল্পী সংক্রান্ত এবং গল্পের প্রেক্ষাপটে উঠে এসেছিল শান্তিনিকতনে তাঁর বন্ধু সঙ্গ ও কলেজ জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা। পরবর্তী ২০ বছরে আর একটিও গল্প তিনি লেখেননি। বরং জীবনের প্রথম গল্প দু'টি তিনি ভুলে থাকতেই চেয়েছিলেন। ১৯৮১ সাল পর্যন্ত কোনও সাক্ষাৎকারে এই গল্প দুটির কথা কাউকে বলেনওনি। গল্প দুটির হদিস পাবার পর তাঁকে জানালে তাঁর উত্তর, 'অমৃতবাজারে ১৯৪১-এর লেখা গল্পের হদিস আপনি কী করে পেলেন জানতে বিশেষ কৌতূহল হচ্ছে। ও দুটো শান্তিনিকেতনে ছাত্রাবস্থায় আমারই লেখা, কিন্তু খবরটা প্রায় কেউই জানে না। আমার নিজের কপিও নেই।'

১৯৬১ সাল। হাতে কিছু পয়সা আসতেই তিনি পুনরুজ্জীবিত করেন 'সন্দেশ'কে। তাঁর অনেক দিনের ইচ্ছেপূরণ। দাদু উপেন্দ্রকিশোর প্রতিষ্ঠিত এবং বাবা সুকুমার ও কাকা সুবিনয় রায়ের সম্পাদনায় যে পত্রিকার বয়স হয়েছিল প্রায় ২০ বছর, কেবল পয়সার অভাবেই ঘটেছিল তার অকাল প্রয়াণ। বন্ধ হবার ৩০ বছর পর সত্যজিৎ আবার ফিরিয়ে আনলেন 'সন্দেশ'কে। ১৯৫৩-এ পথের পাঁচালী চিত্রনাট্যে হাত দেবার আগে পর্যন্ত তিনি বাংলা ভাষা বা বাংলা সাহিত্য তেমন ভাবে চর্চা করেননি বললেই চলে। তিনিই নতুন 'সন্দেশ'-এর জন্য কলম ধরে হাত দিলেন ইংরেজি ছড়ার অনুবাদে। নিজের সাহিত্য সংক্রান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি সব সময় বলতেন, 'আমার লেখা শুরু 'সন্দেশ'কে ফিড করার জন্যে।'

May 15, 1941.

THE SUNDAY AMRITA BAZAR PATRIKA

Abstraction

SHORT STORY

By

S. Ray

এখানেও লক্ষ্য করার, সাহিত্যিক হবার বাসনা থেকে কোনও মৌলিক রচনা নয়, লিখলেন প্রিয় কিছু ইংরাজি ছড়ার অনুবাদ। এই অনুবাদ শব্দটি ব্যবহার করতে হ'ল সত্যজিতের নিজের কথার উদ্ধৃতি হিসেবে। সহজাত প্রতিভা ও শিক্ষায় সহজ-স্বচ্ছ-অন্ত্যমিলে আদতে সেগুলি বাংলায় রূপান্তরিত বা অনুকৃতি হয়ে উঠেছিল। এডওয়ার্ড লিয়রের 'দ্য জাম্বলিস্' বাংলায় সত্যজিতের কলমে হ'ল 'নীল মাথাতে সবুজ রঙের চুল—পাপাঙ্গুল'।

ননসেন্স রাইম-এ ব্যবহৃত বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়াপদে বা উল্লেখিত প্রাণী ব্যক্তি এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করতে রসহানি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সত্যজিৎ অসাধারণ উদ্ভট অভিনবত্বে নতুন সব বাংলা শব্দ ব্যবহার করে সেগুলিকে মৌলিক ছড়ায় পরিণত করলেন।

পাপাঙ্গুল

দ্বিতীয় সংখ্যায় তিনটি লিয়রের লিয়ারিক বা লিমেরিক। এমন পঞ্চচরণ পাঁচালী এর আগে দেখা যায়নি বাংলা ছড়ার হাটে। লিয়রের অনুবাদ নয়, যেমন লিয়রের ছবির আর এক প্রস্থ বিবরণ। এবং অবশ্যই খাঁটি বঙ্গীয়, নেই আড়ষ্টতার ছিটেফোঁটা। যেমন স্বতঃস্ফূর্ত বিবরণ তেমনই সহজ ছন্দ। রসসৃষ্টিতে অনবদ্য। তৃতীয় সংখ্যাতে আবার লিয়র —'দ্য ডং উইথ লুমিন্যাস নোস,' অনুকারে—

বনের মধ্যে ডং
ডং-এর দেখো ঢং
নাকের ডগায় ঝিলিক মারা সং।

কে বলবে উদ্ভট উৎকল্পিত এই সব ছড়া অনুবাদ করা বিশেষ দুরূহ কর্ম। চতুর্থ সংখ্যায় লুইস ক্যারলের 'জ্যাবারওঅকি' সত্যজিতের হাতে। 'জবরখাকি' হয়ে চমকে মাতিয়ে দেয় 'সন্দেশ'-এর পাঠকদের, পরে গোটা বাংলার সাহিত্যপ্রেমীদের।

বিল্লিগি আর শিঁথলে যত টোবে
গালুমগিরি করছে ভেউ-এর ধারে
আর যত সব মিমসে বোরোগোবে
মোমতারাদের গেবগেবিয়ে মারে।
যাসনি বাছা জবরখাকির কাছে
রামখিঁচুনি রাবণ-কামড় তার,
যাসনি যেথা জুবজুব ব'সে গাছে
বাঁদরছাঁচা মুখটি ক'রে ভার।

জবরখাকি

লিয়রের উদ্ভাবিত বহু উদ্ভট শব্দকে ছড়ার মেজাজীবোধ দিয়ে ধরে পরিচিত ও ঘরোয়া করে তুলতে ব্যবহার করেছেন উদ্ভট, আজগুবি, বাংলায় অপরিচিত নতুনতর সব শব্দ। এমনকি এই ধরনের শব্দ দিয়ে তৈরি করেছেন উদ্ভট চিত্রকল্প। সব সময়ে তিনি আক্ষরিক অনুবাদ না করে করে গেছেন ভাবানুবাদ। সুকুমার রায়ের ছড়া তো প্রবাদসম, কিন্তু সত্যজিতের। যাঁর বাংলা লেখার শুরু সবে চার মাস, তাঁর পক্ষে কি করে সম্ভব এমন ছন্দজ্ঞান? পঞ্চম সংখ্যায় ক্যারলের 'এ ম্যাড গার্ডেনার'স সং'। হ'ল 'রামপাগলের গান'। ষষ্ঠ সংখ্যায় লিখলেন প্রথম গদ্য রচনা, 'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি'। সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর, তিন কিস্তিতে শেষ। প্রথম গল্প পড়ে মনে হয় যেন হঠাৎই লিখে ফেলেছেন। চেয়েছেন গল্প বলতে, লিখতে নয়। ফলে লেখাটাই যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলা হয়ে উঠল। গল্পের প্রধান চরিত্র প্রোফেসর শঙ্কু। সাক্ষাৎকারে সত্যজিৎ জানিয়েছেন শঙ্কু চরিত্রটির অনুপ্রেরণা পেয়েছেন সুকুমার রায়ের 'হেঁসোরাম হুঁশিয়ারের ডায়রি' থেকে। যেটা ছিল

হেঁসোরাম হুঁশিয়ার ও দলবল

আর্থার কোনান ডয়েলের 'লস্ট ওয়ার্ল্ড'-এর ঠাট্টা অর্থাৎ প্রোফেসর চ্যালেঞ্জার-এর ছায়াও রয়েছে শঙ্কুর কাহিনীতে। কিন্তু শঙ্কুর পিছনে আর একটা চরিত্রের ছায়া অবশ্যই রয়েছে। তিনি হলেন নিধিরাম পাটকেল। 'সন্দেশ'-এর প্রথম সংখ্যা থেকে সত্যজিৎ নিজের হাতে প্রতিটি পাতা সাজিয়েছেন, প্রচ্ছদ এঁকেছেন, প্রয়োজন-মতো ইলাসট্রেশনও করেছেন। 'সন্দেশ'-এর প্রথম সংখ্যাতেই সুকুমার রায়ের একটা গল্প প্রকাশিত হয়, গল্পের নাম 'সত্যি'। প্রোফেসর নিধিরাম পাটকেলের কাহিনী। 'নিধিরাম পাটকেল'-এ সুকুমার রায় লিখেছেন—

'কী করেন আবার কী? আবিষ্কার করেন।

তিনি নতুন কামান আর তার গোলা তৈরি করেছেন। গোলার মধ্যে আছে বিছুটির আরক, লঙ্কার ধোঁয়া, আরশোলার আতর, গাঁদালের রস, পচামুলোর একস্ট্রাক্ট আরও অনেক কিছু। যত রকম উৎকট বিশ্রী গন্ধ, যতরকম ঝাঁঝালো তেজালো বিটকেল জিনিস, সব আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক কৌশলে মিশিয়ে তিনি গোলা তৈরি করেছেন।'

শঙ্কু কাহিনীর গোড়ায় সত্যজিৎ লিখেছিলেন, *'প্রোফেসর শঙ্কু বছর পনেরো নিরুদ্দেশ। কেউ কেউ বলেন তিনি নাকি কী একটা ভীষণ এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে প্রাণ হারান।'*

প্রোফেসর নিধিরামও ভীষণ একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে নিজের চেহারাটা কিম্ভূত-কিমাকারে পরিণত করেছিলেন। সুকুমার তার ছবিও এঁকেছেন। মনে হয় যেন নিধিরামকেই নতুন পরিচয়ে উপস্থিত করেছেন সত্যজিৎ। প্রোফেসর হেঁসোরাম আর নিধিরামের সংমিশ্রণেই শঙ্কু চরিত্রটির সৃষ্টি। সেই কারণেই শঙ্কুর প্রথম গল্পে ছিল আজগুবি হাস্যরস বা বিজ্ঞান-সুবাসিত খেয়াল রস [illegible]রকেট তৈরির সরঞ্জামের মধ্যে তাই পাওয়া যায় ব্যাঙের ছাতা, সাপের খোলস, কচ্ছপের ডিম। শঙ্কুর ইলাসট্রেশনেও তার প্রকাশ দেখা যায়, নস্যাস্ত্র তাক করে মারার সময় বাঁ কানে আঙুল দিয়ে চাপা, গলায় ঝোলে সুতো বাঁধা আতস কাঁচ। প্রথম গল্পে তিনি কখনওই শঙ্কুকে নিয়ে সিরিজ করার কথা ভাবেনি। শঙ্কুর ডায়রিটি গল্পের শেষে ডেঁয়ো পিঁপড়ের দল খেয়ে শেষ করে ফেলে।

'সন্দেশ'-এর নবম সংখ্যায় লিখলেন ছড়া 'মেঘের গান', দশম সংখ্যায় আবার গল্প 'বঙ্কুবাবুর বন্ধু', একাদশ সংখ্যায় 'টেরোড্যাকটিলের ডিম'। পর পর প্রকাশিত হ'ল দুর্দান্ত দু'টি গল্প। চলে এলেন জনপ্রিয়তার প্রথম সারিতে। আর পিছন ফিরে তাকাননি। এক বছর আগেও তিনি লেখার কারও তাগিদ অনুভব করেননি, গল্প লেখার জন্যে যে আলাদা সময় দিতে হবে এ ভাবনার কোনও অবকাশ ছিল না তাঁর। সন্দেশই তাঁকে বাধ্য করিয়েছে লিখতে। সত্যজিতের নিজের কথায় 'সন্দেশ' না এলে হয়তো আমার লেখা আরম্ভ হ'ত না।

তাঁর এই অনায়াস সাফল্য উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির পিছনে যে তাঁর বংশগত সূত্রে পাওয়া। উত্তরাধিকার নিহিত, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার, সুখলতা, সুবিনয়, সুবিমল, লীলা মজুমদার, অবশেষে সত্যজিৎ।

সুখাদ্য 'সন্দেশ'

বিনীতা ও সুগত

১। 'সন্দেশ' কোন্ বাংলা বছরের কোন্ তারিখে প্রথম প্রকাশিত হয়?

২। রায় পরিবারের এক আত্মীয় মূলতঃ প্রথম দশ বছরের সন্দেশে জীবজগৎ নিয়ে অনেকগুলি আকর্ষণীয় লেখা লেখেন— তিনি কে এবং কোন্ ছদ্মনামে লিখতেন?

৩। পরবর্তী কালের একজন নামী শিশুসাহিত্যিক ছিলেন উপেন্দ্রকিশোরের 'সন্দেশ'-এর উৎসাহী গ্রাহক— তাঁর চমৎকার স্মৃতিকথার প্রথম পর্বে 'সন্দেশ' সম্পর্কে অনেক তথ্যও জানা যায়—তিনি কে?

৪। রবীন্দ্রনাথ সন্দেশে বেশ কয়েকটি লেখা লিখলেও তাঁর একটি লেখা ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল —সেটি কোন্ লেখা?

৫। তিরিশের দশকে বছর তিনেক 'সন্দেশ' আকর্ষণীয় রূপে বের হ'ত—সেই সময় সন্দেশের সম্পাদক ছিলেন সুবিনয় রায় ও — ?

৬। ষাটের দশকে সন্দেশে এক লেখিকা নিজের লেখার সঙ্গে নিজের আঁকা ছবি মিলিয়ে গড়ে তুলতেন এক আজগুবি কল্পনার জগৎ। বর্তমানে তিনি প্রবাসিনী— তিনি কে?

৭। নতুন পর্যায়ের 'সন্দেশ'-এ 'কেষ্টার কাণ্ড' নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন ভারত-বিখ্যাত এক শিল্পী— কে তিনি?

৮। এই উপন্যাসটির গুটি তিনেক অধ্যায় রংমশাল পত্রিকায় লিখেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, সেটা সন্দেশে শেষ করেন লীলা মজুমদার— উপন্যাসটির নাম কি?

৯। সন্দেশে একবারই লিখেছিলেন ভারতহিতৈষী রবীন্দ্র-অনুরাগী বরেণ্য ইংরেজ। কে তিনি?

১০। সন্দেশে দু'টি উপন্যাস ও অনেকগুলি ছোট গল্প লিখে অকালে ১৯৭০-এর নভেম্বরে বিদায় নেন এই কৃতী সাহিত্যিক—কে তিনি এবং সন্দেশে প্রকাশিত তাঁর শেষ গল্পটির নাম কী?

১১। সত্যজিতের 'সেপ্টোপাসের খিদে' চিত্রিত করেন আরেক বিখ্যাত শিল্পী, তিনি সন্দেশে বেশ কয়েকটি রোমাঞ্চকর জীবজন্তুর গল্প লিখেছেন ভিন্ন নামে—নাম দু'টি কি কি?

১২। বর্তমানের এক প্রখ্যাত চিত্রাভিনেতা সন্দেশের মলাটে কমিক্স্ এঁকেছিলেন— কে তিনি এবং কমিক্সটির নাম কি?

১৩। সত্তরের দশকের প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন গ্রাহিকা এখন প্রতিষ্ঠিত লেখিকা —তিনি কে?

১৪। 'সন্দেশ'-এ নবনীতাদির প্রথম লেখাটি ছিল রূপকথা, যার উচ্চারণ-বিভ্রাট শুধরে দিয়েছিলেন স্বয়ং সত্যজিৎ—লেখাটির নাম কি ছিল?

১৫। 'সন্দেশ'-এ ধারাবাহিকভাবে কে লিখেছিলেন 'মালশ্রীর পঞ্চতন্ত্র'?

১৬। 'বাংলার পাখি'র বিখ্যাত লেখক সন্দেশে বেশ কয়েক বছর পরিচালনা করেন ক্রীড়াজগৎ— কে তিনি?

১৭। জ্যোতিরিন্দ্রমোহন জোয়ার্দার অনুবাদ করেন স্যার আর্থার কোন্যান ডয়েলের একটি রোমাঞ্চকর উপন্যাস —উপন্যাসটির নাম কি?

১৮। সত্তরের দশকে পর পর দু'টি বিখ্যাত ইংরাজী ছবি তৈরির কাহিনী লেখেন সন্দীপ রায়—ছবি দু'টির নাম কি?

১৯। সি. টি. সি. গল্পটির পুরো কথাটি কি? সেটি কার লেখা?

২০। ষাটের দশকের 'সন্দেশ'-এর এক নিয়মিত চিত্রকর পরবর্তীকালের ব্যতিক্রমী বাংলা ছবির নির্মাতা —কে তিনি?

আজ যাঁর সম্বন্ধে লিখতে বসেছি সে রকম মহিলা ভূভারতে আছেন কিনা আমার খুবই সন্দেহ। একাধারে তাঁকে ভক্তি করতাম, ভালোবাসতাম, আবার মাঝে মাঝে ভয়ও পেতাম। তিনি আমার শাশুড়ী, শ্রদ্ধেয়া সুপ্রভা রায়।

বিয়ের পর থেকেই আমাকে 'মা মণি' বলে ডাকতেন। তাঁর গুণের কথা লিখে শেষ করা যায় না। যেমন সুগৃহিণী, পাকা রাঁধুনী (কম তেল আর ঘি'তে এত সুস্বাদু রান্না কেউ করতে পারেন বলে আমার জানা নেই)। সেলাইয়ের হাত ছিল অসাধারণ। প্রত্যেকটি সেলাই বাঁধিয়ে রাখার মতন। আমার পুত্রের জন্মের পর উনি যা কিছু তৈরি করেছিলেন আমি সযত্নে রেখে দিয়েছিলাম। এখন সেসব জামা আমার নাতি পরে। এখনও নতুনের মতো আছে—যাঁরা দেখেন তাঁরা অবাক হয়ে যান। আমাদের কাশ্মীরি শালওয়ালাকে আমার ছেলের জন্য তৈরি করা একটা 'ঝাবলা' দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এই ধরনের কাজ ওরা আর করতে পারে কিনা। কাজ দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল এবং মাথা নেড়ে বলেছিল যে, এত খেটে এত সুন্দর কাজ আর কেউ করে না। আজকাল সবাই ফাঁকির কাজ করে। এ ছাড়াও চামড়ার কাজ অতি নিপুণ ভাবে করতেন। কত ব্যাগ আর পার্স যে সকলের জন্য করে দিয়েছিলেন তার শেষ নেই। তারপর মাটির কাজে হাত দিলেন। বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, একটার পর একটা মূর্তি গড়ে চলেছেন। তাঁর তৈরি 'প্রজ্ঞা পারমিতা' এখনও আমাদের বারান্দার শোভা বৃদ্ধি করছে। গুণের কি আর শেষ আছে—কি মধুর গানের গলা ছিল ওঁর। আমি নিজেও এক সময় ভালো গাইতে পারতাম। এই প্রসঙ্গে একটা মজার ঘটনা উনি আমাকে বলেছিলেন। ছাত্রী হিসাবেও খুব মেধাবী ছিলেন। ম্যাট্রিক পাশ করার পর কলকাতায় ওঁর ছোটমাসির বাড়ি (ডঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্যর স্ত্রী) এসে বেথুন কলেজে ভর্তি হন। খুবই নামকরা বিচক্ষণ ডাক্তার ছিলেন মেসোমশায়, এবং উনিও অপূর্ব গাইতে পারতেন। প্রচুর লোক সমাগম হ'ত এ বাড়িতে। একদিন বেশ কিছু মহিলা বেড়াতে এসেছিলেন এবং ছোটমাসি ও অন্যান্যদের অনুরোধে উনি গান গাইলেন। গানটি হ'ল 'তুমি কেমন করে গান কর যে গুণী'। ঠিক সেই সময় বাইরের ঘরে শ্রদ্ধেয় সুকুমার রায় প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্যের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। গানটি পরিষ্কার শোনা যাচ্ছিল। অবাক বিস্ময়ে গানটি শুনলেন। কি জন্য এসেছিলেন বেমালুম ভুলে গেলেন। শেষ হবার পর, কিছুক্ষণ বসে, গায়িকার নাম জিজ্ঞেস করে উঠে চলে গেলেন—কাজের কথা আর বলা হ'ল না। সেই সময় উনি বিলেত যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। যাবার আগে ওঁকে বিয়ে করে যাবার জন্য পিড়াপীড়ি করা হয়েছিল। উনি রাজি হলেন না, বল্লেন যে, বিলেত থেকে ফিরে এসে করবেন। বিলেতে থাকাকালীন ওঁকে বিবাহযোগ্যা ব্রাহ্ম মেয়েদের একটি তালিকা পাঠানো হয়েছিল। এত উপযুক্ত পাত্র, যাকে চান, তাকেই বিবাহ করতে পারেন। উনি তালিকাটি মনোযোগ সহকারে পড়ে তিনটি কথায় তার উত্তর দিয়েছিলেন, 'তালিকাটি সম্পূর্ণ নয়।' অর্থাৎ সুপ্রভা দাশের নাম, ভুল বশত ওই তালিকা থেকে বাদ পড়ে গিয়েছিল।

বিলেত থেকে ফিরে এসে সুপ্রভা দাশকেই বিয়ে করলেন। মাত্র ১০ বছরের বিবাহিত জীবন—বিরাট সংসার, কিন্তু তার মধ্যে কাজে-কর্মে সেবায় তিনি শ্বশুরবাড়ির সকলের মন জয় করেছিলেন। আড়াই বৎসরের শিশুপুত্রকে রেখে স্বামী ৩৬ বৎসর বয়সে মারা যান। এত বিরাট প্রতিভাধর স্বামীর অকালমৃত্যুতে যে কোন স্ত্রী শোকে দুঃখে মুহ্যমান হয়ে পড়তেন। শোক, দুঃখ, বেদনা পেয়েছিলেন অবশ্যই, কিন্তু ভেঙে পড়েননি। অসাধারণ ব্যক্তিত্বের জোরে তিনি উঠে দাঁড়িয়েছিলেন শিশুপুত্রকে মানুষ করার জন্য। পাছে বেশি আদরে পুত্রের ক্ষতি হয় তাই বেশ কড়া শাসনেই তিনি ওকে মানুষ করেছিলেন। লেখাপড়ার ভার অবধি নিয়েছিলেন, এবং তার ফল যে কি হয়েছিল আজ তা সকলেই জানেন।

ব্রাহ্ম হলেও কিছু কিছু হিন্দু আচারে উনি বিশ্বাস করতেন—যেমন, লোহা, শাঁখা এবং সিঁদুর। উনি আমাকে বলেছিলেন যে ওঁর বিবাহিত জীবনে, রাত্রে শোবার সময়ও উনি সিঁদুরের টিপ পুঁছতেন না। আমার বিয়ের পর নিজের হাতে আমাকে লোহা ও শাঁখা পরিয়ে দিয়েছিলেন।

আরও একটা আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল ওঁর, সেটা হ'ল সেবা করার। যে কোনও ভালো ট্রেন্ড নার্সের চেয়ে কোনও অংশে কম যেতেন না। আমার বিয়ের বছরখানেকের মধ্যে আমাদের বাড়িতে প্রায়

সকলের বেরিবেরি হয়েছিল। আমার স্বামী, বাড়ির চাকরবাকর কেউ বাদ পড়েনি। একমাত্র ওঁরই হয়নি। একাধারে সবাইকে সেবা করেছিলেন। সবাই সেরে উঠল। আমারটা একটু বেয়াড়া রকমের হয়েছিল বলে ডাক্তাররা আমাকে তিন মাস বিছানায় শুইয়ে রেখেছিলেন। তখন দেখেছিলাম সেবা কাকে বলে। ওঁর নিজের শরীর একেবারেই ভালো ছিল না। স্বামী মারা যাবার পর থেকেই ডায়াবেটিস-এ ভুগছিলেন, তার ওপর হার্ট-এর অসুখও ছিল। আমি একদিন লজ্জায় পড়ে বলেছিলাম, 'মা, তোমার শরীরও তো ভালো না, একজন সেবিকা রাখলে হয় না?' গম্ভীরভাবে বলেছিলেন, 'কোনও দরকার নেই, আমার কিছু হবে না।' ওঁর অক্লান্ত সেবায় সত্যিই ভাল হয়ে উঠলাম।

এই সময় আমার স্বামীর আপিস **D.J.Keymer** থেকে ওঁকে বিলেতে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিল। আমার শাশুড়ি জোর করে আমাকে ওঁর সঙ্গে পাঠালেন। বললেন, 'তুমি না গেলে মাণিকের দেখাশোনা কে করবে।' এটা খুবই সত্যি কথা, কারণ আমার স্বামী কাজে-কর্মে যতই বড় হোন না কেন, জীবনধারণের জন্য যা কিছু প্রয়োজন সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্ভর করতেন ওঁর মার ওপর, এবং আমি আসার পর সেই ভার আমি গ্রহণ করেছিলাম।

ছ'মাস বিদেশ ঘুরে দেশে ফিরলাম। মা-র শরীর খুব ভালো যাচ্ছিল না। এর কিছুদিন পরই উনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হন, আন্ত্রিক টি.বি.। ওষুধ বেশ কিছুদিন থেকেই বেরিয়েছিল, কিন্তু ওঁর অন্যান্য অসুখের জন্য ক্রমশঃ খারাপের দিকে যেতে থাকে। বহুদিন ভোগার পর খানিকটা নিজের মনের জোরে ভালো হয়ে উঠলেন।

বিলেতে থাকাকালীন আমার স্বামী চিত্র-পরিচালক হবার বাসনা মনে মনে পোষণ করছিলেন। 'পথের পাঁচালী'-র ছোটদের সংস্করণের জন্য ছবি আঁকতে আঁকতে ঠিক করলেন এটাই হবে ওঁর প্রথম ছবি। **D.J.Keymer**-এ ৭৫ টাকা মাইনে থেকে ধাপে ধাপে উঠে শীঘ্রই আর্ট ডাইরেক্টর হয়ে ২,০০০ টাকা মাইনে পাচ্ছিলেন। পথের পাঁচালীর ইতিহাস সবাই জানেন। চাকরি তখনও ছাড়েননি—ছুটির দিনে শুটিং হ'ত। মা ঘোর আপত্তি তুলেছিলেন। এত ভালো চাকরি ছেড়ে ছেলে কোন অজানার উদ্দেশ্যে পা বাড়াচ্ছেন, এটা তাঁর একেবারেই মনঃপূত হচ্ছিল না। টাকার অভাবে যখন শুটিং বন্ধ হয়ে গেল তখন মা-ই তার সুরাহা করার ব্যবস্থা করলেন। তখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন বিধানচন্দ্র রায়। শ্রীযুক্তা বেলা সেন বিধান রায়ের অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী ছিলেন। বিধান রায়কে উনি 'দাদা' বলে ডাকতেন। ওঁর সঙ্গে আমাদের খুবই আলাপ ছিল। ওঁর বড় মেয়ে অর্চনার সঙ্গে এক কলেজে পড়েছি। আমার শাশুড়িকে বেলামাসি খুবই ভালবাসতেন, 'টুলুদি' বলে ডাকতেন। ওঁর কথা প্রথমেই মা'র মনে হয় এবং সোজা ওঁর কাছে গিয়ে অনুরোধ করেন বিধান রায়কে বলে পশ্চিমবঙ্গের সরকার এই ছবি শেষ করার ব্যয়ভার গ্রহণ করলে ওঁর পুত্র এই বিপদ থেকে মুক্তি পায়। 'টুলুদি'-র অনুরোধ বেলামাসি উপেক্ষা করতে পারেন না। এক কথায় বিধান রায় বেলা সেনের কথায় রাজি হয়ে যান।

'পথের পাঁচালী'-র সমাপ্তির পেছনে বেলামাসির যে কত বড় অবদান এ কথা অনেকেই জানেন না—এবং সেই সঙ্গে আমার শাশুড়ির অবদানও কম নয়—কারণ বেলামাসির কথা ওঁরই মনে হয়েছিল, আমাদের নয়।

১৯৫৩ সালের ৮ই সেপ্টেম্বরে আমার পুত্রের জন্ম হয়। ওকে কোলে জড়িয়ে ধরে সজল চোখে মা বললেন, 'ওকে দেখব এবং সেবা করব বলেই আমি বেঁচে উঠেছিলাম।' বাইরে থেকে ওঁকে শুরু গম্ভীর মানুষ মনে হলেও ইংরেজিতে যাকে বলে 'সেন্স অফ হিউমার' সেটা তো ছিলই এবং ছিল প্রাণখোলা হাসি। নিজের ছেলেকে কড়া শাসনে মানুষ করেছিলেন বটে, কিন্তু নাতির বেলা প্রাণের মায়া, মমতা এবং ভালোবাসা উজাড় করে ঢেলে দিলেন। নাতি হ'ল ওঁর 'দাদাভাই' এবং আমার ছেলেও ওঁকে 'দাদাভাই' বলেই ডাকত। কেউ ওকে বকতে পারবে না, ওর গায়ে হাত তুলতে পারবে না, শাসন তো দূরের কথা। এরপর যতদিন বেঁচেছিলেন নাতি ছিল ওঁর চোখের মণি। আমার ছেলের সবই ভালো কিন্তু সারারাত কাঁদত। এরকম রাত-কাঁদুনে ছেলেকে নিয়ে ভারি বিপদে পড়েছিলাম। আমার স্বামীর সারাদিন আফিসের কাজ, ছুটির দিন শুটিং, কাজেই রাত্রে ভালো ঘুমের প্রয়োজন। আমার পুত্র অবশ্য তখন একেবারেই শিশু, মাসখানেক বয়স হবে। রাত্রে ওর কান্না শুরু হলেই তাড়াতাড়ি কোলে তুলে আমাদের লেক অ্যাভিনিউ-এর বাড়ির লম্বা বারান্দায় ওকে নিয়ে পায়চারি করতাম—তখন চুপ করে যেত, কিন্তু শোওয়াতে গেলেই আবার কেঁদে উঠত। ফলে

সারারাত আমারও ঘুম হ'ত না। সারাদিন ও কিন্তু কোনও গণ্ডোগোল করত না। মা কিছুদিন ওটা লক্ষ্য করলেন, তারপর একদিন সকালে আমাকে এসে খুব দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে বল্লেন, 'মা মণি, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।' মা-র গলায় এরকম নরম সুর আগে কখনও শুনিনি। উনি আমাকে আজ্ঞা করতেন, হুকুম দিতেন, এবং আমি সব সময়ই মেনে নিতাম, কিন্তু হঠাৎ এ কি পরিবর্তন? আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি কথা মা?' একটু যেন ভয়ে ভয়েই বল্লেন, 'তুমি তো জান আমার ইনসোমনিয়া আছে, রাত্রে ঘুম হয় না। তুমি সারারাত ওকে কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়াও এতে তোমার শরীর খারাপ হয়ে যাবে, কারণ সারাদিন ছেলেকে নিয়ে তো তোমার কম ধকল যায় না।' ধকল অবশ্য ওঁরও কম যেত না। নাতির পিছনে আমার চেয়ে বেশি ছাড়া কম সময় ব্যয় করতেন না। তারপর বললেন, 'রাত্রে ও যদি আমার কাছে শোয় তা হলে কি তোমার কোনও আপত্তি আছে? আমার কিন্তু কোনও অসুবিধা হবে না।' আমি অবাক বিস্ময়ে দেখলাম উনি আমার কাছে ভিক্ষে চাইছেন। আমার চোখে জল এসে গেল। আমি তৎক্ষণাৎ আমার পুত্রকে ওঁর হাতে তুলে দিলাম। বললাম, 'আমাকে বাঁচালে মা, এবার থেকে রাত্রে একটু ঘুমোতে পারব।'

সেই থেকে মৃত্যুর কিছুদিন আগে পর্যন্ত নাতি তার ঠাকুরমার কাছে শুয়েছে। কোনও কারণে অসুস্থ হলে অবশ্য আমরা দু'জনেই ওর পাশে থাকতাম।

১৯৬০ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে আমার স্বামী ওঁর উপর একটি তথ্যচিত্র করতে আরম্ভ করলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এত নিকট সম্পর্ক ছিল মা-র যে, এই ছবির জন্য তিনি প্রাণপণ ছেলেকে উৎসাহিত এবং সাহায্য করেছিলেন। তাতে যে গান গাওয়া হয়েছিল তার মহড়া আমাদের বাড়িতে রোজ চলত। মা আমাদের সকলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে মহা আনন্দে যোগ দিতেন। আমার পুত্রের তখন ছ'বছর বয়স, কিন্তু তখন থেকেই ভারি সুন্দর গলা ছিল ওর—আমাদের সঙ্গে ও-ও গাইত আর মা-র বুকটা দশ হাত ফুলে উঠত—বলতেন, 'দেখেছ, বংশের ধারা পেয়েছে ও।'

একদিন রিহার্সাল-এর পর, আমার স্বামীর ঘরে ওঁর গানের খাতা ফেলে এসেছিলেন বলে আনতে গেছেন, ঘরে ঢুকেই দাঁড়ানো অবস্থায় অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে পড়ে গেলেন। ৫-৭ সেকেণ্ডের মধ্যেই জ্ঞান ফিরে এল—অবাক হয়ে বল্লেন, 'একি আমি এখানে পড়ে কেন?' অনেকে ছিল বলে সহজেই ওঁকে সাবধানে তুলে ওঁর খাটে শুইয়ে দেওয়া হ'ল। এর পর থেকে থেকেই অজ্ঞান হয়ে যেতেন, আবার জ্ঞান ফিরে আসত। তখন কথায় কথায় হাসপাতাল বা নার্সিংহোম নিয়ে যাবার রেওয়াজ ছিল না। হার্ট বিশেষজ্ঞ পরীক্ষা করে বল্লেন, 'হার্ট-ব্লক' বাড়িতেই এখন এর সহজ চিকিৎসা আছে, একটা পেসমেকার বসিয়ে দিলেই হ'ল। তখনও এ জিনিস বেরোয়নি। ড্রিপ এবং আর যা সব ব্যবস্থা হয়েছিল সেই নিয়েও নাতির সঙ্গে ঠাট্টা-তামাসা চলত। আমার ছেলে ঘুরে ফিরেই ওঁর ঘরে ঢুকত, তখন ওর সাত বছর বয়স। ওকে দেখে হেসে বলতেন, 'দেখেছ দাদাভাই, আমার কেমন একটা নতুন খেলনা এনেছে।'

বেশিদিন ভোগেননি। বিছানায় শুয়েছিলেন মাত্র সাত দিন। ১৯৬০ সালে ২৭ শে নভেম্বর রাত ২.৩০ নাগাদ সেই যে অজ্ঞান হলেন, আর উঠলেন না। অবশ্য মৃত্যুর আগে পুত্রের বিশ্বজোড়া যশ, মান, খ্যাতি দেখে যেতে পেরেছিলেন বলে আনন্দ হয়। ভেনিস-এর গোল্ডেন লায়ন অফ সেন্ট মার্ক ছাড়াও আরও বহু পুরস্কার উনি দেখে যেতে পেরেছিলেন। পুত্রের গরবে গরবিণী মাতা পুত্রের সম্বন্ধে যা কিছু লেখা বের হ'ত একটা বিরাট স্ক্র্যাপবুক-এ সযত্নে কেটে লাগিয়ে রাখতেন। সে খাতা এখনও আছে।

দুঃখ হয় ভেবে, রবীন্দ্রনাথের ওপর যে অসামান্য তথ্যচিত্র ১৯৬১ সালে রিলিজ করল, সেটা দেখে যেতে পারলেন না।

সত্যজিৎ রায়ের ক্যালিগ্রাফি

প্রণব মুখোপাধ্যায় ও সৌম্যেন পাল

একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবে অক্ষর শুধু উচ্চারণের চিহ্নই নয়, এর নিজস্ব একটা ছবি আছে। এই ছবি আমরা দেখতে পাই বলেই মজা করে মধ্যণ্য ষ-কে বলি পেট কাটা ষ; ঝ-কে বলি হাত তোলা ঝ; ঞ-কে বলি পিঠে পুঁটলি ঞ; কিংবা আবার দ-কে বলি হাড়গোড় ভাঙ্গা দ। তিনকোনা দ্বীপের নাম দেওয়া হয়েছে ব দ্বীপ। এগুলো হরফের নিজস্ব চেহারার পরিচয়। একটু তলিয়ে দেখলেই জানা যায় আদিম হরফের গোড়ার কথা ছবিই। হরফ এসেছে ছবির বিবর্তনের পথ ধরেই। আদিম যুগে ছবি এঁকে কথা বোঝানো হত। তাকে বলে চিত্রলিপি। সুন্দর করে ধৈর্য্য ধরে ছবি এঁকে সব কিছু বোঝানো দিনকে দিন অসম্ভব হয়ে পড়ল। আর তাই ছবির ধাঁচ সরল হতে হতে অক্ষরে এসে ঠেকল। কথা বলার ভাষার মাধ্যম আওয়াজ, অর্থাৎ অক্ষরের উচ্চারণ। তবু অক্ষর তো সেই ছবির মত দাগ কেটেই করতে হয়; এক এক রকম চেহারা ফোটে সে সব দাগে। তাই অক্ষর আসলে ছবিই। এই অক্ষর বা হরফের চেহারা যখন চিত্রশিল্পের সামগ্রী, নানা রঙে নানা ঢঙে, তখন তাকে বলা হয় ক্যালিগ্রাফি। বাংলায়, অক্ষর-শিল্প। অক্ষর তখন শুধু কথা বলে না, তার চেহারা আলাদা বৈশিষ্ট পায়।

সত্যজিৎ রায় ছিলেন একজন বড় মাপের ক্যালিগ্রাফিস্ট। তাঁর উদ্ভাবনী মন আর চোখ বাংলা বর্ণমালার ভাণ্ডারে নানা চেহারার সন্ধানে ব্যাপৃত থেকেছে, তুলির টানে তাদের নানা ভাবে ধরেছে। সিনেমা, ছবি, গল্প ছাড়াও তাঁর ক্যালিগ্রাফির জগৎটাও বেশ বড়-সড়। অক্ষর নানান ভাবে নানান ব্যঞ্জনা পেয়েছে সে জগতে। আমাদের উপলব্ধির নতুন দরজা খুলে গেছে।

লক্ষ্য কর নবপর্যায়ের গোড়ার দিককার 'সন্দেশে' গৌরী ধর্মপালের গল্পের একটি নামলিপি, 'কাকে পেঁচায়'। পঞ্চতন্ত্রের গল্প। সত্যজিৎ রায় অক্ষরে দেবনাগরী হরফের আভাষ দিলেন। অথচ পুরোটাই বাংলা। এই আভাষ আনা হয়েছে পঞ্চতন্ত্রের প্রাচীনত্বকে প্রতিষ্ঠা দিতে। মূল পঞ্চতন্ত্র তো সংস্কৃতেই লেখা। এই ভাবে হরফের চেহারাকে ব্যবহার করে অন্য মাত্রা আনা যায় যা রচনার বিষয়বস্তুর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মেশে। এই নব-পর্যায়ের প্রথম দিকে সন্দেশের মলাটটি লক্ষ্য কর। একটা সং 'সন্দেশ' লেখাটির ঘাড়ে চেপে কসরৎ দেখাচ্ছে। লেখার হরফগুলি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে ওগুলো দিয়ে একটা ঠ্যাং তোলা ঘোড়ার আদল আনা হয়েছে। এই ভাবেই আর একটি মলাটে একটা হাতিকে পাচ্ছি। অক্ষরের চেহারা নিয়ে নানারকম সৃষ্টির এই খেলাও ক্যালিগ্রাফি।

চাকরি জীবনে বিজ্ঞাপন শিল্পে হাত পাকাতে এসে সত্যজিতের

শিক্ষানবিশী। বস্তুতঃ, এই বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কাছেই সত্যজিতের তুলি আর ব্রাশ নানান বিভঙ্গে ধরল অক্ষরকে। বাংলা ক্যালিগ্রাফির জগৎ নিঃসন্দেহে এক নতুন বাঁক নিল। পরবর্তী কালে 'সিগনেট প্রেস-এর বইয়ের মলাটে দেখি সেই শিল্পেরই আশ্চর্য বিকাশ।

সত্যজিৎ রায়ের করা মলাটের ছবি আর ক্যালিগ্রাফি 'সিগনেট প্রেস'-এর বইয়ে এঁকে দিল স্বাতন্ত্রের স্পষ্ট চিহ্ন। অবনীন্দ্রনাথের 'শকুন্তলা' নাম লিপিটি যেন গাছ কাটা সব ডাল। অরণ্য আর তপোবনের প্রাণের প্রতীক। অথচ সে অরণ্যে থাকেন কিছু মানুষজন, আশ্রমবাসী। তাঁরা বৃক্ষ নির্ভর। সজ্জিত কাটা ডালগুলি যেন তাঁদের

এই ক্যালিগ্রাফি চর্চা পূর্ণমাত্রায় শুরু হয়েছিল। তার আগে শান্তিনিকেতনে নন্দলাল বসুর নিবিড় সান্নিধ্য, দেশজ শিল্পের নাড়ীর টানে তুলি আর রঙের কত না আঁকি বুঁকি। তারপর শিল্পী বিনোদবিহারীর ধ্যানধারণার জগতে সেই রং তুলির আর এক
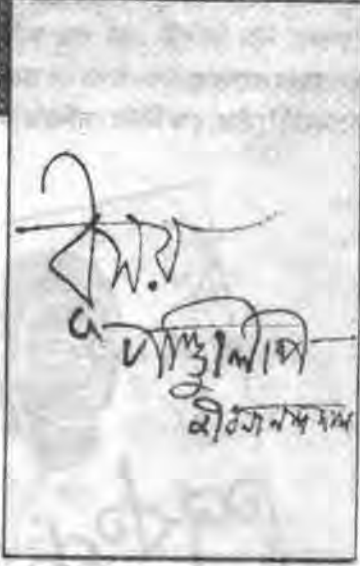
অস্তিত্বকেই জানান দিচ্ছে। প্রচ্ছদ আর নামলিপি বইয়ের বিষয়বস্তুর সঙ্গে মিলে মিশে যায়। দেশজ শিল্পের সঙ্গে যে নাড়ীর বন্ধনের কথা বলছিলাম তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তের 'পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর প্রচ্ছদ। নামাঙ্কনে নামাবলীর হরফ ব্যবহার করে রামকৃষ্ণের জীবনের আধ্যাত্মিকতাটি সহজেই ধরে দিলেন পাঠকমনে। পুরো মলাটটি মেলে ধরো, মনে হবে যেন বইয়ের অন্তরের ভক্তিরসে আর্দ্র হয়ে আছে সেটা। বাঙালি সংস্কৃতির শিল্পকৃতীর আরো কয়েকটি নমুনা লক্ষ্য কর সত্যজিতের ক্যালিগ্রাফিতে। জীবনানন্দ দাশের 'রূপসী বাংলা' কিংবা বিষ্ণু দের 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার'। নামাঙ্কনে রয়েছে বাংলার পটশিল্পের আদল। প্রাচীন কালে ছবির পটে লেখার আদলটি ছিল এই রকম। যুগে যুগে শিল্প সাহিত্যের প্রকাশ ও ভঙ্গিমা যেমন বদল হয়, হস্তলিপিও তেমনি বদলায়। (এই কারণেই 'চারুলতা'য় অমলের ভূমিকায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে অভ্যাস করে নিতে হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের হাতের লেখার স্টাইল।) লেখার সামগ্রীর উপরও হয়ত কিছুটা নির্ভরশীল এই পরিবর্তন। দাগকাটার কাঠি, পাখির পালক, নিবের কলম, ফাউন্টেন পেন, বল পেন, আর দাগ ধরার মাটি, গাছের ছাল, ভূর্জপত্র, প্যাপিরাস—এইসব নানা মাধ্যমের উপর নির্ভর করে ফুটে ওঠে এক এক রকম ধাঁচ। (মাটির উপর বেশি আঁকা বাঁকা কারিকুরির অসুবিধা বলে সোজা, কোনাচে হরফের ব্যবহার বেশি হত। সে হরফের নকলে প্রাচীন সুমেরীয় অক্ষরে এল কোনাচে ভাব।) আমাদের দেশজ পটলিপির ঐতিহ্যকে মূর্ত করলেন সত্যজিৎ তাঁর ক্যালিগ্রাফির পরীক্ষা-নিরীক্ষায়।

বিষ্ণু দের আরেকটি বইয়ের নাম 'মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য জিজ্ঞাসা'। নামাঙ্কনটি খড়ির দাগের মত। অক্ষরে শ্রেণীকক্ষের হস্তাক্ষরের ইঙ্গিত মনে করিয়ে দিচ্ছে এটা গভীর অধ্যয়ন ও অন্বেষার বিষয়। জীবনানন্দের আর একটি বইয়ের প্রচ্ছদের কথা ধরা যাক। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'। যেন কোন পাণ্ডুলিপির পাতায় লেখকেরই হস্তাক্ষর। অসীম সোম সম্পাদিত 'চলচ্চিত্র কথা'র নামাঙ্কনটি অতি সরলতার মাঝেও পাঠকমনে আলোড়ন তোলে কারণ একটু মনোনিবেশ করলেই বোঝা যায় কাগজ থেকে কলম না তুলে একটানে কথাটি অক্ষরের প্যাঁচ খেয়ে নেমে গেছে ক্যামেরার খোপে। ফিল্ম রীলের এক নিরবিচ্ছিন্ন চলমানতা প্রকাশ পাচ্ছে নামের অক্ষরে। লীলা মজুমদারের 'মাকু' প্রচ্ছদটি দেখেছ নিশ্চয়ই। প্রথম দর্শনে ওটা লেখা মনেই হয় না। ঠিক যেন গল্পের কলের পুতুলটি। একটু মনোযোগ দিলেই ফুটে ওঠে অক্ষর দুটি। সত্যজিতের নিজের লেখা গল্পের বই 'আরো বারো'র প্রচ্ছদটি বাংলা না-জানা কেউ দেখলে ভেবে বসবে সবুজ প্রান্তরে উড়ে যাচ্ছে একটা সাদা সরু ফিতের ফালি। কিংবা যেন একটি সাদা কাগজের মালা হাওয়ার
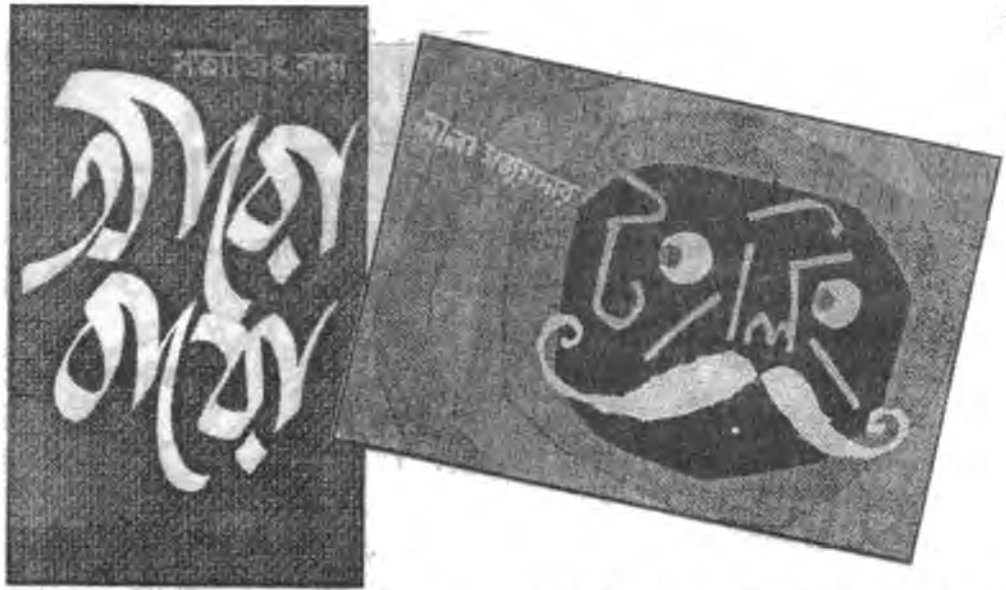
খেয়ালী স্রোতের ধাক্কায় বেঁকে চুরে শূন্যে এক অপরূপ আল্পনা সৃষ্টি করেছে। লীলা মজুমদারের 'টং লিং' এও প্রথমে ধন্দে পড়তে হয়—এটা মুখাবয়ব না নামাঙ্কন? 'ং' এর কায়দাগুলো এমন যেন তা নাকের দুপাশে মুখের ভাঁজ। আবার 'সন্দেশে' এ গল্পটি ধারাবাহিক প্রকাশের সময় হেডপিসের অক্ষরে ছিল রেলগাড়ির চেহারা। ছুটন্ত মালগাড়ি সুবেলা রেশ রেখে যাচ্ছে টংলিং টংলিং করে। 'পঞ্চুলাল'-এর কথাই ধর না। 'পিনোচ্চিও'—লম্বা নেকো পুতুলের অনুবাদ গল্প, প্রিয়ংবদা দেবীর লেখা। কুঠারের 'প' মনে করিয়ে দেয় পঞ্চুলালের আসল পরিচয়। সে কাঠুরের হাতে তৈরি; কাঠ থেকে তার জন্ম, কাঠুরে তার বাপ। সত্যজিতের ক্যালিগ্রাফির এসব বহুবিচিত্র দিক।

'এক্ষণ' পত্রিকাটির কথা না বললে শুধু সত্যজিতের কথা কেন, ক্যালিগ্রাফির আলোচনাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত এই পত্রিকাটির প্রচ্ছদ এঁকে দিতেন সত্যজিৎ রায়। সেগুলোও আছে ক্যালিগ্রাফির নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা।

'এক্ষণ'—এই তিনটি বাংলা অক্ষর নিয়ে তাঁর ভাঙ্গাগড়ার অন্ত নেই। কতভাবে এদের চেহারায় কল্পনা ও আবিষ্কারের রং লাগানো যায় তারই খেলায় তাঁর তুলি কলম ব্রাশ খেলা করেছে। কখনও এই তিনটি অক্ষর ক্যালিডোস্কোপের ভিতরকার তিনকোনা কাঁচের টুকরো। নাড়া খেয়ে যেন 'এক্ষণ'-এর চেহারা নিয়েছে। আবার কখনো তারা
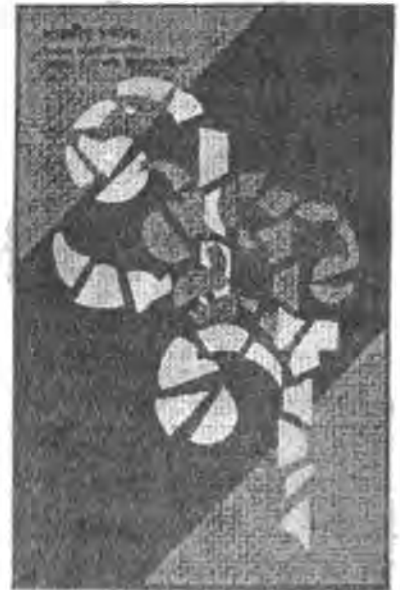
প্রাচীন শিলালিপি, পাথরের গায়ে খোদিত। যেন এক প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের চিহ্ন। পাথরটিকে যেন ভগ্নদশা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। 'ণ' এর অনেকটা অংশই কালের গর্ভে বিলীন। পত্রিকাটি তো তার রুচি ও গভীরতায় শিলালিপিটির মতই ঐতিহাসিক সামগ্রীর মূল্য পেয়েছে। আবার দেখি জ্যামিতিক আকারে 'এক্ষণ'-কে দেখার ভঙ্গি। 'ক্ষ' সেখানে জ্যামিতির কত সরল একটি নক্সা। কখনও বা প্রচ্ছদ জুড়ে শুধু একটি মাদুর। বাংলা হস্তশিল্পের সামগ্রী। লোক সংস্কৃতির উপাদান। অতি ব্যবহারে কিছুটা ম্লান। তার রঙিন দেহ ঘসা খেয়ে সাদা হয়ে উঠেছে। আর সেই সাদা, রং-চটা অংশে ফুটে উঠেছে ঐ তিনটি অক্ষর। গ্রামজীবনের সঙ্গে যেন সম্পৃক্ত হয়েছে বাঙালির 'এক্ষণ'। এই কটি উদাহরণই যথেষ্ট নয়। শুধুমাত্র 'এক্ষণে'র প্রচ্ছদগুলিই ক্যালিগ্রাফির বড় গবেষণার বিষয় হতে পারে। এই প্রচ্ছদগুলি বাংলা ক্যালিগ্রাফির সম্পদ হয়ে আছে।

নানা সময়ে বইয়ের মলাটে, গল্পের হেডপিসে, তাঁর নিজের পোস্টারে এই ক্যালিগ্রাফির ছড়াছড়ি। দেখার চোখ খুলে গেলে তোমরা নিজেরাই সেগুলির মাঝে নানা সম্পদ খুঁজে পাবে। আর যদি শিল্পী হও তাহলে কোনটা কেমন তুলির টান, কোনটা ব্রাশের, কোনটা কি ধরনের কলমের বা নিবের, সে সবের অনুসন্ধানে আরো কৌতূহলী হতে পারবে।

মনে পড়ছে 'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি'-র রকেটের ধোঁয়ায় তৈরি অক্ষরগুলি? ধোঁয়া তার রেশটুকু রেখে যায়, প্রোফেসর শঙ্কুও রেশ রেখে যাচ্ছেন তাঁর ডায়রিতে। 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' বইয়ের প্রচ্ছদের লেখাটি স্বরলিপির মত উঠে যাচ্ছে বাঘার ঢোলের উপর থেকে। 'হীরকরাজার দেশে'-র পোস্টারে অক্ষরগুলি যেন ঝকঝকে পলকাটা হীরে গেঁথেই তৈরি। লক্ষ্য করতে বলি তাঁর 'নায়ক' ছায়াছবির পোস্টারটি। জীবনে অনেকটা পথ হাঁটার পর নায়ক একসময় খ্যাতি প্রতিপত্তি নিয়ে উজ্জ্বল তারকা হয়ে উঠেছে। দীর্ঘ 'ন' টি যেন সেই

Ray Roman

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890

(&$£.,:;-“”!?¢%/*)

BIZARRE

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890

(&$£.,:;“”'--!?¢%/')

Daphnis

aabcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890

(&$£:;“”-!?¢%/*)

পথযাত্রার ইঙ্গিত। বাকিটুকু জীবনের সংক্ষিপ্ত চেহারা। 'য়' এর ফুটকিটি ঝক্‌মকে তারা হয়ে জ্বলে আছে জীবনের একটি সময় মুহূর্তে, নায়কের পথচলার শেষ দিকে।

সত্যজিতের ক্যালিগ্রাফি ভাবনার অজস্রতার এগুলি কয়েকটি নমুনা মাত্র। এগুলি যদি তোমাদের আগ্রহকে জাগিয়ে তুলতে পারে তবে তোমাদের চোখ হবে অনুসন্ধানী। তোমরা তাঁর কাজের বিচিত্রতায় আর গভীরতায় মুগ্ধ হতে পারবে। বুঝতে পারবে 'আনন্দমেলা'-র অক্ষরগুলি কি ভাবে আনন্দের স্ফুরণ হয়ে উঠেছে, দেখতে পাবে কটি নিটোল বৃত্তের মাঝে বৃক্ষের আল্পনাটি—শুধু আল্পনা নয়, ওটি অক্ষরও বটে, যা বলে ওঠে 'নন্দন', কলকাতার বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও প্রেক্ষাগৃহটির নাম ও চিহ্ন, সত্যজিৎ রায়ের করা। এই আল্পনার প্রতি দুর্বার এক ঝোঁক ছিল তাঁর। 'এক্ষণ'-এর আরো একটি প্রচ্ছদে, 'দেবী' ছায়াচিত্রের পোস্টারে (ঈ-কারে চালচিত্রের ইঙ্গিত) এবং আরো অনেক অনেক জায়গায় তোমরা খুঁজে দেখে নিও সে সব আল্পনার অক্ষর।

শুধু বাংলায় নয়, সত্যজিৎ রায় ইংরাজি বর্ণমালার তিন ধরণের মুদ্রণ হরফ করেছিলেন। সে হরফে ইংরাজি লেখা ছাপা হয় বিদেশে। সেগুলির নাম দেওয়া হয়েছে **Ray Roman**, **Ray Bizarre**, এবং **Ray Daphnis**। শিল্পী পরিতোষ সেন একবার বলেছিলেন, যে পরিশ্রম আর যত্ন নিয়ে এগুলি করা হয়েছে তাতে তাঁকে শিল্পজগতের এক কাজমাতাল মানুষ আখ্যা দিতে হয়।

'যখন ছোট ছিলাম' বইটিতে একটি মজাদার খেলার কথা আছে। সত্যজিৎ তখন স্কুলে পড়েন। হেডমাষ্টার যোগেনবাবু একদিন ক্লাসে এসে বোর্ডে এক, দুই করে নয় অবধি কথায় লিখলেন। তারপর প্রতিটির কিছু অংশ মুছে মুছে কথা থেকে সংখ্যায় করে ফেললেন লেখাগুলি। অর্থাৎ সংখ্যার চেহারাগুলি আগে থেকেই লুকিয়েছিল

এক দুই তিন চার পাঁচ
ছয় সাত আট নয়

কথার অক্ষরে। ব্যাপারটি সামান্য মনে হতে পারে, কিন্তু সেদিনের কিশোর সত্যজিতের শিল্পী মনে বেশ দাগ কেটেছিল ঘটনাটি। নইলে এতকাল পরে এভাবে আত্মজীবনীর পাতায় এঁকে বুঝিয়ে দিতেন না খেলাটি। কে জানে, এই ঘটনায় অক্ষর নিয়ে আঁকিবুঁকির কোন ছোট্ট বীজ সত্যজিতের মনে বাসা বেঁধেছিল কিনা। অক্ষরকে দেখার চোখ নানান শাখায় তাই হয়ত পল্লবিত হল উত্তরকালে।

এক নম্বর গ্রাহক হওয়ার গল্প

দীপংকর বসু

ছোটবেলা থেকেই আমার 'ভীষণ' শখ ছিল, যে কোনও ব্যাপারেই হোক—একটা '১ নম্বর' যোগাড় করা; কোনও ক্লাবের ১নং মেম্বার, ব্যাঙ্কে ১নং অ্যাকাউন্ট—ঐরকম যাই হোক। এমন কি কেউ বিশ্বাস করবেনা—আমি নিজেই এখন করি না—লেখাপড়াতেও '১' হওয়ার প্রবল ইচ্ছে যে মোটেও হয়নি তা একেবারেই সত্যি নয়। ভাগ্যিস তা কখনও হইনি, এমন কি, উল্টো দিক থেকে ১ও নয়। সেখানে আমি চিরকাল 'মধ্যিখানে'। পরশুরামের 'চিকিৎসা সংকট' পড়েছ? নিরীহ নন্দবাবুকে কড়া মেজাজের হোমিও-ডাক্তার নেপালবাবু জিজ্ঞাসা করছেন—

'মাথা ধরে?'

'আজ্ঞে হাঁ।'

'বাঁ দিক?'

'আজ্ঞে হাঁ।'

'না ডান দিক?'

'আজ্ঞে হাঁ।'

(ধমকে) 'ঠিক করে বল—'

'আজ্ঞে মধ্যিখানে।'

কিন্তু সবটাতেই আমার প্রচণ্ড কুঁড়েমি। নতুন কোনও ক্লাবের ১নং মেম্বার হতে বা ব্যাঙ্কের নতুন ব্রাঞ্চে ১নং অ্যাকাউন্ট খুলতে যখন গেছি ততদিনে তা কয়েকশ নম্বর এগিয়ে গেছে। আর এই যে লেখাটা লিখছি এটার মতলব ছিল প্রায় কুড়ি বছর আগে।

তবু জীবনে একবার অন্তত জিৎ হল। ১৯৬১ সালে হঠাৎ একদিন দেখি কাগজে বিজ্ঞাপন—'সন্দেশ' আবার বেরবে, সত্যজিৎ রায় ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায়। সব কুঁড়েমি সরিয়ে রেখে সেদিনই সন্ধ্যায় হাজির হলুম ওদের লেক টেম্পল রোডের তিনতলায়, শুক্রবার ৩১ মার্চ ১৯৬১। কিন্তু বড় সম্পাদক তখনই বিশ্ববিখ্যাত, আর আমি সবে কলেজ ছেড়েছি, 'খুঁটি' নেই যে ফট করে তাঁর কাছে চলে যাব। আসলে এর একটা 'পশ্চাৎপট' ছিল। এই সুযোগে লিখে ফেলা যাক।

এই ঘটনার এক বছর আগে আমার দাদুর মৃত্যু হয়। 'দাদু' বলে ডাকলেও আসলে তিনি ছিলেন আমার মায়ের দাদু, মায়ের মায়ের বাবা। রাজশেখর বসু, বাংলা সাহিত্যের পরশুরাম। আমার দেড় বছর বয়স থেকে তাঁরই কাছে আমার বড় হওয়া—তাঁর মৃত্যুদিন পর্যন্ত, আমি তখন উনিশ। এখন থেকে ৫০ বছর আগে এমন

রাজশেখর বসু

কোনও বিখ্যাত ব্যক্তি পণ্ডিত সাহিত্যিক প্রায় ছিলেনই না যিনি বারবার অন্ততঃ একবার আমাদের বাড়িতে দাদুর কাছে আসেননি। আর জ্ঞান হয়ে ইস্তক যেখানে ছিল আমার অনিবার্য উপস্থিতি। 'জ্ঞান হওয়া' বা জন্মেরও আগে যাঁদের 'মিস' করেছি—একটা নাম বললেই হবে? স্বয়ং তিনিই। বিশ্বকবি। একবার। আর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বেশ কয়েকবার।

কিন্তু এসব সন্দেশে এক বছর ধরে লিখলেও কুলোবে না। আপাতত দরকার একদিনের কথা—২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩। তবে তার আগে দাদুর অন্ততঃ আর একটা কথা বলা দরকার।

দাদু সব সময় একটা সাধারণ লাইনটানা খাতা কাছে রাখতেন। তার বেশির ভাগেই তাঁর অসাধারণ হাতের লেখায় প্রত্যেক দিনের সংসার খরচ ও সবরকম আয় ব্যয়ের চুলচেরা হিসেব লেখা থাকত। আর কয়েক পাতা ছিল তাঁর ডায়েরি—যার একটা লাইন একটা দিন, দু'পাতায় মাস, ২৪ পাতায় বছর। ওই এক লাইনেই সরু পেনসিলে সংক্ষেপে লিখতেন সেদিন কে কে এল, বিশেষ কোথায় গেলেন, কোনও বিশেষ ঘটনা ইত্যাদি ছাড়াও আরও অনেক কিছু। কত রথী মহারথীর নাম তাতে পাওয়া যায়—পাশাপাশি অতি সাধারণ লোক আত্মীয় ইত্যাদিরও। অনেক বছরের এই খাতা এখনও আছে যা থেকে এই সব সাল তারিখ লিখছি আমি নিজেও চেষ্টা করেছি এই ধরণের খাতা রাখার। দাদুর মৃত্যুর পর থেকে— অর্থাৎ গত ৪১ বছর।

তা সেই ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩, শনিবার বিকেল। দোতলায় খবর এল এক ভদ্রলোক এসেছেন, ছোট স্লিপে পেনসিলে গোটা গোটা লেখা—সত্যজিৎ রায়। তিয়াত্তর বছর বয়স হলেও তখনও কেউ এলে দাদু নিচে নামতেন। তাঁর প্রাত্যহিক সঙ্গী, আমার 'নতুনদাদু'—তখনকার প্রখ্যাত চিত্রকর যতীন্দ্রকুমার সেনও। দুজনেই নামলেন। আমি ত অনিবার্যই। অতিদীর্ঘ দেহী ৩১-৩২ বছরের যুবকের তখন প্রধান পরিচয়—সুকুমার রায়ের ছেলে—মনে রাখা দরকার 'পথের পাঁচালী' তখনও দু বছর দূরে। তবে এদিক ওদিক বিজ্ঞাপন ও মলাট আঁকায় কিছু পরিচিতি আছে। দাদুকে বিনীত নিবেদন জানালেন, 'এবার পুজো-সংখ্যা আনন্দবাজারে আপনার যে গল্প বেরচ্ছে—'সরলাক্ষ হোম'— আমি তার ইলসস্ট্রেশন করতে চাই, আপনি ওদের একটু বলবেন?'

দাদুর এক কথায় উত্তর, 'বেশ, বলব। ওদের যা আর্টিস্টস্ ফি, তাও পাবেন।'

এবার একেবারে করজোড়ে, 'না আপনার গল্পের ছবির জন্যে আমি কিছুতেই পয়সা নিতে পারব না।'

দাদুর কিন্তু এ বিষয় কট্টর ব্রিটিশ মনোভাব, কাজ করলে তার যথোচিত ফি নিতেই হবে। ঠিক আটচল্লিশ বছর আগের কথা দৃশ্যটা মনের মধ্যে কিছুমাত্র বিবর্ণ হয়নি। কিছুক্ষণ কথা বলে উঠে চলে গেলেন—একটু চেয়ে থেকে দাদুর মন্তব্য—'সুকুমার রায়ের ছেলে খুব লম্বা।'

ফি অবশ্য নিয়েছিলেন। অনেকদিন পরে দাদুর কাছেই শুনেছিলুম, 'ও আনন্দবাজারের কাছ থেকে সরলাক্ষ হোমের পাণ্ডুলিপিটা ফি হিসেবে চেয়ে নিয়েছে।'

এই আমার প্রথম সত্যজিৎ দর্শন, যদিও কোনও কথা হয়নি ওঁর সঙ্গে। পরে বুঝেছি সেদিন তাঁর আসার দুটো উদ্দেশ্য ছিল— আনন্দবাজারে দাদুর গল্পে আঁকার সুপারিশ—আর তার চেয়ে বেশি —সেই ছুতোয় একবার 'রাজশেখর বাবু'র কাছে আসা—খুদে সন্দেশীরা যেমন পাগল হত বড় সম্পাদকের কাছে যাওয়ার জন্য। অন্ততঃ বয়সে ত সত্যিই খুদে ছিলেন দাদুর কাছে; একচল্লিশ বছরের ছোট। তাছাড়া দাদুর, দাদুর লেখার ও তাঁর বহুমুখী প্রতিভার প্রতি তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধার কথা প্রায় কেউই জানে না।

এর দু'বছর পরে পথের পাঁচালী। 'সুকুমার রায়ের ছেলে' রাতারাতি হয়ে উঠলেন বিশ্ব-চলচ্চিত্রের রশ্মি, 'রে'।

এর চার বছর পরের কথা। অপরাজিতর স্বর্ণ সিংহ তাঁকে আরও অনেক ওপরে নিয়ে গেছে। তৃতীয় ছবি 'জলসাঘর' করতে গিয়ে বিশেষ কারণে কয়েক মাস পিছিয়ে দিতে হয়। এই ফাঁকে দাদুর 'পরশ পাথর' করা ঠিক করলেন। আর তার জন্যে কয়েক মাসের মধ্যে ঠিক চারবার নিজে এলেন নানা কাগজপত্র নিয়ে—যা অনায়াসে লোক মারফত করা যেত। এও সেই একই ব্যাপার, যতবার পারা যায় দাদুর সান্নিধ্যে আসা। এবার আমার সঙ্গেও কিছু কথা হল, ভাব

'পরশ পাথর' ছবির বুকলেট

নতুন 'সন্দেশ'-এর প্রথম বিজ্ঞাপন।
দেশ। ১৮ চৈত্র, ১৩৬৭।

হয়ে গেল কুড়ি বছরের ছোট এক ভবিষ্যৎ ঘনিষ্ঠের সঙ্গে।

তার তিন বছর পরে দাদুর মৃত্যু ; এপ্রিল ১৯৬০। পরের বছর সন্দেশের বিজ্ঞাপন দেখেই এক বিশাল ব্যক্তিত্বের কাছে সোজা গিয়ে দাঁড়ানোর এই সুবিশাল পশ্চাৎপট। তবে উদ্দেশ্যটা কিশোরতর।

লেক টেম্পল রোডের ফ্ল্যাটে গিয়ে খবর দিতেই বেরিয়ে এলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন—সেখানেই কি সব কাজ করছেন। কিছু জলখাবারও এল। গ্রাহক হতে এসেছি শুনে বেশ বিপদে পড়লেন—এখনও কাগজপত্র বিল রসিদ কিছুই তৈরি হয়নি। আমি বললুম, 'সে পরে হবে, এখন এই রাখুন এক বছরের অগ্রিম চাঁদা'—নগদ ন টাকা। একটু কিন্তু কিন্তু করে রসিদ ছাড়াই টাকাটা রাখলেন।

তারপর উঠে গেলুম সত্যজিৎবাবুর বসার ঘরে। কয়েকজন বসে ছিলেন। উনি এলেন একটু পরে। 'চিনতে পারছেন?'

সেই বিরাট গলায় উত্তর, 'হ্যাঁ, দাড়ি রেখেছ, তবু পারছি।' ১৯৫৭-৫৮-এ আমি ক্লিন-শেভ্‌ড্—আর তখন ঘন কালো ফ্রেঞ্চকাট। সেই প্রথম গিয়েও একটু মজা করতে ছাড়িনি। বেশ বুঝছি কেন এসেছি বুঝতে পারছেন না, 'কি চাও' তাও বলতে পারছেন না।

একটু পরে হঠাৎ বললুম, 'তাহলে কি হবে?'

একটু ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ কি ব্যাপার বলত?'

'ওই যে সন্দেশ।' উনিও অথৈ জলে।

খানিকক্ষণ পরে উঠে পড়লুম। মাসখানেক পরে খামে করে এল ন'টাকার রসিদ—নং ১। তার কিছুদিন পরে 'প্রথম বর্ষ প্রথম

'মহাপুরুষ' ছবিতে নাম ভূমিকায় চারুপ্রকাশ ঘোষ

সংখ্যা'; মোড়কে গ্রাহক নং ১। দু'নম্বর ছিল আট বছরের সন্দীপ-বাবু, তিন নম্বর সুভাষপুত্রী কৃষ্ণকলি।

এক নম্বর গ্রাহক হওয়ার গল্প এখানেই শেষ। তবে সম্পাদক মশায়ের সঙ্গে তিরিশ বছরের ঘনিষ্ঠতার হৃদ্যতার শুরু এর পর লেক টেম্পল থেকে বিশপ লীফ্রয়, অসংখ্য-বার গেছি, আরও বেশি কথা হয়েছে ফোনে। বিশপ লীফ্রয়ে কতবার একলা ঘরে কথা হয়েছে, অথবা দু-চারজন অন্য লোকের মাঝে; আর অনেক দোসরা মে-র জন্মদিন উৎসবে হল-ভর্তি লোকের মধ্যে। দাদুর 'বিরিঞ্চি বাবা' নিয়ে আবার ছবি করলেন—'মহাপুরুষ' (১৯৬৫); এবার আমাকে ডেকে।

কিন্তু আবার এক মহাভারত হওয়ার উপক্রম হচ্ছে। চট করে কয়েকটা স্মরণীয় ঘটনা বলে দাঁড়ি টানছি—বিদ্যে বোঝাই হাঁড়ি হাটের মাঝে ফাটার আগে।

বার কয়েক সেই প্রথম গ্রাহক হতে যাওয়া নিয়ে মজা করেছি। 'আপনারা বিলক্ষণ মুশকিলে পড়েছিলেন।'

'হ্যাঁ তখন কিছুই তৈরি হয়নি, তুমি প্রথমদিনই এসে হতভম্ব করে দিয়েছিলে।'

দাদুর এত ভক্ত ছিলেন তবু দাদুর মৃত্যুর অনেক পরেও তাঁর অনেক অজানা প্রতিভার পরিচয় নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছি। চমকে যেতেন, 'এসবও উনি করতেন!'

সবচেয়ে স্তম্ভিত হয়েছিলেন একটা হাতের লেখার নমুনা দেখে। কিছুক্ষণের জন্যে সব কাজ ভুলে বেশ অন্যমনস্ক হয়ে রইলেন। একেবারে একলা ঘরে কথা বলার সময় অনেকবার আলোচনা হয়েছে তাঁরই ছবি নিয়ে। তবে তাতে অল্প একটু প্রশংসা করেই আরম্ভ করতুম, 'এটা হয়নি, ওখানটায় গণ্ডগোল আছে—ইত্যাদি।' তুমুল তর্ক হত। শেষে প্রায় প্রত্যেকবারই আমি জিতে যেতুম; মেনে নিতেন 'ঠিক বলেছ।' আর কয়েকবার অতি সূক্ষ্ম গোলমালের কথা তুললে গম্ভীর গলায় বলেছেন 'তুমি বুঝবে, আর কেউ ধরতে পারবে না।'

১৯৬০-৬১ থেকে আমি একটা অদ্ভুত জিনিস করতে পারি—খোলা মুখের সামনে দুহাতের তালি দিয়ে যে কোনও গানের সুর বাজানো। যাকে শুনিয়েছি অবাক হয়ে গেছে 'কি করে কর।' ঠিক কি করে হয় আমিও জানি না। শোনাব শোনাব করে হয়ে গেল একেবারে ১৯৯০। একলা ঘরে একদিন হঠাৎ বললুম, 'একটা জিনিস শোনাব, কিন্তু আগে সামনে নয়।'

আলমারির আড়ালে গিয়ে একটু করে বেরিয়ে এলুম। উনিও সেটা করছেন। অনভ্যস্ত হাতে হলেও। বললেন, 'এককালে কত করেছি।'

আমি বললুম 'কিন্তু কি করে করি তা ত জানি না।'

দুএকটা শব্দে বুঝিয়ে দিলেন 'ওই ত ভোকাল কর্ডটা নাড়িয়ে—।' তিরিশ বছরে প্রথম একজন অবাক হলেন না, নিজে করে দেখিয়ে দিলেন। প্রথম 'হারলুম'—সত্যজিৎ রায়ের কাছে।

আর কয়েকবারের অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল—ফ্ল্যাটে ঢুকতে গিয়ে দেখি আরও কয়েকজন দাঁড়িয়ে—নানান ধান্দায়। আমি চুপি চুপি জানিয়েছি, 'আমি কিন্তু এঁদের আনিনি।' গম্ভীর কিন্তু ভদ্র গলায় তাঁদের, 'এখন ভয়ানক ব্যস্ত, একদম সময় দিতে পারব না,' বলে বিদায় জানিয়ে দরজা বন্ধ করতেই আমার 'উৎকণ্ঠিত' প্রশ্ন, 'আমার জন্যে কতক্ষণ সময়?'

নির্লিপ্ত উত্তর, 'আরে বোসো বোসো, ওসব বলতে হয়।'

কেউ এলেও চলে যাবার সময় ওঁর নিজে দরজা খোলা ও বন্ধের কথা ত পৃথিবী-খ্যাত। রীতিমতন অস্বস্তি হত; সব বিষয়েই ওঁর কাছে আমি নিতান্তই ছেলেমানুষ: 'যাচ্ছি' বললেই উঠে আসবেন দরজা পর্যন্ত। তাই শেষ ক বছর বেশ বুঝিয়ে বলতুম, 'যাচ্ছি; দরজা টেনে দিয়ে যাব; আপনাকে উঠতে হবে না।'

স্মরণীয়তম ঘটনাটা দিয়ে শেষ করছি। হঠাৎ গেছি এক সন্ধ্যায়।

ঘর বন্ধ; বোধহয় কটিকটাল-এর সুর সৃষ্টি করছেন 'বাবু'র জন্যে। ওঁর লেখায় পড়েছি 'অনেকে আসেন, গল্প করতে করতেই কাজ করি। কেবল একটা সময় কাউকে ঘরে ঢুকতে দিই না, যখন আমি 'মিউজিক করি।'

সেইরকমই একটা সময়ে আমি হাজির। দেখাই হত না যদি কলে যাওয়ার জন্যে একবার বেরতেন। কয়েক সেকেণ্ড লাগল আমাকে দেখতে 'ওঃ তুমি!'

আমি বললুম 'পাঁচ মিনিটের জন্যে...।'

'আড়াই মিনিট।'

অনেকটা উলটো নীলাম ডাকার মতন বলে ঘরে নিয়ে গেলেন। বিরাট একটা সিনথেসাইজার, নানারকম তার, রেকর্ডার ইত্যাদি ছড়ানো। বাজানো আরম্ভ করলেন। 'আড়াই'টা পঁচিশ হয়ে গেল। আমারই অস্বস্তি হচ্ছিল, 'এবার উঠি।'

'আরে শোনই না এতে আরও কত রকম করা যায়।'

বাজিয়েই চলেছেন। আমার ফরমাশ মতনও শোনালেন 'চারুলতার থিম', বিঠোফেনের 'ফ্যুএর এলিজ'।

বেরিয়ে আসছি যখন, মাথা ঝিমঝিম করছে। এঁকে নিয়ে ত রবীন্দ্র সদনে একটা বাজনার 'একক সন্ধ্যা' করা যায়। কটা শো যে হাউস-ফুল হবে। তবু ত তখন তাঁর অসাধারণ গান গাওয়ার কথা জানি না। কেউ জানতেই পারল না তাঁর এই দিকটার পরিচয়। আর জানলেও—শুনল না ত।

২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩-র পর এবার ২৫ ডিসেম্বর ১৯৯১। অভ্যাস মতন হঠাৎই গেছি। একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে বসে পা দোলাচ্ছেন। মুখে হয় চশমার ডাঁটি নয় নির্ধূম পাইপ। বেশ গল্প জমল। শেষ হল ওঁর চোখের কথায়। অনেকক্ষণ ধরে বেশ গুছিয়ে বর্ণনা করলেন ওঁর সাম্প্রতিক চোখের গোলমাল; ডাক্তারের ভয় দেখানো, শেষে এক ইয়ং ডাক্তারের হাতে কয়েকদিনের মধ্যে অল-রাইট।

চলে আসছি যখন, তখন অবশ্য জানার কথা নয়—তিরিশ বছরের আসা যাওয়ার সেদিনই ইতি।

এক নম্বর গ্রাহক হওয়ার গল্পের নাম করে কত কি বকে গেলুম —আসলে কিছুই বললুম না। তবে এর 'নামকরণের সার্থকতা' কোথায়?

আসলে ওটা একটা 'বিন্দু' মাত্র। ওর পশ্চাৎ ও উত্তরপট— দুটোই অসীম। তাকে ধরাছোঁয়া যায় না। তুলে রেখে দিতে হয়।

১ নম্বর গ্রাহকের সঙ্গে সত্যজিৎ রায়

এক যে ছিল রাজা

আশিসকুমার মুখোপাধ্যায়

ছিল এক মহারাজা
রাজা ছিল খুব গুণী
গুণে মুগ্ধ পৃথিবী,
এসো তাঁর কথা শুনি।
মোটা লেন্সের ফাঁকে
কত কারুকাজ থাকে
গানে মাত করে গু-গা
দেখি অপু দুর্গাকে।

এক মহারাজা ছিল
তাঁর তুলনা যে তিনি
মিছে নয় একতিলও,
আছি তাঁর কাছে ঋণী।
ছবি আহা কী বাহার!
দেখে দুনিয়াটা আর
এ যে দ্যুতি মাণিকের
ঘরে এল অন্ধকার।

ছিল এক মহারাজা
হাতে ছিল রং তুলি,
আনে গল্পেও মজা
চেনা অক্ষরগুলি।
পড়ি শঙ্কু কাহিনী—
চিনি ফেলুদাকে চিনি
আছে তোপসে, জটায়ু,
ধাঁধা খিক্ খিনি খিনি।

এক মহারাজা ছিল
ছিল যাদু তাঁর গানে
এত উঁচু তাঁর মাথা
মাথা ঠেকে আশমানে।
কাজে কত তাঁর নাম
কেবা দিতে পারে দাম
বলি তাই মহারাজা
রাজা তোমাকে সেলাম।

সন্দেশের ধাঁধা হেঁয়ালি ইত্যাদি

সিদ্ধার্থ ঘোষ

বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যে 'সন্দেশ' অনেক কারণেই অনন্য। তারই মধ্যে পড়ে ধাঁধা, হেঁয়ালি, প্রতিযোগিতা প্রভৃতি বিভাগ যেখানে পাঠকদের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপিত হয়। প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে পাঠক পত্রিকার পরিচালকদের কাছের মানুষ হয়ে ওঠে।

'সন্দেশ'-এর আগে আর কোনও বাংলা পত্রিকায় ধাঁধা প্রকাশিত হয়নি তা অবশ্য নয়। 'সন্দেশ'-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক উপেন্দ্রকিশোর ছোটদের জন্য প্রথম কলম ধরেন 'সখা' পত্রিকার সম্পাদক প্রমদাচরণ সেনের উৎসাহে। ধর্মীয় ও নীতিশিক্ষামূলক ছোটদের পত্রিকার কথা বাদ দিলে 'সখা'-ই প্রথম সার্থক শিশু-কিশোর পত্রিকা। এই সখাতেই প্রথম কিশোরদের উপযোগী ধাঁধা প্রকাশ শুরু হয় নিয়মিত-ভাবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি 'সখা'য় প্রথম বাংলা কিশোর উপন্যাস ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। লেখক স্বয়ং প্রমদাচরণ। আরও লক্ষ্যণীয়, ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের পর উপেন্দ্রকিশোর ও প্রমদাচরণ একই বাড়িতে বাস করতেন। ৫০, সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট। এই বাড়িটিকে 'ব্রাহ্ম-কেল্লা' বলা হ'ত বলে লিখেছেন গগনচন্দ্র হোম। এই বাড়িতেই প্রতিষ্ঠিত হয় 'সখা'-কার্যালয়। সখার দ্বিতীয় সংখ্যা থেকেই উপেন্দ্রকিশোর পত্রিকাটির নিয়মিত লেখক।

১৮৮৩তে 'সখা' প্রকাশের বছর আড়াইয়ের মধ্যে অকালে মৃত্যু হয় প্রমদাচরণের। তারপরে শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রমদাচরণের ভাই অন্নদাচরণ ও নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য বিভিন্ন সময় 'সখা'র সম্পাদনা করেন। 'সখা' ও পরে 'সখা ও সাথী'র নিয়মিত লেখক ছিলেন উপেন্দ্রকিশোর।

সখার প্রথম সংখ্যা থেকেই আকর্ষণীয় ধাঁধা ও হেঁয়ালি প্রকাশ শুরু হয় এবং সঠিক উত্তরদাতাদের নামও ছাপা হ'ত। সখার প্রথম দুই সংখ্যায় প্রকাশিত কয়েকটি ধাঁধার পরিচয় দিচ্ছি এখানে। এর থেকে দুটো অনুমান সম্ভবত করা যায়। এক, 'সখা'র ধাঁধা বিভাগের বৈশিষ্ট্য পরবর্তী কালে 'সন্দেশ' বহন করেছে। দুই, ধাঁধা রচয়িতাদের নাম না থাকলেও 'সখা'র ধাঁধা বিভাগের সব-কিছুর পেছনে উপেন্দ্রকিশোরের উপস্থিতি সম্ভবত অস্বীকার করা যাবে না।

'সখা' : প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারি ১৮৮৩

১) নাক হাতে করিয়া খায় কে? (হাতী)

২) ।-।-।: খাইতে মিষ্ট, প্রত্যেক ড্যাশের জায়গায় একটি মাত্র অসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ বসাইতে পারিবে। বল তো কি জিনিস? (বাতাসা)

৩) এরূপভাবে কতকগুলি কথা স্থাপিত করা যায় যে লম্বার দিকে, চওড়ার দিকে—যেদিকে পড়িব একই কথা বসাইবে যথা : —

অ - তু - ল
। । ।
তু - মি - ও
। । ।
ল - ও - না

এইরূপে 'মদন' ও 'প্রমদা' এই দু'টি কথার দ্বারা এইরূপ চতুষ্কোণী বিভাগ পদ রচনা কর দেখি।

ম দ ন
। । ।
দ ম - ন
। । ।
ন - ন - দ

অথবা

ম দ ন
। । ।
দ শ - ম
। । ।
ন ম শ

প্র ম দা
। । ।
ম দ ন
। । ।
দা - ন ব

সখা: দ্বিতীয় সংখ্যা

নিম্নলিখিত অক্ষরগুলি যথাস্থানে বসাইয়া তাহাতে কি নাম হয় বাহির কর—

মালমদকওনধুইসূদ—ইনি অনেকগুলি খুব সুন্দর কবিতা লিখিয়াছেন। কেহ কেহ ইহাকে অতি উৎকৃষ্ট কবি, কেহ বা অতি নীচ রকমের কবি বলিয়া থাকেন। যাহা হউক, যখন ইনি মরিয়া গিয়াছেন তখন লোকের প্রশংসা বা নিন্দা ইঁহার কি করিবে? অতি গরীবভাবে ইঁহার মৃত্যু হয়।

(মাইকেল মধুসূদন দত্ত)

উপেন্দ্রকিশোর 'সখা'র সম্পাদকীয় নীতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন বলেই সন্দেশকে সখার চেয়ে আকর্ষণীয় করে তুলতে চেয়েছিলেন। এবং এ কাজে তাঁর বিশেষ সহায় হয়েছিল নিজের শিল্পীসত্তা ও মুদ্রণ বিষয়ে পাণ্ডিত্য। এমন ছবি ও লেখার সমাবেশ 'সন্দেশ'-এর পূর্ববর্তী কোনও বাংলা পত্রিকায় দেখা যায়নি।

'সন্দেশ'-এ প্রকাশিত ধাঁধার চরিত্র কিন্তু কয়েকটি কারণে বিশিষ্টতা অর্জন করেছিল। সরস, সচিত্র মৌলিক ধাঁধা—প্রথাগত হেঁয়ালির জায়গায় অন্য একটি মাত্র সংযোজন করে। ধাঁধার রচয়িতাদের নাম 'সন্দেশ'এ আজ অবধি উল্লেখ করার রেওয়াজ নেই। তবে তিন পর্যায়ের সন্দেশের সম্পাদকদের মধ্যে অনেকেই ধাঁধা বা হেঁয়ালি-চিত্র রচনা করেছেন। বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য প্রথম পর্যায়ের উপেন্দ্রকিশোর ও সুকুমার, দ্বিতীয় পর্যায়ে সুবিনয় রায় ও বর্তমান পর্যায়ে সত্যজিৎ রায়।

রায় পরিবারের বর্তমান প্রজন্মের প্রায় সবাই জানেন, সেই বিখ্যাত ধাঁধাটির কথা, যার রচয়িতা উপেন্দ্রকিশোর। আমি সত্যজিৎ রায়ের মুখে প্রথম সেই তথ্য জানতে পারি।

'ক্যারামারাহারাহাটা' অর্থ কি এই শব্দের? খুব সোজা—'কি আর আমার আহার আহা আটা'। এই সংস্কৃত ব্যাকরণ মাফিক সন্ধি স্থাপন করলে ওই অদ্ভুত শব্দটিই জন্ম নেবে। 'সন্দেশ'-এর প্রথম পর্যায়ে এই ধাঁধাটি প্রকাশিত হয়।

এখানে বলা দরকার যে শুধু পত্রিকার একটি বিভাগ পরিচালনার জন্যেই ধাঁধা বাঁধতেন না উপেন্দ্রকিশোর। তাঁর মানসের মধ্যেই একটা ধাঁধা হেঁয়ালি প্রীতি ছিল। ছেলে-মেয়েদের লেখা তাঁর বিভিন্ন চিঠিতে আমরা তাঁর এই মনোভাবের পরিচয় দেখি। প্রায়ই শব্দের বদলে ছবি বসিয়ে হেঁয়ালি চিঠি লিখেছেন তিনি। শুধু তাই নয়, তাঁর শিশুসাহিত্যের মধ্যেও এই হেঁয়ালিপ্রিয় মনটার বহু ছাপ আছে। একটা উদাহরণ শুধু তুলে ধরছি। টুনটুনির বইয়ের সেই বিখ্যাত দুষ্টু বাঘ। বোকা পণ্ডিতমশাই বাঘকে খাঁচা থেকে বার করে দেওয়ার পর তাকেই খেতে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত রক্ষা পান তিনি শিয়ালের বুদ্ধিতে। শিয়াল কি ভাবে কথার প্যাঁচে ভুলিয়ে (হেঁয়ালি বাক্যের সাহায্যে) বাঘকে আবার খাঁচায় পুরল সেটাই শোনাচ্ছি উপেন্দ্রকিশোরের ভাষায়—

ঠাকুরমশাই বললেন, 'বাঘ খাঁচার ভিতরে ছিল, আর আমি ব্রাহ্মণ পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম—'

এই কথা শুনেই শিয়াল বললে, 'এটা বড় শক্ত কথা হ'ল। সেই খাঁচা আর সেই পথ না দেখলে, আমি কিছুই বলতে পারব না।'

কাজেই সকলকে আবার সেই খাঁচার কাছে আসতে হ'ল। শিয়াল অনেকক্ষণ সেই খাঁচার চারধারে পায়চারি করে বললে, 'আচ্ছা, খাঁচা আর পথ বুঝতে পেরেছি। এখন কি হয়েছে, বলুন।'

ঠাকুরমশাই বললেন, 'বাঘ খাঁচার ভিতরে ছিল আর আমি ব্রাহ্মণ পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম।'

অমনি শিয়াল তাঁকে থামিয়ে দিল, 'দাঁড়ান, অত তাড়াতাড়ি করবেন না, আগে এটুকু বেশ করে বুঝে নিই। কি বললেন? বাঘ আপনার বামুন ছিল, আর পথটা খাঁচার ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল?'

এই কথা শুনে বাঘ হো হা করে হেসে বললে, 'দূর গাধা! বাঘ খাঁচার ভিতর ছিল আর বামুন পথ দিয়ে যাচ্ছিল।'

শিয়াল বলল, 'রোসো দেখি—বামুন খাঁচার ভিতর ছিল আর বাঘ পথ দিয়ে যাচ্ছিল?'

বাঘল বললে, 'আরে বোকা, তা নয়। বাঘ খাঁচার ভিতরে ছিল বামুন পথ দিয়ে যাচ্ছিল।'

শিয়াল বললে, 'এতো ভারি গোলমালের কথা হ'ল দেখছি। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। কি বললে? বাঘ বামুনের ভিতর ছিল আর খাঁচা পথ দিয়ে যাচ্ছিল?'

বাঘ বললে, 'এমন বোকা তো আর কোথাও দেখিনি! আরে, বাঘ ছিল খাঁচার ভিতরে আর বামুন যাচ্ছিল পথ দিয়ে।'

তখন শিয়াল মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললে, 'না! অত শক্ত কথা আমি বুঝতে পারব না।'

ততক্ষণে বাঘ রেগে গিয়েছে।

সে শিয়ালকে এক ধমক দিয়ে বললে, 'ও কথা তোকে বুঝতেই হবে! দেখ, আমি এই খাঁচার ভিতরে ছিলুম—দেখ— এই এমনি করে—'

বলতে-বলতে বাঘ খাঁচার ভিতরে গিয়ে ঢুকলে আর শিয়ালও অমনি খাঁচার দরজা বন্ধ করে হুড়কো এঁটে দিল।...

পিতার অকালমৃত্যুর পরে সন্দেশের সম্পাদক হলেন সুকুমার। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'তাঁর (সুকুমারের) স্বভাবের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির গাম্ভীর্য ছিল সেই জন্যেই তিনি তাঁর বৈপরীত্য এমন খেলাচ্ছলে দেখাতে পেরেছিলেন।' সুকুমার রায়ের মৃত্যুর অনেক পরে ১৯৪১-এ যখন 'পাগলা দাশু' প্রকাশিত হয় তখন তার ভূমিকায় এই কথাগুলি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। শুধু গল্প নয়, ধাঁধা, হেঁয়ালি রচনাতেও সুকুমার সমন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই কথাগুলি খাটে। মাত্র কয়েক সংখ্যা আগে সুকুমার রায়ের খেলার ছলে অঙ্ক ও শব্দ লোফা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে (জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪০৭)। পুনরুক্তি না করে বলি, টুনটুনির বইয়ের গল্পে যেমন উপেন্দ্রকিশোরের ধাঁধা-মনস্কতার পরিচয় আছে তেমনই আছে সুকুমারের গদ্যেও। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁর 'ভুল গল্প'। গল্প হিসাবে যেমন মজার তেমনই মজাদার ধাঁধা। গল্পের মধ্যে যত অসংগতি আছে খুঁজে বার করতে হবে। সন্দেশের পাঠকদের বলা হয়েছিল, কে-ক'টা ভুল বার করতে পারে জানানোর জন্য। আর এই সুকুমার রায়ের ভুল গল্পের খেই ধরেই আমরা যেন পরে পেলাম সত্যজিতের কিছু অনন্য সৃষ্টি—'ভুল ছবি'। লেখার
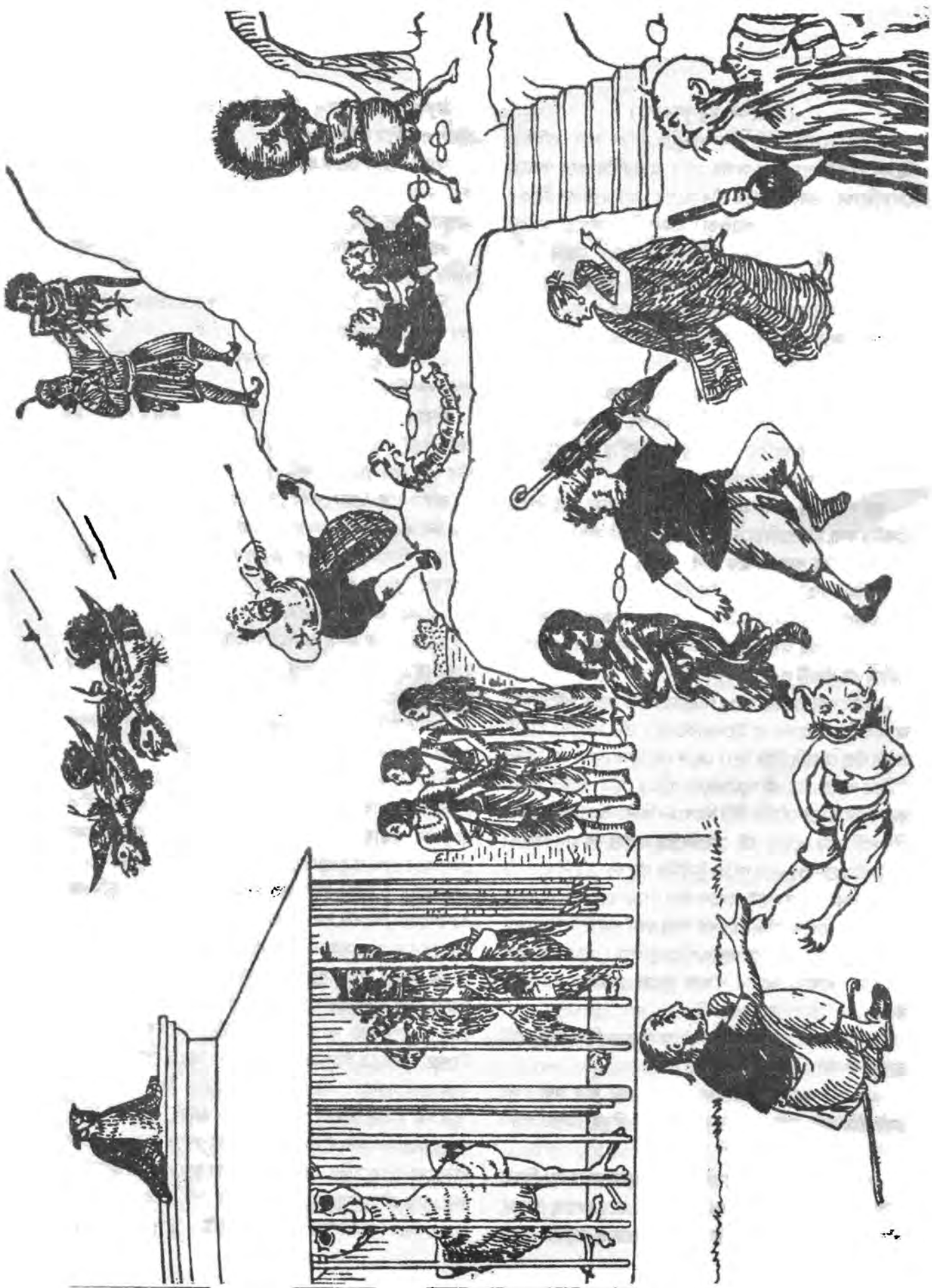
মধ্যের ভুল এবার ছড়িয়ে পড়ল ছবিতে। কিন্তু সত্যজিৎ প্রসঙ্গে আসার আগে রয়েছেন সুবিনয় রায়।

বাংলায় প্রথম ধাঁধার বইয়ের রচয়িতা সুবিনয় রায়। 'বল তো' নামে সেই বইটি দেখার সুযোগ হয়নি তবে সুবিমল ও পরে সুবিনয় ও সুধাবিন্দু সম্পাদিত সন্দেশে তাঁর ধাঁধা-প্রিয়তার বহু পরিচয় আছে। ধাঁধা ঘিরে গল্পও লিখেছেন তিনি। একটি বাচ্চার 'ফোল্লং' খাবার বায়নার রহস্যকে ঘিরেই তাঁর কাহিনী 'উন্মাদ রহস্য' এই সংখ্যাতেই পুনর্মুদ্রিত হ'ল।

আগেই লিখেছি যে, সুকুমার রায়ের 'ভুল গল্প' কি ভাবে সত্যজিতের হাতে 'ভুল ছবি' হয়ে সন্দেশের পাঠকদের মাতিয়ে তুলেছিল। উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার, সুবিনয়ের মতো সত্যজিৎও বিশেষ করে বেশ কিছু গোয়েন্দা গল্পের রহস্যজাল বুনেছেন শব্দ, কথা ও অর্থের মধ্যে ধাঁধা বাধিয়ে দিয়ে। ছোট্ট দুটি উদাহরণ— 'ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা' জমেছে এই সাংকেতিক ভাষার ভিত্তিতে : 'ত্রিনয়ন, ও ত্রিনয়ণ, একটু জিরো'।

'রয়েল বেঙ্গল রহস্য' ভেদ করতে হলে পাঠোদ্ধার করতে হবে এই ধাঁধার—

মুড়ো হয় বুড়ো গাছ
হাত গোন ভাত পাঁচ
দিক পাও ঠিক ঠিক জবাবে।
ফাল্গুন তাল জোড়
দুই মাঝে ভুই ফোড়
সন্ধানে ধান্দায় নবাবে।।

১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে 'সন্দেশ' প্রথম প্রকাশের পরে বর্তমান (তৃতীয়) পর্যায় শুরু হয় ১৯৬১তে। ধাঁধা হেঁয়ালি ইত্যাদির চরিত্রটি যে অপরিবর্তিত থাকে তারই সাক্ষ্য হিসেবে ১৯৬১-র 'সন্দেশ' থেকে একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

প্রথম সংখ্যা

প্রত্যেকটি দুই পংক্তির শেষে একই কথা বসাতে হবে—
উদাহরণ

হারুবাবু দেশে নাই গেছেন জাপান
মাসে মাস টাকাকড়ি পাঠান যা পান।
বড় ছেলে তাঁর ভুলু নামেতে
নাইকো খেয়াল, থাকে কোথায় ....।
মেজো ছেলে নাম লালু, বেজায়
মা বলেন, লোকজন লালুই ...।
ছোট খোকা নেচে নেচে বেড়ায় ...।
সারাদিন মেতে থাকে হাসিতে ...।
বড় বাড়ি, মেলা লোক, অনেক ...।
সদা শুনি হাঁক ডাক 'রুটি দে' ...।

(যেমন; যে মন; চালাক, চালাক ; বাগানে, বা গানে; চাকর, 'চা কর')

দ্বিতীয় সংখ্যা

মাথামুণ্ডু কিচ্ছুই নেই
থাকার মধ্যে গলা
ট্যাক্সো- দেওয়া বাক্স বাজে
খেলেই কানমলা।

(রেডিও)

তৃতীয় সংখ্যা

এই গুলো চটপট পড়ে ফেলো তো—

এলে খাপড় তেনাপার লেবুঝ বতুমিচা লাকন্দ ও।
ঘবায়ঙা ডারমীকু লেজ।
রবা কয় যায়লাতল বেড়ানে।

বর্তমান পর্যায়ের প্রথম বছরের তৃতীয় সংখ্যার এই ধাঁধাটি কিন্তু পুরনো 'সন্দেশ' থেকে গৃহীত। এ রকম বেশ কিছু ধাঁধা পুরনো সন্দেশ থেকে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে ১৯৬১তে নতুন করে সন্দেশ প্রকাশের প্রস্তুতিপর্বে সত্যজিৎ রায় খুব খুঁটিয়ে দেখেছিলেন বাবা ও ঠাকুর্দার হাতে 'সন্দেশ' নির্মান। এবার সত্যজিতের সৃষ্টি থেকে দু'টি শব্দছক সহ কিছু উদাহরণ। এরমধ্যে একটি শব্দছক অবশ্য বড়দের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

ছড়ার ধাঁধায় নিহিত এক একটি শব্দ। ছড়ার জট ছাড়িয়ে ওই শব্দ বের করে পূরণ করতে হবে 'শব্দছক'। ছড়ার সূত্রে 'শব্দছক' এই প্রথম।

সত্যজিৎ রায়
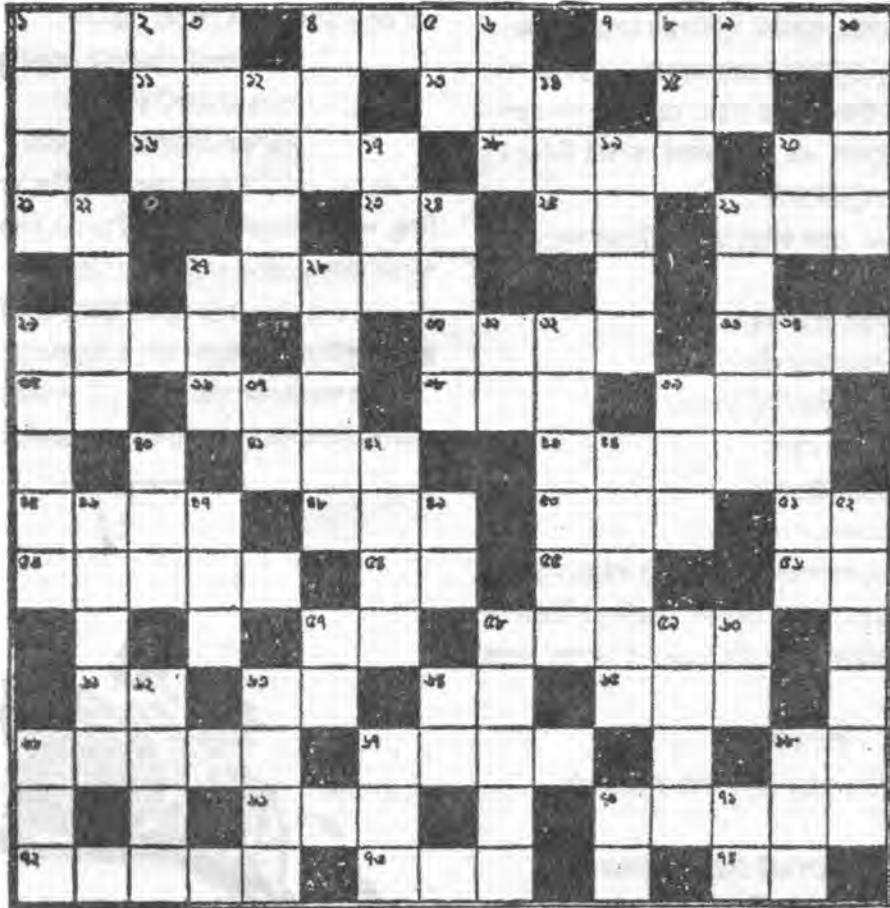
পাশাপাশি

১। এঁর কথা আর কত ভাবব—
মসী-ভৃত্য লেখে মহাকাব্য।

৪। চোখ বুজে খাদ্য নিলে
চাল ডাল তেল মিলে।

৭। মতি গতি বোঝা বড় ভার—
রাগ সংগীতের আগে চলে পত্রাধার।

১১। খুঁজিয়া দেখ সে মহা আক্রোশে
লুকায়ে রয়েছে তোমার মুখোশে।

১৩। দুই ভাগ সাহেবের টুকরা
দুই ভাগ সাহেবের মাথা
সব মিলে তিন ভাগ থেকে
শীতকালে ঝরে পড়ে পাতা।

১৫। সাহেবের গান জিভ দিয়ে ঝরে
পশ্চিমা নাম থাকে এর পরে।

১৬। সরঞ্জাম পেলে পরে হয় কেল্লা ফতে
আদি মধ্য অন্ত নিয়ে যাও আদালতে।

১৮। প্রথম ভাগে সাহেব ধরা
মধ্যতে তার মার্জার
শেষ ভাবে কাঠ ভাঙল বুঝি?
—চোখ রাঙানো দরকার।

২০। আর কোন গতি নাই,
লিখে ফেল, ক্ষতি নাই।

২১। শখের নাচন রিনিঝিনি
সাহেব বলেন কিনি কিনি।

—

২৩। বসন্তে তিলক কাটি
আলবোলা পরিপাটি।
২৫। পুরুষের সাথে আকাশে বাস
সময় হলেই সর্বনাশ।
২৬। সাহেবের টাকা করিও চূর্ণ
ওজন বলিলে তবে না পূর্ণ।
২৭। দুই হাতে যাওয়া—অতি
ধীর মন্থর গতি।
২৯। মহাসম্রাট বলি যারে সবে মানে
দেখ তার তিন ভাগ রহে গোরস্থানে।
৩০। ডাবে বসে বন্দী
কাহারা সুগন্ধী।
৩৩। পেট কেটে খোকা হয়
মাথা কেটে ভাত
লেজ কেটে মাথ নাও
মুখে বাজিমাত।
৩৫। উত্তর যদি মেলাতে চাও
এখানে হবে না সেখানে যাও।
৩৬। ইরানের অধিপতি অন্তরে বাস
চেয়ে দেখ চারিদিকে পড়ে আছে লাশ।
৩৮। বাঁশের সিঁড়িটা উল্টে দাও—
তাহলে যদি বা সময় পাও।
৩৯। গান গাও হিন্দির বাইরে
এত শোভা আর কোথা পাইরে।
৪১। আরো খাঁই? আরে সে কি...
উল্টে কত খা দেখি।
৪৩। খোকাকে ডাকা দরকার—
তাই বুঝি এই সংস্কার?
৪৫। জল খাবার এলো
তার অর্ধেক অসুর ব্যাটায় খেলো।
৪৮। নারীরূপ ধারণ করে
দুই ল-য়ে বারণ করে।
৫০। আদি অন্তে শক্তি রাখ
মাঝে আপসোস
মাথা ছেড়ে হাল ধর
গ্যাঁট হয়ে বোস।
৫১। চাঁদার ভাগ, গাছের ফল
বৃদ্ধাঙ্গুলি, এবার বল।
৫৩। সোজা উত্তর বল—
কোটাল দাদা বিগড়ে গিয়ে
লগন পার হল।
৫৪। চোখ গেল হায় হায়
মাছি দিয়ে খেলা যায়।

৫৫। শেষে বসে সেনমশাই
সুর সাধেন বাদশাহী।
৫৬। হিসেবটা কই?
জল থৈ থৈ।
৫৭। ওই দেখ পাক দিয়ে গাছে চড়ে
উলটিয়ে পাক ধরে খসে পড়ে।
৫৮। সা রে গা রে গা মা সাধা
আসর জমেছে দাদা।
৬১। হিন্দিওয়ালা বলে দুই
বাঙাল বলে থাক্—
চিচিং ফাঁক।
৬৩। প্রজাপতি
নিপুণ অতি
৬৪। সন্ধানী সূত্রধর
নৌকা গ্রহণ কর।
৬৫। জলজন্তু উল্টে কয়
র কিন্তু বেশি নয়।
৬৬। কামরা নিলে? আর কী বাকি?
এবার শুধু ডাকাডাকি।
৬৭। আসবাবপত্রের মাঝে
কোকিলের দেওয়া সাজে।
৬৮। যন্ত্র রাখ
সাহেব ডাক।
৬৯। যাও সম্রাটের খোঁজে
অথবা অবস্থা বোঝ।
৭০। পুরমধ্যে শ্বেতসৌধ শোভে চমৎকার
বরা ভজন-এর দেখ আশ্চর্য বিকার।
৭২। পুণ্যতীর্থ মায়াময়?
রূপকথা তাই কয়।
৭৩। কে বাবা বৎস, এতই সেয়ানা।
গোয়েন্দার মাঝে কারে ডেকে আনা?
৭৪। দোরে তালাচাবি? তাও কী দিয়ে শেখে
ঘর ছেড়ে মেয়ে নামে রাস্তায় এসে।

উপর-নীচ

১। সাধু কার ব-যে আকার
তাল ঠোক এইবার।
২। অগ্রে নিয়ে দাত্র ওই চলেন মাতুল
রণবাদ্য বাজে শোন, নাই কোন ভুল।
৩। সাদাসিধা তৈরি
বঙ্কিমের বৈরী।
৪। খুঁজিয়া দেখ সে মহা আক্রোশে
লুকায়ে রয়েছে তোমার মুখোশে।

৫। নিশ্বাসে কষ্ট কি? আহারে।
এই বেলা আয় বোস আহারে।
৬। লেজা মুড়ো শোভে দেখ সবাকার বদনে
পালা পালা—দেখে আয় রবীন্দ্র সদনে।
৮। মধ্যম ভারী সাহেব নাকি?
দাও তো দেখি বইটা ঢাকি।
৯। পরে যদি ধুলো দাও
আমোদ কি কম পাও?
১০। লেজ-শূন্য বিলাতি শহর
সঙ্গে তার ক্রুর সহচর—
দুয়ে দুয়ে চার
হ'ল ছারখার।
১২। আদ্যক্ষর নাও, চেয়ে দেখ নীচে—
মুগ্ধ মর্মর তারেই জপিছে।
১৪। সন্ধানী কান বন্ধ কর
মাছের পেটে শব্দ বড়।
১৭। ঘরে আলা টিমটিম করে
তার মাঝে পাক দিয়ে ঘোরে।
১৯। ঝুম ঝুম পায়ে মাংস —একি,
ক্রিয়াকর্ম বন্ধ কর দেখি।
২০। অলাবুর নামান্তর
ভারী সোজা উত্তর।
২২। সন্ধান সহজে লভ্য
অন্তিম বক্তব্য।
২৪। লাজ নাই? সে কী
কাকা টান দেখি।
২৬। চরণ তাপ কিম্বা মালা
সাধের বাগান করল আলা।
২৭। মধ্যম লাগে যদি গান্ধার রেখাবে
হাত পাখা আন দেখি সরবৎ কে খাবে?
২৮। ঠাকুর শিল্পী পেলেন তল,
আকাশ পৃষ্ঠ—এবার বল।
২৯। দ্বিতীয় স্বর সবুর কর
পরের ফাঁক কাটারি রাখ
পিছনে নয় (নিখাদও হয়)
শখের পাত্র সুরভিময়।
৩১। বসুন্ধরা উল্টে গিয়ে দেখি সরষে ফুল
বৃষভানুকন্যা এলেন—নেই কোন ভুল।
৩২। বিমুখ নামিয়া এস, উচ্চ স্বর ধর,
খর্বকায় এল দেখি—হরিনাম কর।
৩৪। কারণ চাবি ঘুরিয়ে নাও
কুলকীর্তি গান গাও।

৩৭। রাজা কর ভক্ষণ
বৃক্ষের লক্ষণ।
৩৯। খুঁজে দেখ গাছে গাছে
নতুবা কলসে আছে।
৪০। কাণ্ডটা কী জানতে?
ছাগল ডাকে খেয়া ঘাটের প্রান্তে।
৪২। আজব শহর পাবে
কাল তাক লেগে যাবে।
৪৪। রাস্তাঘাট বাড়িঘর
মুড়ো লেজা নিয়ে মর।
৪৬। বন্‌বন্‌ ঘোরে চাকা নালা দুই ধার,
মাঝে উল্টা দোর, তার বামে গান্ধার।
৪৭। কথার পেটে পা ঢোকে
তাইত কথা শিঙা ফোঁকে।
৪৯। জন্সীসাহেব জোলার কীর্তি
বারণ করেন ফিরে ফিরতি।
৫২। ফকির পোষে যে
হেথায় বসে সে।
৫৭। যা দেখি তাই লিখি
পাঁচটি শূন্য পড়ল, এবার
হিসাবটা পাওনিকি?
৫৮। দুই পাশে সর দেখি
মেঝেতে কাটারি
পালা গানে আছে এক
চন্দ্রনামধারী।
৫৯। বসে আছে বাউণ্ডুলে
উল্টে ট্রাকশো লাগে ফুলে।
৬০। বিলাতি কাহিনীকার
জেনো মোর আপনার।
৬২। প্রথম ভাগে উল্টে মর
জীবন পাবে পরে,
আজ থেকে সব উপোস কর
মুসলমানের ঘরে।
৬৩। রাজকীয় অর্থ মূল্যে
এইবারে গলা খুলল।
৬৪। হরধনু মুন্ডপাশ
নাও দেখি নিশ্বাস।
৬৬। সর্বহারার মাঝে
বিসর্গ বিরাজে
আসে যদি বর্গীয়-জ
আপনার ধন আপনি বোঝ।
৬৭। পাপিষ্ঠ এসে গেল
পেট কেটে রাস্তায় ফেল।
৬৮। বাক বন্ধ—তারই মাঝে
রাক্ষস বিকট রাজে।
৭০। চন্দ্রলোকে মহিমা হেরে
কাহারা দেখি পিছনে ফেরে।
৭১। হও শিবসত্তা স্থিতি জগৎ সংসার
ঘুরে যদি সঙ্গ নেয় ঘুরে মরা সার।

ফেলুদার চতুরঙ্গ

অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়

পাকড়াশি নরেশের খোঁজ মেলে কোথা রে—
পাণ্ডুলিপির নেশা, ঘোরে হেথা হোথা রে।
খিটখিটে মেজাজের, চেনা তাকে ভারি দায়—
বাক্স রহস্যের মাঝে তাকে বোঝা যায়।

মৃগাঙ্ক ভট্‌চায, লোকটি কি খেয়ালী
ধোঁয়াশা ছড়ায় খুব, পাতে যেই হেঁয়ালী।
মুখোশটা খুলে যায়, শেষটায় কাছে পাও
সরগরমের সেই গোঁসাইপুরেতে যাও।

নীলমণি সান্যাল, অতীব ধুরন্ধর—
আনুবিস চুরি করে, বুদ্ধিতে কি প্রখর।
ধরা তবু পড়ে যায় জানবে অবশ্য
শেয়াল দেবতা পড়, কী তার রহস্য।

ঘড়ির জহুরী তিনি, ঘড়ি নিয়ে কারবার—
মহাদেব চৌধুরী, লোক নন হারবার।
বাড়ি যেন ঘড়িঘর, পেয়ে যাবে সে প্রমাণ
গোরস্থানেতে ভাই তবু থেকো সাবধান।

জব্দ সবাই এরা হার মানে সকলে
প্যাঁচ পয়জার যত ফেলুদার দখলে।
তোপসে সঙ্গী তার, জটায়ুর কৌতুক
সৃষ্টি মানিকদার, হৃদয়ের যৌতুক।
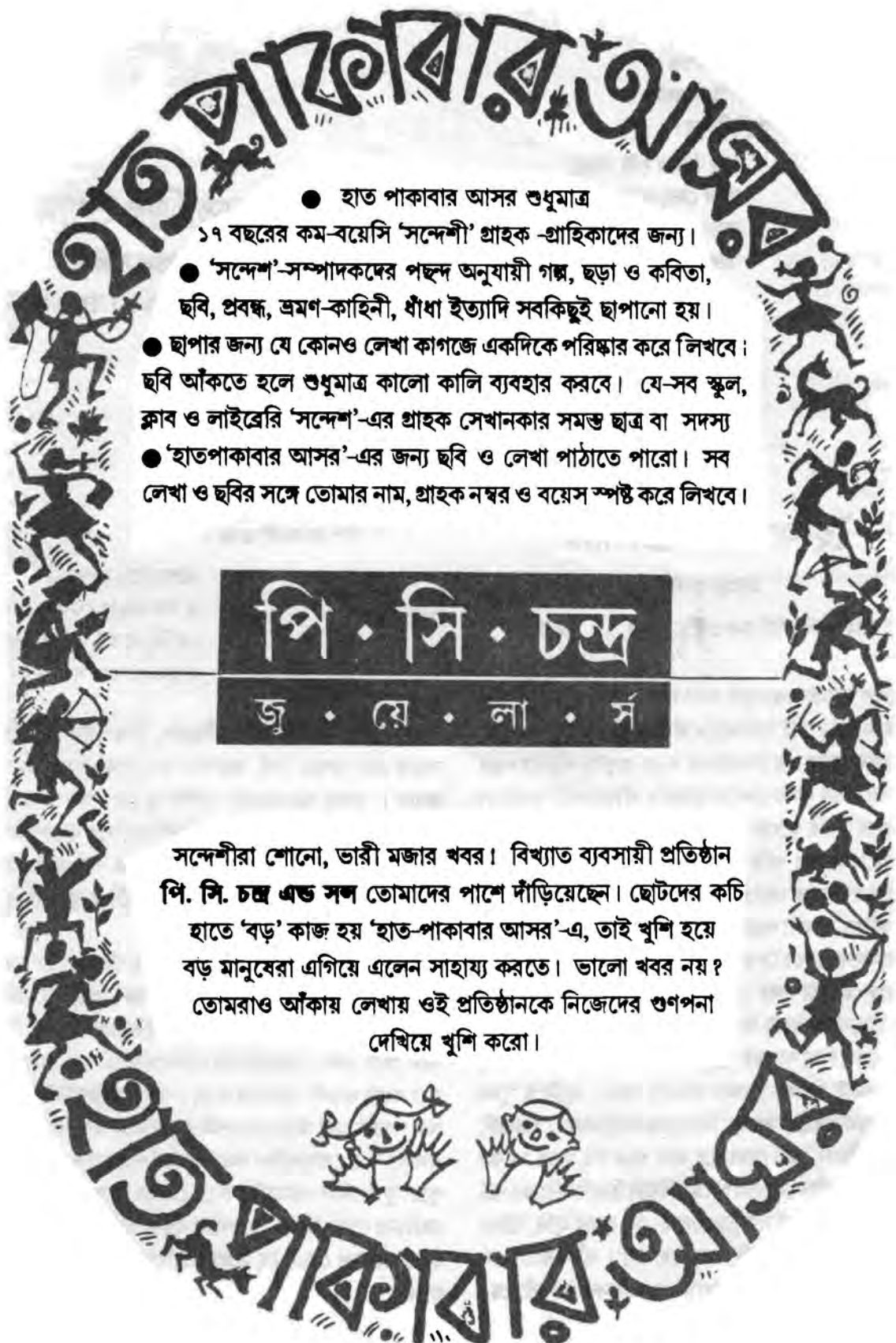
হাত পাকাবার আসর
● হাত পাকাবার আসর শুধুমাত্র
১৭ বছরের কম-বয়েসি 'সন্দেশী' গ্রাহক -গ্রাহিকাদের জন্য।
● 'সন্দেশ'-সম্পাদকদের পছন্দ অনুযায়ী গল্প, ছড়া ও কবিতা,
ছবি, প্রবন্ধ, ভ্রমণ-কাহিনী, ধাঁধা ইত্যাদি সবকিছুই ছাপানো হয়।
● ছাপার জন্য যে কোনও লেখা কাগজে একদিকে পরিষ্কার করে লিখবে;
ছবি আঁকতে হলে শুধুমাত্র কালো কালি ব্যবহার করবে। যে-সব স্কুল,
ক্লাব ও লাইব্রেরি 'সন্দেশ'-এর গ্রাহক সেখানকার সমস্ত ছাত্র বা সদস্য
● 'হাতপাকাবার আসর'-এর জন্য ছবি ও লেখা পাঠাতে পারো। সব
লেখা ও ছবির সঙ্গে তোমার নাম, গ্রাহক নম্বর ও বয়েস স্পষ্ট করে লিখবে।
পি • সি • চন্দ্র
জু • য়ে • লা • র্স
সন্দেশীরা শোনো, ভারী মজার খবর! বিখ্যাত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান
পি. সি. চন্দ্র এন্ড সন্স তোমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। ছোটদের কচি
হাতে 'বড়' কাজ হয় 'হাত-পাকাবার আসর'-এ, তাই খুশি হয়ে
বড় মানুষেরা এগিয়ে এলেন সাহায্য করতে। ভালো খবর নয়?
তোমরাও আঁকায় লেখায় ওই প্রতিষ্ঠানকে নিজেদের গুণপনা
দেখিয়ে খুশি করো।
হাত পাকাবার আসর

সত্যজিৎ প্রণাম

শঙ্খশুভ্র মল্লিক
গ্রাহক সংখ্যা ৩৭৯১। বয়স ১০ বছর

সুকুমার রায়ের পুত্র সত্যজিৎ রায়,
জন্মেছিলেন কলকাতাতে জান নিশ্চয়।
একধারেতে লেখক তিনি খ্যাতি বিশ্বময়,
চলচ্চিত্রে কীর্তি তাঁহার শুধুই বিস্ময়।

শঙ্কু তাঁহার সৃষ্টি অমর,
সঙ্গে ফেলু জবর খবর,
আরও আছেন তারিণীখুড়ো,
তার সঙ্গে ন্যাপলা বুড়ো।

অনাথবাবু, বাতিকবাবু,
কিছুতেই তারা হ'ন না কাবু।
আছেন আরও হাল্লারাজা
চলচ্চিত্রে হীরক রাজা।

গ্রামের পথে অপু-দুর্গা,
দেশে দেশে গুপী-বাঘা।
সঙ্গে তাদের ভূতের রাজা,
দিল বর সবই তাজা।

সন্দেশেতে সম্পাদনা
এ সব নেহাৎ ফেলনা তো না
সব দিকেতেই তাঁহার জিৎ
প্রণাম তোমায় সত্যজিৎ।

হৈ-হুল্লোড়-হুটোপাটি

সাম্য কার্ফা
গ্রাহক সংখ্যা ৩৬১৮। বয়স ১১ বছর

'সন্দেশ' মানেই মজা আর মজা-হুটোপাটি, খেলাধুলো, নাচ-গান, গল্প-কবিতা। সেই সঙ্গে রয়েছে জীবন সর্দারের 'প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর'। আমরা যারা চার দেওয়ালের মানুষ 'প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর' তাদের কাছে এক ঝলক ঝোড়ো হাওয়া। জীবন সর্দার প্রকৃতিকে নিজের করে উপলব্ধি করতে শিখিয়েছেন। সারা মাস আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকি কখন নতুন 'সন্দেশ' বের হবে—কারণ এই 'সন্দেশ' অনেক মজার মজার সন্দেশে সমৃদ্ধ। আর আছে গ্রীষ্মের ছুটিতে সন্দেশী অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের জন্যে রিহার্সাল চাই আর রিহার্সালের শেষে হৈহুল্লোড়-হুটোপাটি করা চাই-ই চাই।

তাহলে ঘটনাটা প্রথম থেকে খুলে বলি—গত বছর একদিন সন্দেশে রিহার্সালে সবাই উপস্থিত। হিয়াদি থেকে অর্চি পর্যন্ত। রিহার্সাল শেষ; কিন্তু কারুরই বাড়ি যাবার নাম নেই। ঘরের দরজা বন্ধ করে সবাই নিজের নিজের আড্ডায় ব্যস্ত। আমি ও সুমন একটি পুরানো বাঁধানো 'সন্দেশ' নিয়ে কাড়াকাড়ি করছি। পরমাদি, হিয়াদি, দেবলীনাদি, অর্চি গোল হয়ে বসে গল্পে মত্ত, মাঝে মাঝেই ওদের ভেতরে হাসির ফোয়ারা ছুটছে। হিয়াদি হিজবিজবিজের পার্ট করতে করতে হাসি ছাড়া সব ভুলে গেছে—ওর কথায় হাসি, হাঁটায় হাসি, চলায় হাসি, শুধু 'হি হি' আর 'হো হো'। হঠাৎ কানে এল শ্রীমান শঙ্খশুভ্র ও শ্রীযুক্ত অন্তরীপদা'র মধ্যে ভয়ানক তর্ক বেঁধেছে। কাগজ দিয়ে তারা একটা বল বানিয়েছে, কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, আগে ব্যাট করবে কে? প্রথমে তর্ক, তারপরে ঝগড়া ও শেষে 'ঝন্ -ঝন্-ঝনাৎ'। প্রথম আওয়াজটা একটা ঘুষির। শঙ্খশুভ্রর ঘুষিটা অন্তরীপদা'র পিঠেই পড়ত। কিন্তু অন্তরীপদা সরে যাওয়াতে ঘুষিটা পড়ে গিয়ে আলমারির গায়ে, আর সেই সঙ্গে আলমারির মাথায় রাখা অনেকদিনের পুরানো নানান স্মৃতিবিজড়িত ফুলদানি সোজা মাটিতে।

এইবার আর কোনও আওয়াজ নেই-সবাই চুপ। হঠাৎ আবার হিজবিজবিজের (হিয়াদির) হাসির আওয়াজ। কিন্তু সোমামাসি ও সুগতদাকে (ওরফে মেজদাকে) দেখে হিজবিজবিজের হাসি মাঝ পথে থেমে গেল। সুগতদা তার গোলগোল চোখকে আরও গোল করে হুঙ্কার ছাড়ল। সুমনকে কাছে পেয়ে তার কানটাই লাল করে দিল। আমি সেই ফাঁকে সন্দেশটা হাতে নিয়ে ঘর থেকে পালিয়ে এলাম। আর সোমামাসির কড়া নির্দেশে শঙ্খশুভ্র ও অন্তরীপদাকে পুরো ফুলদানিটি ডেনড্রাইট দিয়ে জোড়া দিতে হয়েছিল। যদিও সেদিনের শেষ ঘটনা ও তারপরের বকুনি আমরা এখনও ভুলিনি, তবুও সন্দেশে গেলে হৈ হুল্লোড় হুটোপাটি আমাদের সঙ্গী হয়ে থাকে।

আমরা সবাই সন্দেশী

পরমা ঘোষ মজুমদার

গ্রাহক সংখ্যা ২২৬৮। বয়স ১৬ বছর

সেবার বই মেলায় ঘুরতে ঘুরতে সন্দেশের স্টল চোখে পড়ায় কৌতুহলী হয়ে ঢুকে পড়লাম। কারণ আমি একজন সন্দেশী। ঢুকতেই অবাক। স্বল্প পরিসরে ভিড় উপচে পড়ছে। এরই মধ্যে যখন বই নিয়ে নাড়াচাড়া করছি পাশ থেকে যিনি আমাকে 'সন্দেশ' সম্পর্কে আরও আগ্রহী করে তুললেন, তিনি হলেন সবার প্রিয় তরুণ কাকু (তরুণ চক্রবর্তী)। তাঁর কাছেই জানলাম প্রতি মাসের প্রথম রবিবার সন্দেশ কার্যালয়ে 'প্রকৃতি পড়ুয়ার আসর' বসে। জীবন সর্দার অর্থাৎ সুনীল স্যার ক্লাসটি পরিচালনা করেন।

তারপর বার্ষিক পরীক্ষার তাড়া। পরীক্ষার পরই ট্রেকিং-এ যাওয়া— এসবের জন্য আর যোগাযোগ করা হয়ে ওঠেনি। গরমের ছুটিতে সেই অবাক করা প্রকৃতি পড়ুয়ার ক্লাসে গিয়ে উপস্থিত হলাম। এখানে থেকেই আমার ভালো-লাগা শুরু। সাধারণ অনেক বিষয়ে আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে আছে তার সম্পর্কে আমরা কতটুকুই বা জানি। এখানে এসে আমি নানারকম পাখি ও তাদের ডাক চিনতে শিখেছি। আকাশের তারাদের খবর জেনেছি। নানারকম গাছপালার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। এই দপ্তর থেকে আমাদের অনেক সময় বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রকৃতির আরও কাছাকাছি হতে। একবার ঘুরে এসে আবার কবে যাওয়া হবে তার জন্যে দিন গুনি। বিশ্বপ্রকৃতি দিবসে আমার নিজেদের হতে তৈরি বিভিন্ন রকমের পোস্টার নিয়ে দীর্ঘ পরিক্রমা করেছি। পোস্টার তৈরির দিনগুলি ছিল কি আনন্দের! কারও হাতে কচ্ছপ, কারও বা প্রজাপতি এই সব আর কি।

তারপর এল আমাদের বার্ষিক অনুষ্ঠান। ১৯৯৯-এ নন্দন প্রেক্ষাগৃহে আমাদের অগ্রজ সন্দেশী নবনীতা দেবসেন, অনিতা অগ্নিহোত্রী, ভবানীপ্রসাদ মজুমদার, রেবন্ত গোস্বামী প্রমুখ সব নামী-দামী সাহিত্যিকরা উপস্থিত ছিলেন। শিবুদা (শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য) ও দেবেশীদির পরিচালনায় ছন্দে গানে আমরা সত্যজিতের 'পাপাঙ্গুল' অভিনয় করেছিলাম। সন্দেশ কার্যালয়ে আমরা যে মাসে সত্যজিতকে তাঁর জন্মদিনে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি তাঁরই রচিত গল্প, কবিতা, গান দিয়ে। 'সন্দেশ' পরিবারের সকলের উপস্থিতিতে সে এক সহজ সরল আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন।

এই দু'টি অনুষ্ঠানের জন্যে বার্ষিক পরীক্ষার পর-পরই আরম্ভ হয় রিহার্সাল। সময়টা আমাদের মহা আনন্দে কাটে। মাত্রাছাড়া আনন্দে আমরা অনেক সময় কিছু অপ্রিয় কাজ করে ফেলি। কিন্তু শাস্তিটা সেই তুলনায় নেহাতই কম বা একেবারেই হয় না। আর থাকে লোভনীয় খাবার-দাবারের যোগান, যা বড়রা বাড়ি থেকে তৈরি করে আনেন।

এবারও আমরা বিড়লা অ্যাকাডেমিতে নব-পর্যায়ের সন্দেশের চল্লিশ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করলাম।

মাসের শেষ রবিবার বসে লেখাপাঠের আসর। সেখানে আমার খুদে লেখকরা বড়দের সঙ্গে লেখা পাঠ করি।

মাসের দ্বিতীয় বা তৃতীয় রবিবারেও এখানে বসে এক জমাটি আড্ডা। তাতে বিশিষ্ট সাহিত্যিক, কবি, অভিনেতা, সাংবাদিক, চিত্রশিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ, আবৃত্তিকার, মূকাভিনেতা, খেলোয়াড় প্রভৃতি তারকারা উপস্থিত হয়ে আন্তরিক আলাপ পরিচয়ে মেতে ওঠেন।

বইমেলার সময় ট্রামে করে দলবেঁধে সুনীল-স্যারের সঙ্গে হইচই করতে করতে বইমেলায় যাওয়াটাও কি কম আনন্দের? মেলায় আমাদের কত রকম কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়। শেষের দিন আমাদের হাততালি সহকারে সমাপ্তির গানটা বাজিয়ে তবেই বাড়ি ফিরি।

চিত্রপরিচালক অনিন্দ্যদাও একজন সন্দেশী। তিনি ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী (যিনি প্রথম কালাজ্বরের ওষুধ আবিষ্কার করেন)-কে নিয়ে একটি তথ্যচিত্র করেন। সুকুমার রায়ের মৃত্যু হয়েছিল কালাজ্বরে। তাঁর লেখা 'হ-য-ব-র-ল'তে যেখানে কালাজ্বর কথাটার উল্লেখ আছে সেই জায়গাটা সন্দেশীরা অভিনয় করে ওই তথ্যচিত্রের প্রয়োজনে সোমামাসি অসীম ধৈর্য্য সহকারে মহড়া দিয়ে আমাদের তৈরি করেছিলেন। তারপর বার্ষিক অনুষ্ঠানে পুরো নাটকটা করি।

এখানে এসে আমার বাংলা বই পড়া ও বাংলা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা আরও গভীর হয়েছে। সুগতদা তার বিখ্যাত ঝুলি থেকে আমাদের নিয়মিত বই সরবরাহ করে উৎসাহিত করেন।

প্রথম যেদিন 'হাত-পাকাবার আসর'-এ আমার লেখা ছাপার অক্ষরে দেখলাম সেদিন আনন্দে আপ্লুত হয়েছিলাম।

সন্দেশের সব কাজ এখন কম্পুটারে হয়। আমরা শান্ত থাকার শর্ত দিলে কম্পুটারকাকু (বাবুয়াদা) আমাদের এ ব্যাপারে প্রাথমিক পাঠদান করেন।

এছাড়া আছে পিকনিকের ব্যবস্থা যা হ'ল একটা মিলনোৎসব। খাওয়া দাওয়া, খেলাধুলো, গানবাজনা, হুড়োহুড়ি, আরও কতকি।

এই সব আনন্দঘন মুহূর্তকে যিনি ক্যামেরা-বন্দী করে রাখেন তিনি হলেন সন্দেশের নীরব কর্মী দেবাশিসদা (দেবাশিস সেন)।

এ সন্দেশ ভীমনাগের সন্দেশের চেয়েও মিষ্টি। বাঞ্ছারামের 'আবার খাবো'র থেকে সুস্বাদু। এর আদি কারিগর স্বয়ং উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। এতে কাজু, কিসমিস সংযোজন করে আরও সুস্বাদু করেছিলেন সুকুমার রায়। পরে একে স্তবক দিয়ে মুড়ে দিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়, লীলা মজুমদার, নলিনী দাশ প্রমুখেরা।

পরিবেশ আজ নানাভাবে কুয়াশাচ্ছন্ন। আমাদের একটু অক্সিজেন নেবার জায়গা এখন এই সন্দেশ কার্যালয়। একে নির্মল রাখার অঙ্গীকার করি।

সন্দেশী অনুষ্ঠান

দেবলীনা চট্টোপাধ্যায়

গ্রাহক সংখ্যা ২২০৯। বয়স ১৪ বছর

১৯শে জুন (২০০১), মঙ্গলবার, মাসদুয়েক দেরিতে পালন করা হল 'সন্দেশ'-এর চল্লিশতম জন্মদিন। তা বে-বারে হলেও বিড়লা অ্যাকাডেমিতে অনুষ্ঠান জমজমাট হতে সন্ধ্যে প্রায় সাতটা হ'ল। এলেন সন্দীপ রায়, কর্নেল সমগ্রের সিরাজ সাহেব (সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ), সুচিত্রা ভট্টাচার্য। হোট হল, ভরাবার চেষ্টায় আমরা সন্দেশীরা অনেক অনুনয় বিনয় করে কিছু দর্শকও জড়ো করেছি। হাততালি না দিলে পিলে চমকানো চেল্লানোর কথা আগাম জানিয়ে শুরু করলাম অনুষ্ঠান। মাণিক দা'র করা কর্নেল সমগ্রের প্রচ্ছদ স্কেচ সিরাজ জেঠুর স্মৃতি রোমন্থনে শুনতে এত ভালো লাগছিল। সুচিত্রাদি স্টেজে ওঠার আগে একটু হোঁচট খেলেন বটে তবে তাঁর ভাষণে মাণিকদা'র ছোট্ট সুপারিশ — 'ন্যাড়াকে ঘুম পাড়িয়ে দাও' শুনে সেই গল্পটা সন্দেশের কোন সংখ্যায় প্রথম বেরিয়েছিল জানতে মন হাঁকপাক করল। হলের ভিতরে (গ্রীনরুমে ছাড়া) খাবার নিষিদ্ধ ছিল। দুপুর থেকে খিদেয় কাঁচুমাচু, আমরা খাব কী। মেকাপে জবুথবু, সিঙাড়ায় লুকিয়ে কামড় দিতে গিয়ে বন্ধুরূপী অন্তরীপের গোঁফ যায় যায়, অ্যাং-রূপী আমার মুখোশ নড়বড় করে, দেড়েলবুড়ো জিষ্ণুর ইতিউতি করুণ চাউনি, যদি মেক-আপ বাঁচিয়ে একটু খাবার যায় পেটে। গেল কিনা একগুচ্ছ শনের রোঁয়া।

প্রথমে আমরা করলাম 'তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম' অবলম্বনে প্রণবদার নাট্যরূপ ও পরিচালনায় 'বুড়োদের হাটে'। বাবা। এত বুড়োও থাকতে পারে। মিচকে, কঞ্জুস, দেড়েল বুড়ো, আধ বুড়ো, কিং হেনরী, ফটকের বুড়ো।

সোমাদির (সোমা ঘটক) পরিচালনায় 'বঙ্কুবাবুর বন্ধু'তে যা অপূর্ব 'ইউফো' তৈরি হয়েছিল বলার নয়। সোমাদির পরিকল্পনায় বাঁশের গোলা থেকে মাপ মতো বাঁশের বাখারি এনে তা দিয়ে গোলাকার কাঠামো তৈরি করে, তাতে রঙিন কাগজ ও গোলাপী কাপড় ঢেকে সোনালী রাংতার তাপ্পি দেওয়া ফ্লাইং সসার যেই মঞ্চে হাজির হ'ল অমনি ঘটল অঘটন। গাছপালা-ঝোপঝাড়রূপী বাবুয়াদা (অমিতানন্দ দাশ) পরিবেশকে বেশ বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন— সবে পর্দা উঠেছে, দেখা গেল মাইকটাও স্ট্যান্ড -সমেত শূন্যে দোল খেতে খেতে উঠে যাচ্ছে ওপরে। কি হল, কি হবে? দেবাশিসদা (দেবাশিস সেন) দৌড়ে এলেন অঘটন বাঁচাতে, চেষ্টা করে হাল ছাড়লেন। প্রণবদা (প্রণব মুখোপাধ্যায়) কৌতুক করে জানতে চাইলেন, 'কি হ'ল, দেবাশিস কি সত্যি 'ইউফো'র পাল্লায় পড়েছে নাকি?'

হতভম্ব দেবাশিসদা জানাচ্ছেন যে বিড়লা অ্যাকডেমিতে ইউফোর হয়তো সত্যি আবির্ভাব হয়েছে, কারণ মাইকের সঙ্গে দেবাশিসদাও নাকি প্রায় এক আঙুল শূন্যে উঠে গিয়েছিলেন।

আমার অ্যাঙের মুখোশটা তো খুব মজার, স্প্রিংয়ের শুঁড় লাগানো গোলাপী রঙের।

অন্তরীপের পরিচালনায় গোটাসাতেক ভূতেরা আমাদের সাবধান করে দিল যে, যে কোনও জিনিসে বাড়াবাড়ি বাকি জীবনে কি মারাত্মক পরিণতি ঘটাতে পারে। জানলাম ঘাড়ে চেপে চেপে ভূতেদেরও পা ব্যথা করে, পায়ে ঝিঁঝি ধরে। ভূতরূপী আপ্পু তো শেষে বেশ ভয় পাওয়ানো চোখে কটমটিয়ে শাসিয়ে গেল, যে পড়াশুনার বাতিক, পয়সার বাতিক, গানের বাতিক বাড়লে তার দাওয়াই ভূতেরা ভালোই জানে—সে কি বড় আর কি ছোট।

সন্দীপনরা দুই ভাই আর হিয়া সত্যজিৎ রায়ের ছড়ার মুকাভিনয় করে দেখাল। শিলিগুড়ির রাকাদি 'চাঁদা'র মাহাত্ম্য নিয়ে স্বরচিত মজার ছড়া পড়ে শোনাল, আর শোনাল শঙ্খশুভ্র তার বিড়াল গবেষণা। সারা গরমের ছুটি জুড়ে তারও আগে থেকে আমাদের এই যে যোগাড়-যন্ত্র, এত ফস করে শেষ হয়ে গেল আড়াই ঘন্টায় ভাবতেই মনটা ভার হয়। কানে আসছে সুচিত্রাদির দর্শকাশনে কড়াপাক সন্দেশ-(ঈ) মানে নরম পাক সন্দেশ-(ঈ) চর্তুদিকে পাঠাক, শ্রোতা লেখক মিষ্টির ছড়াছড়ির উল্লেখ। সেই মিষ্টি মানে সামনের বছরে, সন্দেশের জন্মদিনে ফের ফিরে দেখা। সত্যি। সত্যি। সত্যি।

সুচিত্রাদি, সিরাজদা, ও সন্দেশীরা

'ভূতেরা' নাটকের শেষ দৃশ্য

অ্যাং ও তার মহাকাশ যান
(বঙ্কুবাবুর বন্ধু)

তিন বুড়ো
(বুড়োদের হাটে আলেখ্য)

হেনরি কিং ও সভাসদেরা
(বুড়োদের হাটে আলেখ্য)

Regd.No. MLS/WB/RNP-212 R.N.I. No. 12007/64 SANDESH June 2001 Price Rs. 25.00